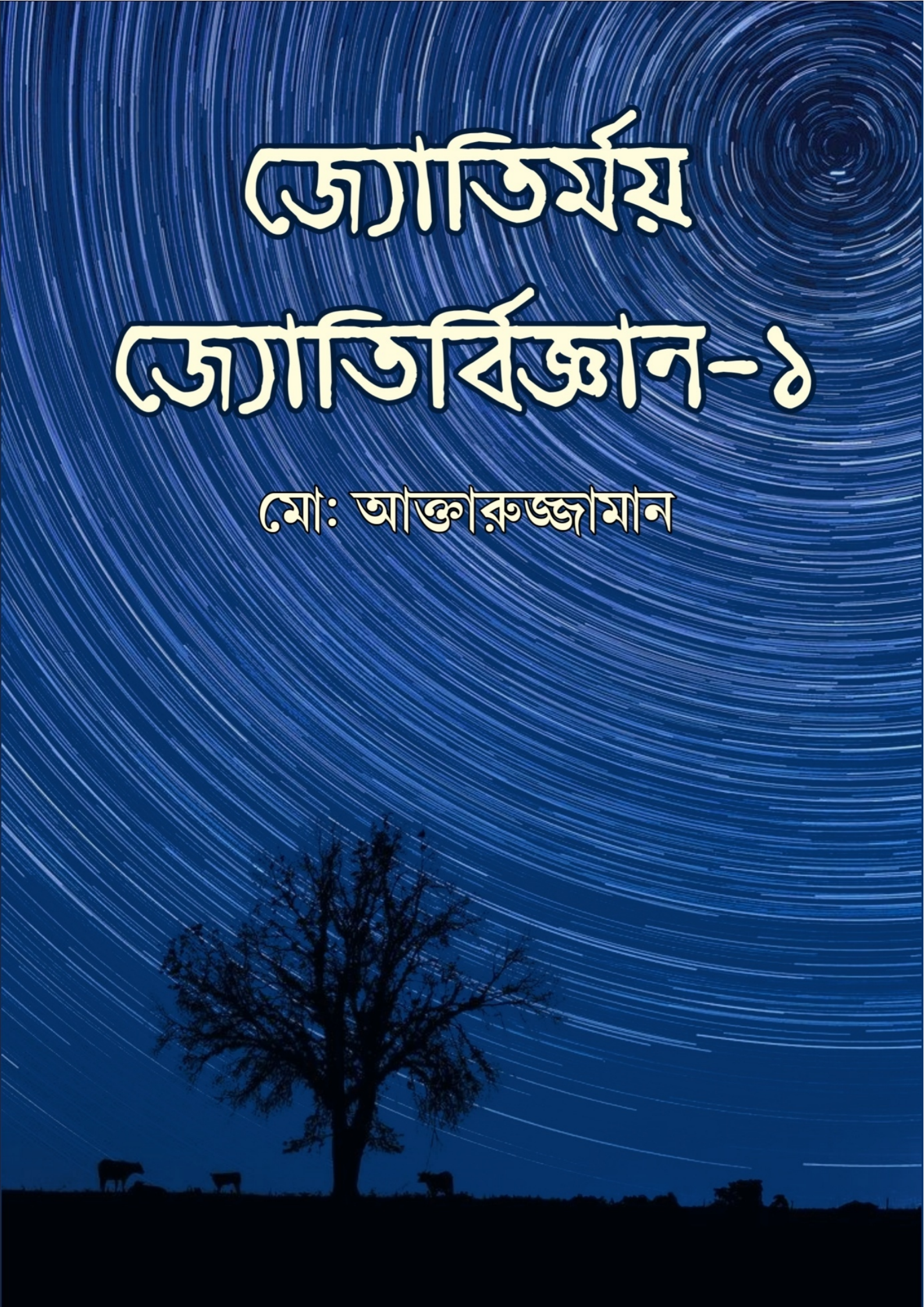
জ্যোতির্ময়
জ্যোতির্বিজ্ঞান-১
মো: আক্তারুজ্জামান

বইটির লেখক **মোঃ আক্তারুজ্জামান।** এই বইয়ের কিছু লেখা বিভিন্ন বিদেশী বই, জার্নাল ও ওয়েবসাইট থেকে ভাবানুবাদ করা হয়েছে এবং কিছু লেখা লেখকের নিজের। বইয়ে যে সকল ছবি ব্যবহার করা হয়েছে তা কেবলমাত্র বোঝার সুবিধার্থে ও কোনোপ্রকার ব্যবসায়িক স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে নয়। উল্লেখিত ছবিগুলোর কোনোটিতেই আমাদের কোনো প্রকার কপিরাইট নেই।

বইটি বিনামূল্যে বিতরণের জন্য। তবে কোনো প্রকার অর্থের বিনিময়ে এর বিতরণ অবৈধ।

লেখক

মোঃ আক্তারুজ্জামান

সম্পাদনা

কে. এম শারিয়াত উল্লাহ

প্রুফ রিডিং

রওনক শাহরিয়ার

নামকরণ

মোহাম্মদ ইশতিয়াক রহমান

কভার ডিজাইন

রাকিব হোসাইন

একনজরে অধ্যায়গুলো

5	Scintillation
7	ব্লাড মুন
10	Earthshine
13	Twilight
15	প্যারালাক্স
19	চাঁদের যত নাম
26	সারোস
34	Syzygy
53	Planetary configuration
72	সাইকেল
78	মুন ইলিউশান
84	Precession
95	ব্লু মুন
97	গ্রহণের প্রকারভেদ
111	আমাদের পৃথিবী এবং কিছু পরিমাপ
128	আলোকীয় ঘটনাবলি

মুখবন্ধ

মানব ইতিহাসের আদি থেকেই সুবিশাল, গতিশীল আকাশ নানান দেশের মানুষকে প্রভাবিত করেছে – নানান ভাবে। কে জানতো, গুহার ভেতরে থাকা ভীতু মানুষ জাতি একদিন আকাশ-মহাকাশের রহস্য খুঁজতে বেরোবে? মহাবিশ্বের বুকে ওড়াতে শুরু করবে মানব-বিজয়-কেতন? কিন্তু সত্যান্বেষী মানুষ পেরেছে, আমরা পেরেছি। আমরা চাঁদের পৃষ্ঠে পা রেখেছি, পতাকা টানিয়েছি। যেখানে সরাসরি পা রাখতে পারিনি, সেখানে পাঠিয়েছি নানান রোবট। বিদ্রোহী কবির সাথে তাল মিলিয়ে বলতে চাই – "আমরা সত্যান্বেষী, জ্যোতিষ্ক বুকে এঁকে দিই পদ-চিহ্ন"। নানান কালের নানান সত্যান্বেষী মানুষদের হাত ধরেই, কবিগুরুর ভাষায়, আলো হাতে চলা আঁধারের যাত্রীদের হাত ধরেই বিশ্বজগতের অনেক রহস্য-ই আজ উন্মোচিত! আজ আমরা জানি – জ্যোতিষ্করা আমাদের ভাগ্য নির্ধারণ করে না, মানবজীবনে কোনো প্রভাব ফেলে না। ফলে, পতন হয় জ্যোতিষশাস্ত্রের, উত্থান হয় জ্যোতির্বিদ্যার, জ্যোতির্বিজ্ঞানের। আর, সেই উত্থান জন্ম দেয় জ্যোতির্বিদ্যার নানান শাখা-প্রশাখার এবং এই শাখা-প্রশাখার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো পর্যবেক্ষণ জ্যোতির্বিদ্যা। বর্তমান গ্রন্থের লেখক মো: আক্তারুজ্জামান গুরুত্বপূর্ণ ও চমৎকার একটি কাজ করেছেন। তিনি পর্যবেক্ষণ জ্যোতির্বিদ্যার সেইসব বিষয় নিয়ে লেখেছেনে, যেগুলি নিয়ে বাংলায় সাধারণত খুবই কম লেখা হয়েছে কিংবা একদমই হয়নি। সেইসাথে বোঝানোর ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন বেশকিছু সুসজ্জিত রঙিন ছবি। এর থেকেও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি হলো তিনি বইটি প্রকাশ করেছেন অনলাইনে, সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। ফলে, সবদিক থেকেই তিনি নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার। প্রকাশের পূর্বে এই ই-বইটিতে চোখ বুলোতে পেরে এবং মুখবন্ধ লিখতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। অদূর ভবিষ্যতে এই ই-বইটির কলেবর আরো বৃদ্ধি করে হার্ডকাভার রূপে হাতে পেলে, আমার চেয়ে বেশি আনন্দিত আর কেউ হবে না বৈকি।

- হৃদয় হক

ফাল্গুন ১৪২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১, চট্টগ্রাম

Scintillation

খালি চোখে আকাশে পাঁচটি গ্রহ দেখা যায়। এগুলো হলো বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি এবং শনি। অগণিত তারকারাজির মাঝে খালি চোখে দেখা যায় মাত্র পাঁচটি গ্রহ! খালি চোখে আকাশের পানে তাকিয়ে অগণিত নক্ষত্রের মাঝে এই গ্রহগুলো যদি খুঁজতে বলা হয়, তবে অনেকের কাছে ব্যাপারটি দুঃসাধ্য বলেই মনে হতে পারে। হয়ত মনে হবে, আমি তো গ্রহগুলো চিনিও না। তাহলে তারা থেকে আলাদা করব কীভাবে? তারা এবং গ্রহ আলাদা করার জন্য সবচেয়ে প্রচলিত জ্ঞানটি হলো: তারকারা মিটমিট করে কিন্তু গ্রহরা তা করে না। খালি চোখে তারা এবং গ্রহ আলাদা করার জন্য এই তথ্যটিই যথেষ্ট।

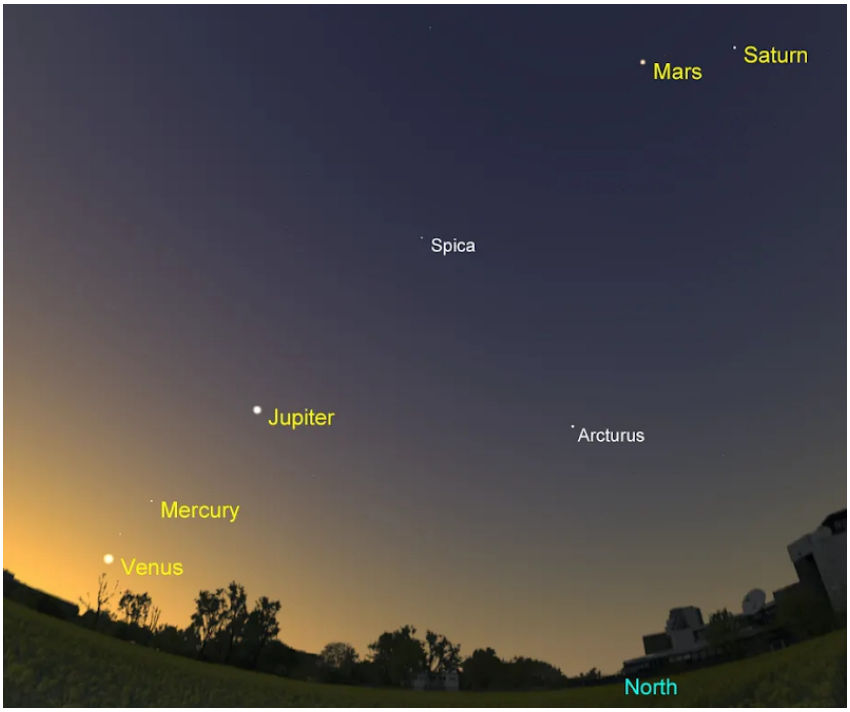

চিত্র খালি চোখে আকাশে পাঁচটি গ্রহ দেখা যায়

রাতের বেলায় খোলা মাঠে গেলে আমরা কয়টা তারা দেখতে পাবো? যদি আকাশে চাঁদের আলোর প্রভাব না থাকে, তাহলে আমরা সবাই বলব অগণিত তারা খালি চোখে দেখা যাবে। কিন্তু না। অগণিত তারা দেখা যায় না। পুরো আকাশ জুড়ে খালি চোখে দেখা যায় সর্বসাকুল্যে ৯০৯৬টি তারকা। যেহেতু গোলার্ধ ২টি, উত্তর এবং দক্ষিণ। তাই যদি অর্ধেক এ ভাগ করি, তাহলে বলা যায় খালি চোখে আমরা প্রায় সাড়ে চার হাজারের মতো তারা দেখি। আপনার কল্পনায় আকাশ আলোক দূষণমুক্ত অমাবস্যার মতো কালো হলেও, আপনি খালি চোখে এর বেশি সংখ্যক তারা দেখতেই পাবেন না। মনে প্রশ্ন হতে পারে, এত তারা গুনল কে?

ইয়েল ইউনিভার্সিটির জ্যোতির্বিদ Dorrit Hoffleit প্রায় এক দশক আগে তারকাগুলোর ঔজ্জ্বল্যের ভিত্তিতে একটি শ্রেণিবিন্যাস করেন। যারই ফলশ্রুতিতে জানা যায় এমন সংখ্যা। একটি তারার আপাত ঔজ্জ্বল্যের মান যদি ৬ থেকে বেশি হয়, তাহলেও অনেক অন্ধকার স্থানে যেতে হবে তারাটি দেখার জন্য। আর ৯০৯৬টি তারার সংখ্যাটি করা হয়েছে

৬.৫ মাত্রার ঔজ্জ্বল্য পর্যন্ত তারা নিয়ে। সুতরাং খালি চোখে ৯০৯৬টির বেশি তো নয়ই বরং আরও কম দেখার সম্ভাবনাই বেশি।

মূল প্রশ্নে ফেরা যাক। তারারা মিটমিট করে জ্বললেও গ্রহরা কেন নয়? গ্রহের তুলনায় এক একটি তারা আমাদের থেকে বহু দূরে অবস্থান করছে। তারাগুলো এতটাই দূরে অবস্থান করে যে, বিশাল আকৃতির টেলিস্কোপ দিয়েও তাদের কলমের নিবের অগ্রভাগের সমতুল্য একটি বিন্দু ছাড়া কিছুই মনে হয় না। সে হিসেবে বলা যায়, তারাগুলো এক একটি বিন্দু আলোক উৎস। এই বিন্দু আলোক উৎস থেকে আলো পৃথিবীতে পৌঁছানোর সময় বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করতে হয়। বায়ুমণ্ডলের এক এক অংশের ঘনত্ব, তাপমাত্রা এক এক রকম। ফলে এক এক অংশের প্রতিসরাঙ্কও এক এক রকম। বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়ে আগত আলো প্রতিসরিত হওয়ার সময় বারবার পথ বিচ্যুতি ঘটে। এর ফলে বিন্দু উৎস থেকে আলো সোজা পথে না এসে আঁকাবাঁকা পথে আমাদের চোখে এসে পৌঁছায়। যেহেতু বায়ুমণ্ডল এর বিভিন্ন স্তরের ঘনত্ব তাপমাত্রা সবসময় পরিবর্তন হচ্ছে, তাই আঁকাবাঁকা পথটিও সবসময় পরিবর্তিত হয়। ফলে এখন যে পথে আলো আমাদের চোখে আসছে, পরের সেকেন্ডে আলো হয়তো ভিন্ন পথ অনুসরণ করে আমাদের চোখে আসছে। এই কারণেই মনে হয় বিন্দু উৎসটি কাঁপছে বা বলা যায়, তারাটি মিটমিট করছে। এখন গ্রহের প্রতিফলিত আলোও তো বায়ুমণ্ডল ভেদ করে চোখে আসে। কিন্তু গ্রহরা মিটমিট করে না। এর কারণ ব্যাখ্যার্থে একটি টর্চ লাইট কল্পনা করা যায়। টর্চ লাইটের আলো দূর থেকেও স্থির মনে হয়। টর্চ লাইট কোনো বিন্দু উৎস নয় বরং একটি আলোক চাকতিরূপে বিবেচনা করা যেতে পারে। একটি আলোক চাকতিতে অসংখ্য বিন্দু উৎস থাকে। প্রতিটি বিন্দু উৎস থেকে আলো বায়ুমন্ডলের ভিতর দিয়ে আসার সময় প্রতিসরিত হয় ঠিকই কিন্তু অসংখ্য বিন্দু উৎস থাকায় একটি বিন্দু উৎসের দরুণ যদি আলোক উজ্জ্বলতা কম হয়, তাহলে হয়তো অন্য একটি বিন্দু উৎসের কারণে উজ্জ্বলতা বেড়ে যায়। এভাবে অসংখ্য বিন্দু উৎস হতে আলো যখন পরিশেষে একসাথে চোখে পৌঁছায় তখন আসলে কোনো পরিবর্তনই দৃষ্টিগোচর হয় না। ঠিক এই প্রক্রিয়াটি গ্রহের জন্য। গ্রহগুলো আমাদের থেকে তারার তুলনায় খুবই কাছে অবস্থিত। ছোটোখাটো বাইনোকুলার দিয়ে দেখলেও এদের চাকতির আকৃতিটি সহজেই ধরা পড়ে। এই উজ্জ্বল চাকতির পুরোটাই যেহেতু আলোক উৎসরূপে কাজ করে, তাই উপরে উল্লেখিত ব্যাখ্যানুসারে গ্রহরা মিটমিট করে না বলে মনে হয় আমাদের কাছে। তারা এবং গ্রহদের মিটমিট করার পার্থক্য সবচেয়ে ভালো বোঝা যায় যখন এরা দিগন্তের কাছাকাছি থাকে। দিগন্তের কাছে থাকা অবস্থায় আলোকে চোখে আসতে বায়ুমণ্ডল এর ভিতর দিয়ে বেশি পথ অতিক্রম করতে হয়। এ সময় তারার জন্য আলোকরশ্মির আঁকাবাঁকা পথের সংখ্যা বাড়ে এবং সহজেই চোখে তারার ঘন ঘন মিটমিট করা বোঝা যায়।

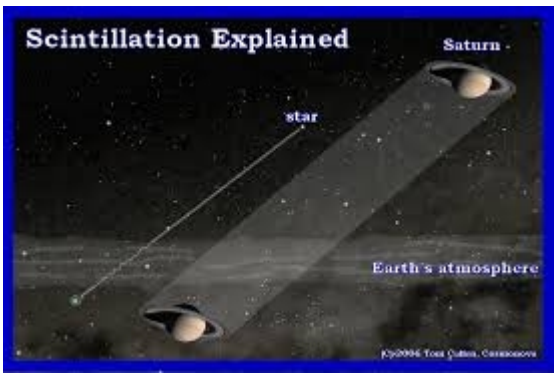

এই মিটমিট (ঝিকিমিকি ও পড়া যায়) করার ব্যাপারটিকেই বলা হয় astronomic Scintillation। এবার আশা করি, তারা এবং গ্রহ খালি চোখে চেনা সহজ হবে।

ব্লাড মুন

সুপ্রাচীন কাল থেকেই মানুষের মনে জাগা প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য দাঁড় করানো হয়েছিল নানা ধরনের ব্যাখ্যা। হোক সে মহাজাগতিক কিংবা বাস্তব জীবন ঘনিষ্ঠ। তেমনই এক ঘটনার নাম চন্দ্রগ্রহণ। আজকের মুহূর্তে দাঁড়িয়ে সহজেই বলে দেওয়া যায় চন্দ্রগ্রহণ কেন হয়, কীভাবে হয়? সঠিক ব্যাখ্যা আমাদের হাতের মুঠোয়। কিন্তু আজ থেকে বহু বছর আগের সভ্যতাগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, চন্দ্রগ্রহণ কিংবা সূর্যগ্রহণ তাদের কাছে কোনো সহজ ব্যাপার বা স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না। ঘটনাগুলোর সাথে জড়িত ছিল তাদের ধর্ম, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য। বিভিন্ন জাতি বিভিন্নভাবে নিজেদের মতো করে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে চন্দ্রগ্রহণকে।

ইনকাদের কাছে চন্দ্রগ্রহণ আসতো এক ভয়াল রূপ নিয়ে। চন্দ্রগ্রহণ শুরু হলে যখন পৃথিবীর ছায়া, ধীরে ধীর চাঁদকে গ্রাস করা শুরু করত, তখন তারা মনে করত যেন একটি জাগুয়ার (Jaguar) চাঁদকে গিলে ফেলছে। তাদের বিশ্বাস ছিল, জাগুয়ারটি চাঁদকে খেয়ে ফেলার পর পৃথিবীকে আক্রমন করবে। তাই জাগুয়ারের হাত থেকে পৃথিবীকে বাঁচাতে তারা এক অভিনব উপায় অবলম্বন করত। ইনকারা চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দিত যাতে ভয় পেয়ে জাগুয়ারটি চলে যায়। তাদের পোষা প্রাণীদের (কুকুর) দিয়ে আওয়াজ করাতো তারা। গ্রহণ যতক্ষণ স্থায়ী হতো ততক্ষণ চলত তাদের এই আচার। যখন ধীরে ধীরে চাঁদ নিজের অবস্থায় ফিরে আসতো, তখন তারা ধরে নিত তাদেরকে ভয় পেয়ে জাগুয়ারটি পালিয়েছে। এভাবে পৃথিবী রক্ষা পেত!

ট্রিনিটি নদীর কোল ঘেঁষে উত্তর ক্যালিফোর্নিয়ায় বাস করে এক ধরনের উপজাতি। এদের বলা হয় Hupa। হুপা উপজাতির বিশ্বাস মতে চাঁদের ২০ জন স্ত্রী। ২০ জন স্ত্রীর পাশাপাশি চাঁদের রয়েছে অনেক পোষা প্রাণী। এই পোষা প্রাণীদের মধ্যে রয়েছে পাহাড়ি সিংহ এবং পাহাড়ি সাপ। এরা আবার অনেক ক্ষুধার্ত। চন্দ্র যখন এদের খাবার যোগাড় করতে পারে না তখনই তারা আক্রমন করে চাঁদকে। রক্তাক্ত হয়ে যায় চাঁদ। স্বামীর রক্তাক্ত এই অবস্থা দেখে ছুটে আসেন তার ২০ জন প্রিয়তমা। বহু কষ্টে ক্ষুধার্ত প্রাণীদের হাত থেকে বাঁচানো যায় চাঁদকে। ধীরে ধীরে গ্রহণ শেষ হয়। চাঁদ হয়ে ওঠে সুস্থ।

চিত্রঃ ব্লাড মুন

চীনের পুরাণ অনুসারে চন্দ্রগ্রহণ কিংবা সূর্যগ্রহণ ঘটার জন্য দায়ী একটি স্বর্গীয় কুকুর অথবা ড্রাগন। এই ড্রাগনটি যখন চাঁদকে গিলে নেয়, তখনই গ্রহণ শুরু হয়। এই অবস্থায় ড্রাগন তাড়িয়ে চাঁদকে মুক্ত করার জন্য চীনারা বাদ্যযন্ত্র বাজানো শুরু করত। বাদ্যযন্ত্রের বাজনার তীব্রতার তাণ্ডবে একসময় ড্রাগনটি পালিয়ে যেত। চন্দ্র শোভা পেত আগের মতোই।

চিত্রঃ রাহু কর্তৃক সূর্য ভক্ষণের চেষ্টা

হিন্দু পুরাণ মতে রাহু নামক অসুর যখন ছদ্মবেশে দেবতাদের আসরে অমৃত পান করতে যায়, তখন চন্দ্র ও সূর্য তার ছদ্মবেশ চিনে ফেলে। রাহুর এহেন অপরাধের জন্য ব্রহ্মা তার মাথা থেকে ধড় আলাদা করার আদেশ দেন। কিন্তু ততক্ষণে রাহু অমৃত পান করে ফেলার কারণে রাহু জীবিতই থেকে গেল কিন্তু মাথা ও দেহ বিচ্ছিন্ন হিসেবে। তখন থেকেই রাহুর সাথে সূর্য ও চাঁদের বৈরিতা। এই বৈরিতার ফলশ্রুতিতে রাহুর মস্তক ভাগ যখন প্রতিশোধ নেয়ার জন্য সূর্য, চন্দ্রের কাছে ছুটে যায়, তখন সূর্য, চাঁদকে গিলে ফেলার চেষ্টা করে। কিন্তু রাহুর তো পেট নেই। তাই সূর্য, চাঁদ গিলে ফেললেও সেগুলো গলার কাটা অংশ দিয়ে বেরিয়ে আসে। এই মুখে নেওয়া থেকে বেরিয়ে আসার সময়টাকেই হিন্দু পুরাণে গ্রহণ বলা হয়।

এছাড়া আরও অনেক উপকথা আছে। **মেসোপটেমিয়ানরা** চন্দ্রগ্রহণকে তাদের রাজার প্রতি অসম্মান মনে করত, রাজাকে লুকিয়ে রেখে অভিনব উপায়ে চন্দ্রগ্রহনের সময়টি অতিবাহিত করত তারা। এসময় আসল রাজাকে তারা লুকিয়ে রাখত অথবা সাধারণ নাগরিকের বেশভুষায় সজ্জিত করত। অন্যদিকে একজন সাধারন লোককে নকল রাজা সাজানো হতো। এভাবে চাঁদকে ধোঁকা দিতো তারা। চন্দ্রগ্রহণ শেষ হলে বেশিরভাগ সময় নকল রাজাকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হতো এবং আসল রাজাকে আবার সিংহাসনে বসানো হতো।

অ্যাজটেক সভ্যতা পৃথিবীর ইতিহাসে জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী ছিল। চন্দ্রগ্রহনের সময় নানা ধরনের বিধি নিষেধ ও পালন করত তারা (যা আজও বহু দেখা যায়) । এছাড়া **ভাইকিং, মায়ানদেরও** ছিল নিজস্ব পদ্ধতি এবং আচার।

Africa এর **Togo** এবং **Benin** অঞ্চলের **Batammaliba** জাতির লোকেরা চন্দ্রগ্রহণকে সূর্য এবং চন্দ্রের যুদ্ধ বলে মনে করত। তখন লোকেরা যুদ্ধ থামানোর উদ্দেশ্য নিয়ে এক জায়গায় সমবেত হতো। একসময় যুদ্ধ থেমে যেত।

এই রকম বহু উপকথা রচিত হয়েছে পৃথিবীর ইতিহাসে। তবে আজকের পোস্টের উদ্দেশ্য নিছকই এসব কুসংস্কার নিয়ে না। প্রাচীন মানুষের কাছে যে ব্যাপারটি সবচেয়ে ভয়ের ছিল, সেটি হলো চাঁদের রক্তিম রূপ ধারন করা। পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণ কেন হয় তা আমরা প্রায় সবাই জানি। তাই এ ব্যাপারটি বলা বাহুল্য মনে হতে পারে। মূল প্রশ্ন হলো, পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণের সময় চাঁদ রক্তের মতো লাল হয় কেন? এই প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে আমাদের পৃথিবীতেই। পৃথিবীর ছায়া চাঁদের উপর পড়ে। এসময় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল এর ভিতর দিয়ে আলোকরশ্মি গমন করে। এসময় বায়ুমন্ডলের ধুলিকণা সহ বিভিন্ন উপাদান থাকার ফলে আলো বিচ্ছুরিত হয়। আলো বিচ্ছুরণ যখন হয় তখন কোন বড়ো প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন আলো না হলেও আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের কাছাকাছি দৈর্ঘ্যের সমান বহু প্রতিবন্ধকের মুখোমুখি হয়। যার ফলে প্রযোজ্য হয় রিলের (Rayleigh) বিচ্ছুরণ সুত্র। রিলের বিচ্ছুরণ সুত্রের মূলনীতি এমনভাবে লেখা যায়:

> *বিচ্ছুরণের মাত্রা আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের চতুর্ঘাতের ব্যাস্তানুপাতিক। অর্থাৎ সহজ ভাষায় তরঙ্গদৈর্ঘ্য কম হলে বিচ্ছুরণ বেশি হবে।*

আমরা জানি, সূর্যের আলোর মধ্যে রয়েছে বেগুনি, নীল, আসমানি, সবুজ, হলুদ, কমলা, লাল বর্ণের আলোর সংমিশ্রণ। এর মধ্যে বেগুনী আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মান সবচেয়ে কম। যার ফলে বায়ুমন্ডলের ভিতর দিয়ে গমন করার সময় বেগুনি বর্ণের আলো বেশি পরিমাণ বিচ্ছুরিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। লাল বর্ণের আলোক তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মান বেশি। ফলে অন্যান্য আলোর তুলনায় কম বিচ্ছুরিত/কম ছড়িয়ে পড়ে গমন করতে পারে। এই লাল আলো চাঁদের বুকে আপতিত হয় এবং

আপতিত আলোর নির্দিষ্ট শতাংশ আমাদের চোখে প্রতিফলিত আলোকরূপে আসলে, আমরা চাঁদকে লাল দেখতে পাই। সূর্য ডোবা কিংবা ওঠার সময় দিগন্ত লাল হয়ে যাওয়ার কারণও একই। শুধু পার্থক্য হলো সূর্য ডোবা বা ওঠার সময় আলো সরাসরি চোখে আসলেও পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণের সময় প্রতিফলিত আলো চোখে আসে।

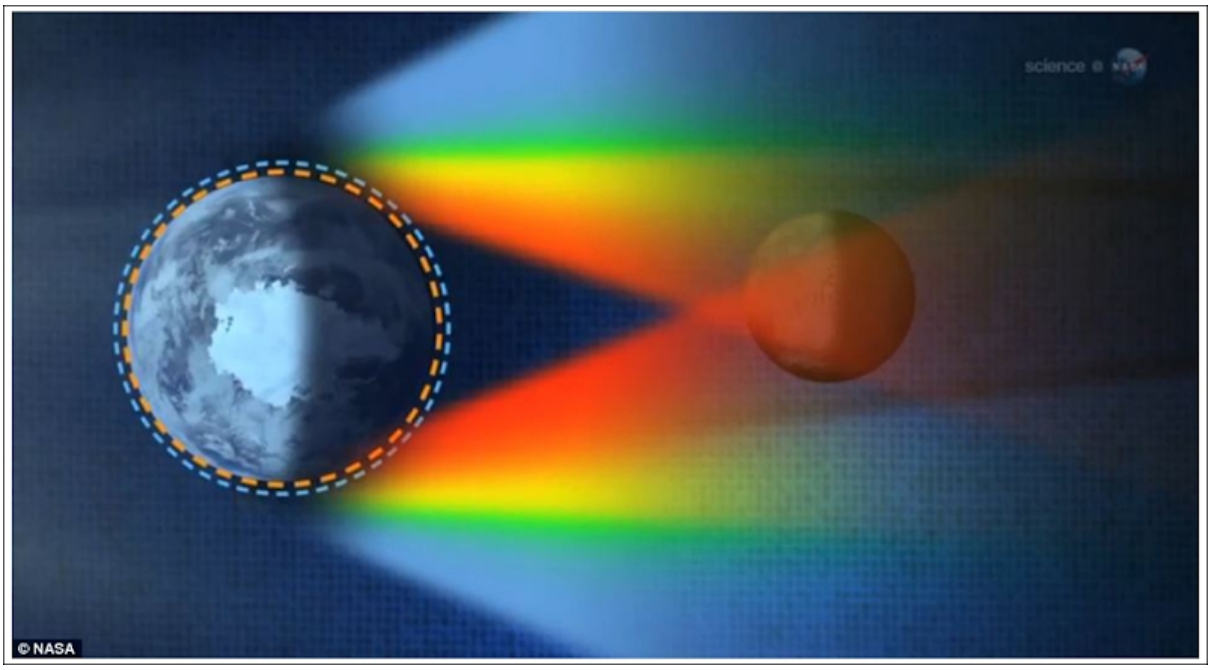

পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণের সময় চাঁদ যে সবসময় রক্তিম থাকে তা নয়। কমলা, কমলা-হলুদ ইত্যাদি রঙেরও হয়। মূলত কোন রঙ হবে সেটা নির্ভর করে বায়ুতে কোন উপাদান আছে কি পরিমানে তার উপর। পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণে কি রঙ দেখাবে সেটা পরিমাপ করার জন্য Danjon scale নামে এক পরিমাপ পদ্ধতি আছে। এটা এখন আলোচনা করবনা সামনের জন্য তুলে রাখলাম বিস্তৃত আলোচনার জন্য।

Earthshine

নতুন চাঁদ আকাশে উঠলে চাঁদটাকে আমরা কাস্তের মতো চাঁদ বলে থাকি! চাঁদ কাস্তের মতো হলেও মাঝে মাঝে চাঁদের পুরো চাকতিটা কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যায়। কাস্তের মতো অংশটি আলোকিত হলেও চাঁদের বাকি অংশটা কিন্তু আবছাভাবে আলোকিত দেখায়। খুবই আলোকিত অংশের তুলনায় ঐ অংশ খুবই অনুজ্জ্বল দেখালেও, পুরো চাঁদের চাকতিটা কিন্তু বেশ স্পষ্টভাবেই দৃষ্টিগোচর হয়। এই ঘটনাটিকে বলা হয় Earthshine।

Earthshine আলোর প্রতিফলনের জন্য ঘটা একটি আলোকীয় ঘটনা। একে ashen glow, the old moon in new moon's arm ও বলা হয়। Earth shine এর কারণ সর্বপ্রথম ব্যাখ্যা করেন লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি। তাই earthshine-কে দ্য ভিঞ্চি গ্লো নামেও ডাকা হয়। নতুন চাঁদ ওঠার কিছুদিন আগে থেকে কিছুদিন পর পর্যন্ত earthshine দেখা যায়। নতুন চাঁদ ওঠার আগে ভোরবেলা এবং নতুন চাঁদ ওঠার পরে সন্ধ্যাবেলা earthshine দেখা যায়।

পৃথিবী পৃষ্ঠে সূর্যের পতিত আলোর কিছু অংশ প্রতিফলিত, কিছু অংশ প্রতিসরিত এবং কিছু অংশ শোষিত হয়। এই কথাটি চাঁদের জন্যও প্রযোজ্য। সূর্যের আলো চাঁদের উপর পড়লে প্রতিফলিত অংশ যখন চোখে আসে, তখনই চাঁদকে দেখা যায়। কতটুকু আলো চন্দ্র চাকতি থেকে আসছে আমাদের চোখে সেটার উপর নির্ভর করে আবার চাঁদের কলা নির্ধারিত হয়। সূর্যের পতিত আলোর কত অংশ চাঁদ প্রতিফলিত করছে সেটা প্রকাশের জন্য Albedo নামে একটি টার্ম আছে। Albedo এর মান 0 থেকে 1 এর মাঝে থাকে। Albedo এর মান 0 হলে বুঝতে হবে ঐ মহাজাগতিক বস্তুটি কোনো আলোই প্রতিফলিত করে না। অর্থাৎ বস্তুটি পুরো অন্ধকার দেখাবে। আবার Albedo এর মান 1 হলে বোঝায় মহাজাগতিক বস্তুটি পৃষ্ঠে পতিত সমস্ত আলোই প্রতিফলিত করছে। এক্ষেত্রে বস্তুটি হবে প্রচুর উজ্জ্বল। আমাদের চাঁদের Albedo হলো 0.12। যার অর্থ চন্দ্রপৃষ্ঠে পতিত সূর্যালোকের ১২% আলো চাঁদ প্রতিফলিত করে। পৃথিবীর Albedo এর মান 0.30। অর্থাৎ পৃথিবী পৃষ্ঠে পতিত সূর্যালোকের 30% আলো পৃথিবী প্রতিফলিত করে। পৃথিবীর Albedo আবার স্থির নয়। যেহেতু Albedo প্রতিফলনের একটি পরিমাপ, তাই প্রতিফলকের উপরও Albedo নির্ভর করে। পৃথিবীতে আলোর প্রতিফলক হিসেবে কাজ করে মেঘ, সমুদ্র, ভূমি ইত্যাদি। যদি দেখা যায় মেঘের পরিমাণ কমে গেছে পৃথিবীর আকাশে তাহলে প্রতিফলনের মাত্রাও কমে যাবে। Albedo ও কমে যাবে। কারণ মেঘ সমুদ্র কিংবা ভূমি থেকে উত্তম প্রতিফলক। আবার মেঘের পরিমাণ বাড়লে Albedo ও বেড়ে যাবে। তদ্রুপ সমুদ্রের পানির পরিমাণ বাড়লে Albedo বাড়বে। পুরো পৃথিবী পানিতে তলিয়ে গেলে Albedo আরও বাড়বে! তার সাথে পুরো পৃথিবীর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে তো কথাই নেই! Albedo এর মান তখন অনেক বেশি হবে। কারণ সূর্যালোকের প্রতিফলন বাড়বে।

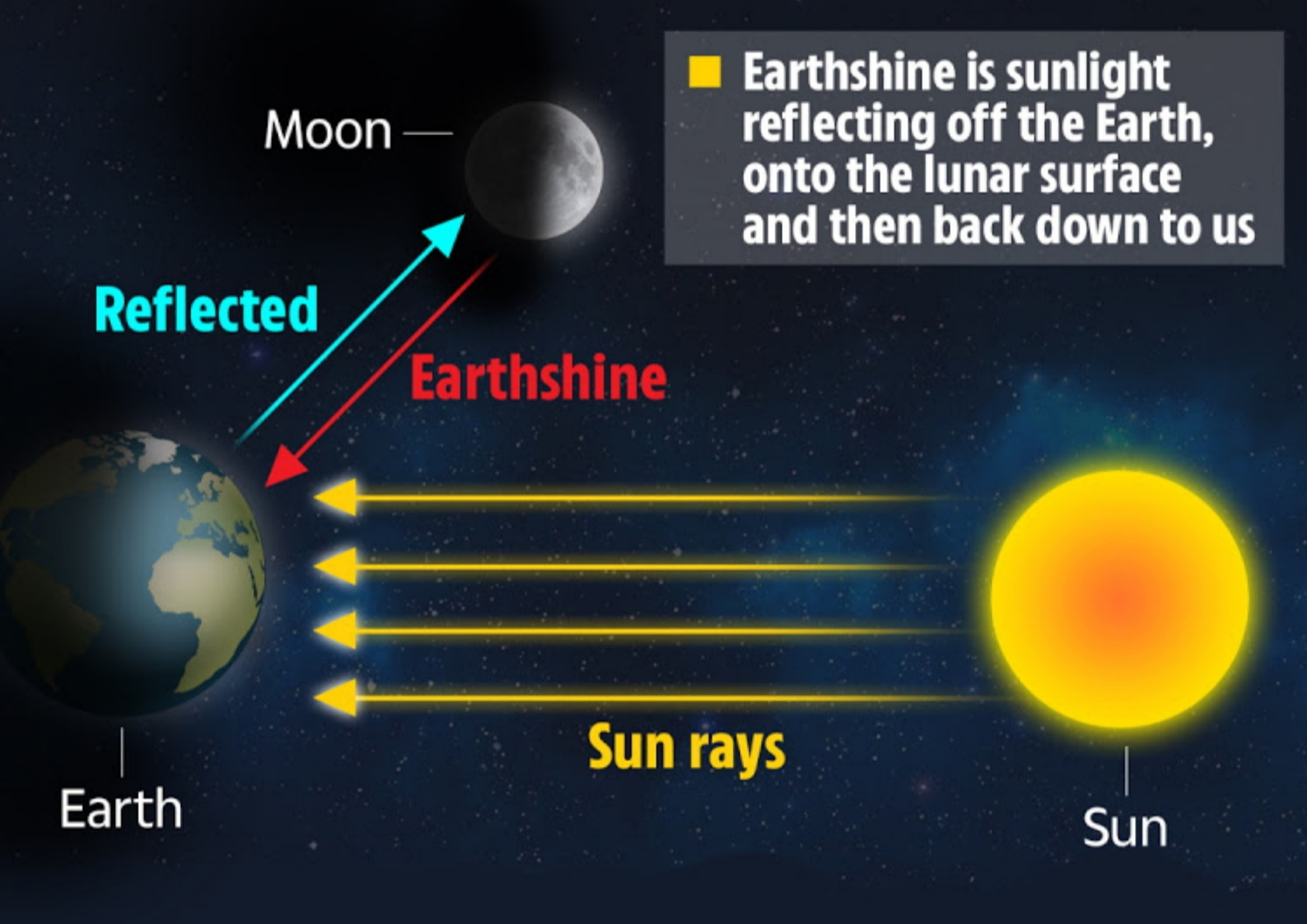
Earthshine is sunlight reflecting off the Earth, onto the lunar surface and then back down to us
Moon
Reflected
Earthshine
Sun rays
Earth
Sun

নতুন চাঁদ উঠলে চাঁদের সরু এক ফালি থেকে আলো আমাদের চোখে আসে। এটা সানশাইন কারণ এটি সূর্যের আলো চাঁদের পৃষ্ঠ হতে সরাসরি প্রতিফলন (১২%)। আমাদের পৃথিবীও তো যথেষ্ট পরিমাণ আলো প্রতিফলিত করে। এই প্রতিফলিত আলোর কিছু অংশ আবার চাঁদের বুকে যায়! যেহেতু চাঁদ পতিত আলোর ১২% প্রতিফলিত করবে, তাই পৃথিবীর এই আলোর 12% চাঁদ আবার প্রতিফলিত করবে। এই প্রতিফলনের ফলে আলোর উজ্জ্বলতা যথেষ্ট পরিমাণ কমে যাবে। এই কম উজ্জ্বলতার কারণে চাঁদের অন্ধকার অংশও সামান্য আলোকিত মনে হবে। অর্থাৎ চাকতির আকারটা মোটামুটি বোঝা যাবে। তাহলে earthshine হওয়ার কারণ এভাবে বলা যায়:

১. সূর্য হতে পৃথিবীতে আপতিত আলোর ৩০% প্রতিফলিত হয়।

২. এই প্রতিফলিত আলো চাঁদে আপতিত হয়।

৩. সেখান থেকে আবার প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে পৌঁছায়। এটাই মূলত earthshine এর কারণ।

Earthshine এর উজ্জ্বলতা নির্ভর করবে পৃথিবী কত অংশ আলো প্রতিফলিত করতে পারছে তার উপর। পৃথিবী যত বেশি শতাংশ আলো প্রতিফলিত করবে earthshine ও ততই উজ্জ্বল দেখাবে। উপরে দেখেছি যদি মেঘের পরিমাণ বাড়ে তাহলে Albedo বাড়বে। সুতরাং earthshine এর উজ্জ্বলতাও বাড়বে। বছরের কোনো সময় যদি দেখা যায় earthshine তেমন একটা বোঝা যাচ্ছে না তাহলে বুঝতে হবে পৃথিবীর আকাশে মেঘ কম। হঠাৎ কোন মাসে earthshine উজ্জ্বল হলে বুঝতে হবে আকাশে মেঘ বেড়ে গেছে। মেঘের পরিমাণ যদি না বাড়ে তাহলে বুঝতে হবে কোনো বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়েছে। এভাবে earthshine থেকে আবহাওয়ার অবস্থা ধারণা করা যায়। জলবায়ু বিজ্ঞানীদের কাছে earthshine খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘ কয়েক বছরের earthshine এর উজ্জ্বলতা রেকর্ড করে বছরের সাথে সাথে পৃথিবীর Albedo কেমনভাবে পরিবর্তন হচ্ছে সেটা বোঝা যায়। পৃথিবীতে সৌরশক্তির বন্টন কীভাবে হচ্ছে সেটা হিসাব করা যায়। মরু অঞ্চল বাড়ছে নাকি প্লাবিত অঞ্চল বেড়ে যাচ্ছে সেটা বলা যায়। Albedo এর গ্রাফ থেকে ভবিষ্যতে আবহাওয়া গরম হবে নাকি ঠান্ডা হবে সেটাও বোঝা যায়। কারণ আলোর প্রতিফলন মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্কের উপর নির্ভরশীল। এসব কারণে earthshine খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে আমাদের মতো খালি চোখে আকাশ দেখা মানুষের জন্য চাঁদের এমন মৃদু আলোই যথেষ্ট।

> *এ বছর এপ্রিলের ১১, ১২ তারিখ এবং মে মাসের ১১, ১২ তারিখ earthshine দেখার উপযুক্ত সময়।*

Twilight

অনেকেই আমরা খেয়াল করেছি যে, সূর্য ডুবে যাওয়ার পরও কিন্তু দিনের আলো পুরোপুরি যায় না। সূর্য ডোবার পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু হালকা আলো থাকে। একে সাহিত্যের ভাষায় গোধূলি লগ্ন বলা হয়। এই সময়টি সূর্য ডোবা হতে রাত এই দুই সময়ের মধ্যবর্তী সময়। আবার সকাল বেলায় সূর্য ওঠার আগেই দিনের আলো প্রকাশিত হয়। এসময়টিকে উষা বলা হয়। কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভাষায় এসব উষা বা গোধূলি বলার কোনো সুযোগ নেই। সূর্য দিগন্তের নিচে থাকলেও সূর্যের আলো যতক্ষণ সময় থাকে, এ সময়টিকে Twilight বলা হয়।

সূর্য দিগন্তের নিচে থাকা অবস্থায় সূর্যের আলো বায়ুমণ্ডল এর স্তরে প্রতিফলিত ও বিচ্ছুরিত হয়ে আমাদের চোখে পৌঁছায়। ফলে আলোকিত আবহ তখনও বজায় থাকে। হিসাব করে দেখা যায়, সূর্য ডুবে দিগন্তের ১৮ ডিগ্রি নিচে যাওয়া পর্যন্ত সূর্যের আলো থাকে। আবার সকালে সূর্য ওঠার আগে সূর্য দিগন্তরেখা হতে ১৮ ডিগ্রি নিচে থাকা অবস্থায়ই সূর্যের আলো প্রকাশ পায়। পৃথিবী সূর্যের চারপাশে উপবৃত্তাকার কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে। পৃথিবীর মানুষের কাছে মনে হবে সূর্যই যেন পৃথিবীর চারদিকে পরিভ্রমণ করছে। এই যে সূর্যের আপাত গতিপথ, এই গতিপথ একটা বিশাল বড়ো বৃত্ত রূপে কল্পনা করা হয়। পৃথিবী আবার নিজ অক্ষে ঘূর্ণনরত। ফলে আমাদের কাছে মনে হয়, সূর্যই যেন আমাদের চারপাশে ২৪ ঘন্টায় একটি ঘূর্ণন সম্পন্ন করল। সূর্যের প্রতিদিনের এই আপাত গতিও আমাদের কাছে বৃত্তাকার বলে মনে হবে। উপরে যে ১৮ ডিগ্রির কথা বলেছি, তা এই বৃত্তপথেই ১৮ ডিগ্রি বোঝায়।

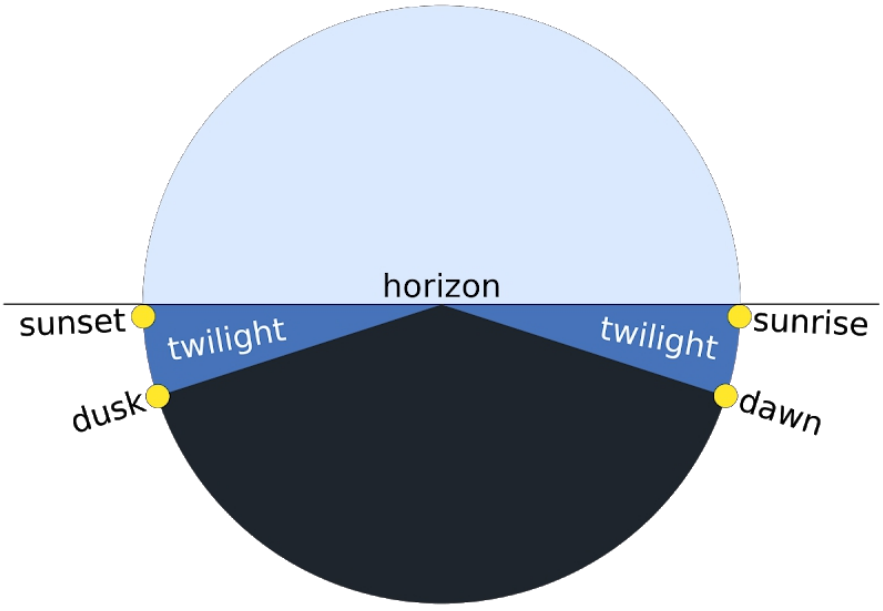

এবার একটা মজার বিষয় লক্ষ্য করা যাক। উপরের আলোচনা হতে এটি স্পষ্ট যে, দিগন্তরেখার ১৮ ডিগ্রি নিচে থাকা অবস্থা পর্যন্ত সূর্যের আলো প্রকাশ পায়। আরও দেখেছি সূর্য আমাদের কাছে আপাত বৃত্তপথে ভ্রমন করে। এবার ধরুন, সূর্য ডুবে যাওয়ার পর দিগন্তের নিচে ৬০ ডিগ্রি ভ্রমন করল। তাহলে যেহেতু ডোবার পর ১৮ ডিগ্রি এবং ওঠার আগে ১৮ ডিগ্রি সূর্যের আলো থাকে, তাই রাতের অন্ধকার থাকবে সূর্যের দিগন্তের নিচে ৬০-(১৮+১৮)= ২৪ ডিগ্রি ভ্রমণে যত সময় লাগে ঠিক ততই সময়। তাহলে ধরুন সূর্য দিগন্তের নিচে ৩৬ ডিগ্রি ভ্রমণ করল। সূর্য ডোবার পর আলো থাকবে ১৮ ডিগ্রি পর্যন্ত আবার সূর্য ওঠার আগে আলো থাকবে দিগন্তের ১৮ ডিগ্রি নিচে থাকা অবস্থায়। তাহলে রাতের আলো থাকবে সূর্যের ৩৬-(১৮+১৮)=০ ডিগ্রি ভ্রমণ করতে যে সময় লাগে সেই সময় অর্থাৎ ০। সুতরাং, এক্ষেত্রে রাত হবে না! সূর্যের আলো থাকবে সারা রাত। এই বিষয়টিকে ইংরেজি সাহিত্যে বলা হয় শ্বেতরাত্রি। অবশ্য বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে শ্বেতরাত্রি আমাদের ভাগ্যে হবে না। কী দারুণ ব্যাপার! সারা রাত থাকবে গোধূলী ও উষার সমন্বয়। আসলে খেয়াল করলে বুঝবেন, সূর্য দিগন্তের নিচে ৩৬ ডিগ্রি এর কম ভ্রমণ করলেই এই শ্বেতরাত্রি পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব। তবে Twilight এর ও বিভিন্ন ধরন আছে। সেটা আলোকীয় ঘটনাবলিতে পরে আলোচনা করা হবে। তবে এখানে যে Twilight এর কথা বলা হলো সেটা Astronomical twilight।

Parallax

খ্রিষ্টপূর্ব ১৮৯ সালের মার্চ মাসের ১৪ তারিখের কথা। Hipparchus জন্মস্থান হেসেলপয়েন্ট (বর্তমান তুর্কির অংশ) এ পূর্ণ সূর্যগ্রহণ দেখা গেছে। কিন্তু খবর পাওয়া গেল বহু দূরের শহর আলেকজান্দ্রিয়ার লোকজন পূর্ণ সূর্যগ্রহণ দেখেনি। তারা আংশিক সূর্যগ্রহণ দেখেছে। আলেকজান্দ্রিয়ার লোকদের ভাষ্য অনুযায়ী সূর্য আংশিকভাবে ঢেকে গিয়েছিল। সূর্যের প্রায় ১/৫ অংশ আলোকিত ছিল কিন্তু বাকি অংশ অন্ধকার ছিল বলেই তাদের ভাষ্য। জ্যোতির্বিদ হিপারকাস শুনলেন এ খবর। তৎকালীন নাবিকদের কল্যাণে তার এ কথা জানা ছিল যে মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া শহর তার নিজের শহরের উত্তর দিকে অবস্থিত। আবার অক্ষাংশ এর পার্থক্য থেকে তিনি জানতেন আলেকজান্দ্রিয়া এবং হেসেলপয়েন্ট শহর দুটি পৃথিবীর কেন্দ্রে ৯° কোণ তৈরি করে। *A history of astronomy* বইতে লেখক উল্লেখ করেন মাত্র এ কয়টি তথ্য দিয়েই সহজ জ্যামিতির সাহায্যে হিপারকাস বের করেন যে, পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব পৃথিবীর ব্যাসার্ধের ৬২ থেকে ৭৩ গুণ। আধুনিক হিসাব মতে, পৃথিবী থেকে চাঁদ গড়ে পৃথিবীর ব্যাসার্ধের ৬০ গুণ দূরে অবস্থিত। যা হিপারকাস এর প্রাপ্ত মানের অনেকটাই কাছাকাছি। খালি চোখে আকাশ পর্যবেক্ষণ করে এসব ক্যালকুলেশনে ত্রুটি হওয়াই স্বাভাবিক কিন্তু এটা যে তখন জ্যোতির্বিদ্যায় অভূতপূর্ব ছিল তা সহজেই বোঝা যায়।

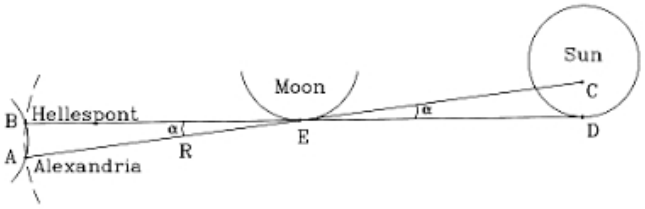

হিপারকাসের জ্যোতির্বিদ্যায় অসাধারণ আরও কিছু অবদান আছে। সেগুলো আলোচ্য নয়। যাই হোক হিপারকাসের হিসাব থেকে তো চাঁদের দূরত্ব জানা গেল। যে পদ্ধতিতে এটা বের করা হয়েছিল সেই পদ্ধতি ছিল parallax পদ্ধতি।

একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ কল্পনা করুন। যার AB ভূমি এবং C বিন্দু শীর্ষ। C হতে AB এর উপর লম্ব CD। ধরি লম্বের দৈর্ঘ্য d এবং AB এর দৈর্ঘ্য a। তাহলে ত্রিকোণমিতির সূত্র মতে লেখা যায়,

$$\tan \measuredangle DCB = \left(\frac{a}{2}\right)\Big/ d$$

$$\text{আবার } \measuredangle DCB = \frac{1}{2}\measuredangle ACB$$

এবার ধরুন আপনি একদিন নদীর একপাড়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আপনার পাড়ের দিকে $A,\ B$ বিন্দু এবং বিপরীত পাড়ে C বিন্দু। তাহলে নদীর প্রস্থ d. এবার $\measuredangle ACB$ এর মান জানলে এবং AB এর মান পরিমাপ করতে পারলেই d এর মান উপরের সুত্র হতে বের করা যাবে। একটি ব্যাপার লক্ষ্যনীয়: আপনি A অবস্থানে থাকা অবস্থায় C বিন্দুকে লক্ষ্য করে AC রেখা টেনেছিলেন। আবার B তে থাকা অবস্থায় C কে লক্ষ্য করে BC রেখা টেনেছিলেন। যেহেতু $A,\ B$ আলাদা দুটি বিন্দু তাই $\measuredangle ACB$ উৎপন্ন হয়েছিল। আচ্ছা, এবার ধরুন A ও B এর মধ্যবর্তী দূরত্ব ২০০ মিটার কিন্তু d এর মান ২০০ আলোকবর্ষ! তাহলে $\measuredangle ACB$ এর মান অনেক ক্ষুদ্র হবে। এমন ক্ষুদ্র হয়তো আপাত দৃষ্টিতে উপেক্ষনীয় মনে হতে পারে কিন্তু তারার দূরত্ব নির্ণয় করতে এই ক্ষুদ্র কোণেরই প্রয়োজন পড়ে।

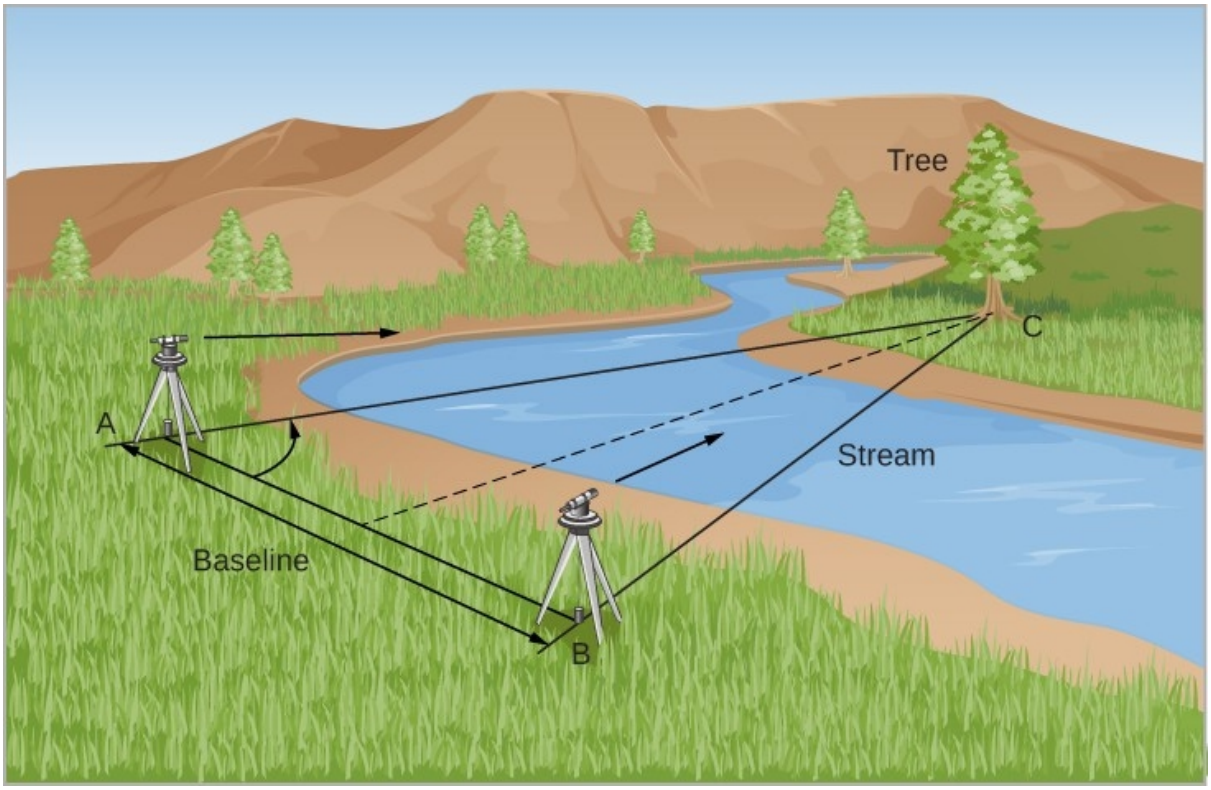

জানুয়ারি মাসে পৃথিবী সূর্যের সবচেয়ে কাছের অবস্থানে চলে যায়। একে **অনুসূর** অবস্থান বলা হয়। আবার প্রায় ৬ মাস পর জুলাই মাসে পৃথিবী সূর্যের সবচেয়ে দূরের বিন্দুতে থাকে। এটা **অপসূর** অবস্থান। ধরা যাক, অনুসূর অবস্থায় একটি তারা লক্ষ্য করা হলো। অনুসূর অবস্থানটি আমাদের পূর্বোল্লিখিত ত্রিভুজের A বিন্দু এবং তারাটি C বিন্দু। আবার ছয়মাস পর **অপসূর** অবস্থান B থেকেও তারাটি লক্ষ্য করা হলো। তাহলে $\measuredangle ACB$ একটি কোণ তৈরি করবে। আবার গড় হিসাবে AB এর মান $2\ AU$ (পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব $1\ AU$) । এবার ত্রিকোণমিতি ব্যবহার করে সহজেই তারাটির দূরত্ব মাপা যায়। $\measuredangle DCB$ কে parallax angle বলা হয়। সুতরাং ,

$$tan\ \measuredangle DCB\ = \frac{1}{d}$$

আমরা জানি তারাগুলো বহু দূরে অবস্থিত। তাই $\measuredangle DCB$ এর মানও খুব ক্ষুদ্র হয়। এ কারণে $\measuredangle DCB$ কে arc second এককে প্রকাশ করা হয়। জেনে রাখা ভালো: **১ ডিগ্রিকে সমান ৩৬০০ ভাগে ভাগ করা হলে ১ আর্কসেকেন্ড পাওয়া যায়!** বোঝাই যাচ্ছে কতটা ক্ষুদ্র। আবার আমরা জানি P এর মান যত ছোটো হবে $tan\ P$ এর মান ততই P এর কাছাকাছি যেতে থাকবে। এখন parallax কোণ $\measuredangle DCB$ কে P দ্বারা প্রকাশ করলে পাই,

$$tan\ P\ = \frac{1}{d}$$

P অতি ক্ষুদ্র বলে, $tan\ P\ \approx\ P$

তাই, $P = \frac{1}{d}$

সুতরাং $d = \frac{1}{P}$

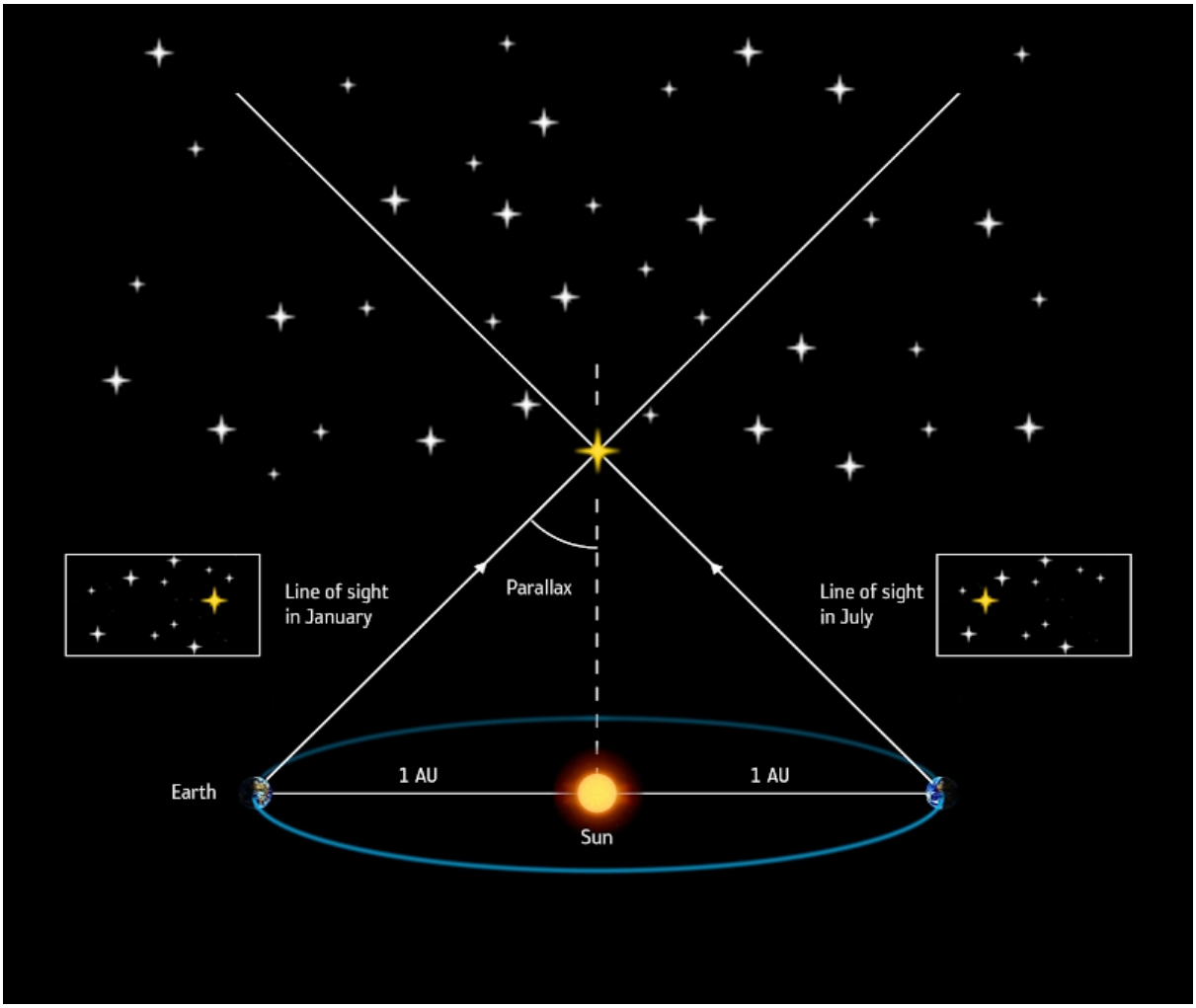

এটাই তারার দূরত্ব নির্ণয়ের সূত্র। এখানে d কে পার্সেক এককে প্রকাশ করা হয়।

> *1 parsec =3.26 আলোকবর্ষ*

ধরা যাক, কোন তারার প্যারাল্যাক্স অ্যাঙ্গেল ০.০৩৪ আর্কসেকেন্ড। তাহলে তারাটি ১/০.০৩৪=২৯.৪ পার্সেক বা ৯৫.৮৮ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত ।

এই পদ্ধতির সীমাবদ্ধতাও আছে কিছু। ত্রুটি আসে অনেক সময়। কিন্তু parallax পদ্ধতি খুবই কার্যকরী এবং পুরোপুরি নির্ভুল না হলেও প্রায় কাছাকাছি মান পাওয়া যায়। parallax এর এই পদ্ধতিটিকে Stellar parallax পদ্ধতি বলা হয়। আরও অনেক ধরণের প্যারালাক্স আছে। সেগুলো যথাসময়ে আলোচিত হবে।

উপরের আলোচনা থেকে যদি বোঝা না যায়, তাহলে দূরে কোনো গাছের দিকে তাকান এবং নিজের হাতের একটি আঙ্গুল কোনো একটি গাছ বরাবর রাখুন। এবার ডান চোখ বন্ধ করুন এবং আঙ্গুলের অবস্থান খেয়াল করুন। এবার বাম চোখ বন্ধ করে আঙ্গুলটি কোথায় সেটি দেখুন। দেখবেন আঙ্গুলটি আপনার কাছে মনে হবে যেখানে তাক করা হয়েছিল সেখানে নেই। পিছনের দৃশ্যপটের সাথে আঙ্গুলের এই পরিবর্তন হিসাব করে যেমন আপনার চোখ থেকে আঙ্গুলের দূরত্ব বের করা যায়, তেমনই হলো এই প্যারাল্যাক্স বা লম্বন পদ্ধতি। আশা করি সহজে বোঝা যাবে।

Left Eye View

Right Eye View

চাঁদের যত নাম

চাঁদের দিকে তাকিয়ে বিমোহিত হতে কার না ভালো লাগে! বছরের পর বছর ধরে বিভিন্ন সংস্কৃতিতে জ্যোতির্বিদ্যা চর্চা হয়ে আসছে। এগুলো ঐতিহ্যের সাথে এতটাই নিবিড়ভাবে জড়িত যে ধর্মীয় দিক কিংবা বাস্তবজীবনের কর্মকান্ডের সাথে চন্দ্র সুর্যের সংযোগ ছিল লক্ষ্যণীয়। এরই ফলশ্রুতিতে পৃথিবীতে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন সংস্কৃতিতে চাঁদকে মাস অনুযায়ী বিভিন্ন নাম দেওয়া হয়। এক এক মাসে চাঁদের নাম এক এক। এর মাধ্যমে চাঁদকে আলাদা বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করার প্রবনতা যেন স্বকীয়তারই বহিপ্রকাশ। নেটিভ আমেরিকানদের প্রদত্ত মাস অনুযায়ী চাঁদের নামেই মূলত এখন অব্দি চাঁদকে বিভিন্ন নামে ডাকা হয়। এছাড়া বিভিন্ন উপজাতিদের কাছে, বিভিন্ন উপমহাদেশে নামও কিন্তু বিভিন্ন। তবে মূল উদ্দেশ্য থাকবে এখন পর্যন্ত প্রচলিত নামগুলোর প্রতি দৃষ্টি রাখা।

Wolf moon- জানুয়ারি মাসের পূর্ণচন্দ্রকে বলা হয় wolf moon বা নেকড়ে চাঁদ। এই সময় চাঁদকে নেকড়ে চাঁদ বলা হয় কারণ নেকড়ের ডাক এই সময় রাতের বেলায় প্রায় শোনা যায়, যা প্রতিধ্বনিত হয়ে এক অদ্ভুত পরিবেশের সৃষ্টি করে।

এখন পর্যন্ত বহু লোকের ধারণা নেকড়ের দলেরা ক্ষুধার কারণে ডাকাডাকি করে কিন্তু বর্তমানে আমরা জানি এসময় নেকড়েরা নিজেদের সামাজিক বন্ধন দৃঢ় করতে, নিজেদের এলাকার প্রতি কর্তৃত্ব বজায় রাখতে তারা নিজেদের ভাষায় গর্জন করতে থাকে। wolf moon কে ice moon, old moon, snow moon, moon after yule ইত্যাদি নামেও অভিহিত করা হয়। yule বা juul আধুনিক ক্রিসমাস উদযাপন থেকে অনুপ্রাণিত উৎসব।

Snow moon: ফেব্রুয়ারির পূর্ণচন্দ্রকে snow moon বলা হয়। snow moon বলার কারণ হলো ফেব্রুয়ারি মাসের অতিরিক্ত তুষারপাত। গড় হিসেবে ফেব্রুয়ারি মাসকে সবচেয়ে তুষারপাতের মাস বলা হয় আমেরিকায়। বছরের অন্যান্য সময়ের চেয়ে ফেব্রুয়ারি মাসে সবচেয়ে বেশি তুষারপাত হওয়ার কারণে snow moon ডাকা হয়।

snow moon কে Eagle moon, Bear moon, Raccoon moon, Goose moon, Groundhog moon নামেও ডাকা হয়। খারাপ আবহাওয়া এবং অতিরিক্ত তুষারপাতের কারণে এসময়,শিকার করা দুঃসাধ্য বলে এ সময়ের পূর্ণচন্দ্রকে ক্ষুধার্ত চাঁদ বা hunger moon ও বলা হয়

Worm moon: মার্চ মাসের প্রথম পূর্ণচন্দ্রকেই Worm moon (কেঁচো চাঁদ)। এই অদ্ভুত নামকরণ করার কারণ হলো স্থানীয়ভাবে প্রচলিত যে, এই সময়ই ভুগর্ভস্থ কেঁচোর দল বাইরে বেরিয়ে আসতে শুরু করে (কারণ তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে)। কেঁচোর ইংরেজি হলো earthworm। তাই একসময়ের চাঁদকে worm moon বলা হয়। অধিকাংশ আমেরিকান উপজাতি আবার এই মাসের চাঁদকে crow moon নামেও ডেকে থাকে। কারণ শীতের শেষের এই মৌসুমে কাকের ডাক শোনা যায় নতুন করে।

এই চাঁদকে "শীতকালের সর্বশেষ চাঁদ" -ও বলা হয়। এছাড়াও Full crust moon, Full sap moon হরেক নামে ডাকা হয় worm moon কে।

Pink moon: গোলাপি চাঁদ নামকরণের কারণ হলো এক ধরনের গোলাপি বন্য ফুল এপ্রিল মাসে কানাডা এবং আমেরিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে শোভা পায়। এই ফুটন্ত ফুল বসন্তের প্রথমদিকে ফোঁটে। এই ফুলটির বৈজ্ঞানিক নাম *Phlox subulata*।

এছাড়া Egg moon, Fish moon ইত্যাদি নামও রয়েছে।

চিত্র *Phlox subulata* ফুল

Full flower moon: বসন্ত চলে এসেছে। ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে গোটা সমভূমি। ফুলের প্রাচুর্যতার কারণেই মে মাসের পূর্ণচাঁদ Full flower moon নামে পরিচিত।

Budding moon, frog moon, Egg lying moon, corn planting moon, milk moon হরেক রকম নামও আছে Flower moon এর।

Strawberry moon: জুন মাসে স্বল্প সময় পাওয়া যায় উত্তর পূর্ব আমেরিকার মানুষের কাছে স্ট্রবেরি সংগ্রহ করার জন্য। স্ট্রবেরির সাথে মিল রেখে এর নাম স্ট্রবেরি চাঁদ। Rose moon, honey moon, Sweetest moon এমন আরও নাম আছে।

হিন্দু ধর্মে এ সময় ভাট পূর্ণিমা পালন করা হয়। পূর্ণ চাঁদের এ সময়টিতে স্ত্রীরা স্বামীর প্রতি ভালেবাসার দৃষ্টান্ত হিসেবে নানা ধরনের আচার অনুষ্ঠান পালন করে। এছাড়া বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীদের কাছেও গুরুত্বপূর্ণ। এসময় শ্রীলঙ্কায় ছুটির দিন ঘোষণা করে বৌদ্ধ মতাদর্শের সূচনালগ্নকে স্মরন করা হয়।

Buck moon: জুলাই মাসের চাঁদকে buck moon বলা হয়। Buck এর বাংলা প্রতিশব্দ হরিণ। বিশেষত পুরুষ হরিণকে Buck বলা হয়। বছরের এ সময়টিতে হরিণের নতুন শিং গজায় বলে এসময় চাঁদের নাম Buck moon। বছরের এই সময়টিতে ঝোড়ো আবহাওয়া, বজ্রবৃষ্টির আধিক্য ও দেখা যায় বলে এই পূর্ণ চাঁদকে Thunder moon ও বলা হয়। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে এই সময়টি গুরু পূর্নিমা পালনের সময়। বৌদ্ধদের জন্য এই দিনটি কে ধর্ম দিনও বলা হয়।

Sturgeon moon: sturgeon এক প্রকার মাছ। বছরের এই মাসের পূর্ণিমার সময়ে হ্রদগুলোতে প্রচুর পরিমাণে বৃহদাকার Sturgeon মাছ ধরা পড়ে। তাই এই চাঁদের নাম sturgeon moon। এসময় চাঁদকে full green corn moon, wheat cut moon, blueberry moon ইত্যাদি নামেও ডাকা হয়।

Full corn moon: ভুট্টা সংগ্রহ করার সময় সেপ্টেম্বর মাস। তাই Full corn moon বলা হয়।

Hunter's moon: শীতকাল অতি নিকটে। শিকারে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে হবে। এই মাসের পূর্ণচাঁদ তারই সংকেত দিচ্ছে। গত মাসে শস্য সংগ্রহ করেছ কৃষকরা। তাই এ মাসে বিস্তৃত সমভূমি চোখের সামনে ফাঁকা পরে আছে। তাই শিকার করার জন্য উপযোগী। এ কারণে এ মাসের পূর্ণচাঁদকে Hunters moon বলা হয়। এছাড়া Travel moon, Dying grass moon নামেও ডাকা হয়।

Beaver moon: সামনেই আসছে ভয়ানক তুষারপাত। খাদ্য জমিয়ে রাখতে হবে ভবিষ্যতের জন্য। তাই বিভারদের ব্যস্ততা বেড়ে গেছে প্রচুর পরিমাণে। শীতের জন্য আশ্রয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে ওরা। ওদের নামানুসারে নভেম্বরের পূর্ণচাঁদকে Beaver moon বলা হয়।

চিত্র Beaver

Cold moon: ভয়ানক ঠান্ডা পড়ে গেছে। ডিসেম্বরের শেষের দিকে দীর্ঘ রাত আসছে উত্তর গোলার্ধে। তাই এই সময়ের পূর্ণ চাঁদকে Long night moon ও বলে। Moon before yule, Winter maker moon ইত্যাদি নামেও একে ডাকা হয়।

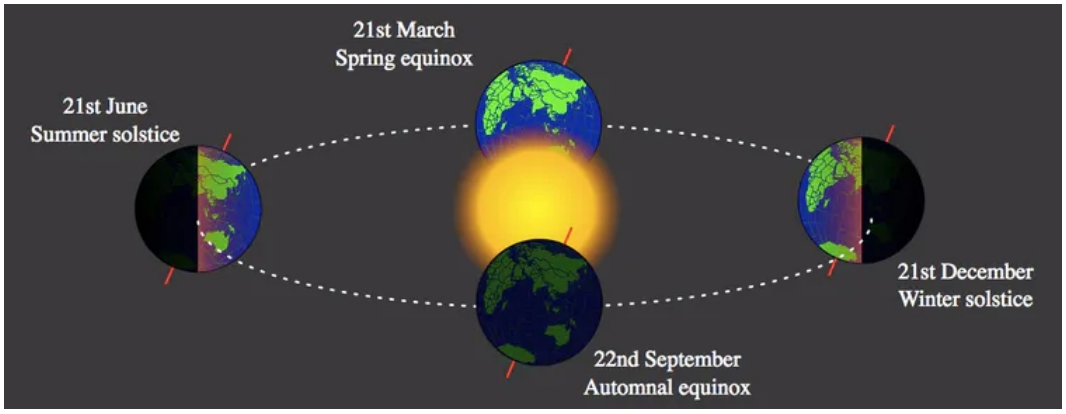

চিত্র ২১ ডিসেম্বর উত্তর গোলার্ধে সবচেয়ে দীর্ঘ রাত

চিত্র বড়োদিনের তাৎপর্যমন্ডিত এই মাসের পূর্ণচাদ।

এই হলো ১২ মাসে চাঁদের ১২ নাম। একটা ব্যাপার লক্ষ্যণীয় যে pink moon মানে গোলাপি চাঁদ হলেও চাঁদের রং কিন্তু গোলাপি নয়। তেমনি কেঁচো চাঁদের (Earthworm moon) সময় চাঁদের বুকে কেঁচো হেঁটে বেড়াতেও দেখতে পাবেন না। চাঁদ সারাবছর যেমন ছিল তেমনই থাকবে। শুধুমাত্র গ্রহণের সময় রঙটা সর্বসাকুল্যে রক্তিম হতে পারে। এর বেশি কিছু নয়। আরও একটি নামে চাঁদকে ডাকা হয়। নামটি হলো ব্লু মুন। ব্লু মুন মানে নীল চাঁদ হলেও চাঁদের রং নীল নয়। একই মাসে দুইদিন পূর্ণচাঁদ দেখা গেলে ২য় পূর্ণচাঁদটিকে বলা হয় ব্লু মুন। ইদানিং বিভ্রান্তির অন্ত নেই। অনেকেই বলে আগামীকাল চাঁদের রং নীল হবে যা এত এত বছর পরে আবার দেখা যাবে। এসব কথায় কান না দিয়ে আসল বিষয় খুঁজে বের করা জরুরি।

সারোস

চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণ যাই হোক না কেন আমাদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে সবসময়। এই মহাজাগতিক ঘটনার সাথে রয়েছে এক সুমধুর গাণিতিক সৌন্দর্য। সারোস চক্র আমাদের ভাবাবে গ্রহণ সম্বন্ধে। ভবিষ্যদবাণী করবে পরের গ্রহণের। তবে তার আগে জানতে হবে জ্যোতির্বিদ্যায় ব্যবহৃত মাসগুলো সম্পর্কে। তারপরই সারোস চক্রের আলোচনায় যাবো আমরা।

Synodic **পর্যায়কাল**: এটা বুঝতে আমরা নিচের চিত্রটি বিবেচনা করি।

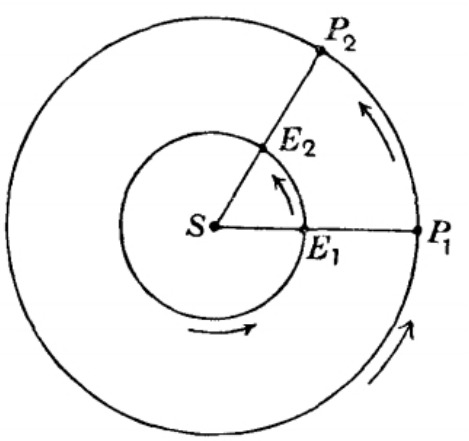

S দ্বারা সূর্যকে বোঝানো হয়েছে। E1 এবং P1 দ্বারা যথাক্রমে পৃথিবী এবং একটি বহির্গ্রহ দেখানো হয়েছে। বহির্গ্রহ বা আউটার প্লানেট বলতে মঙ্গলের পর থেকে বাকি গ্রহগুলোকে বোঝায়।

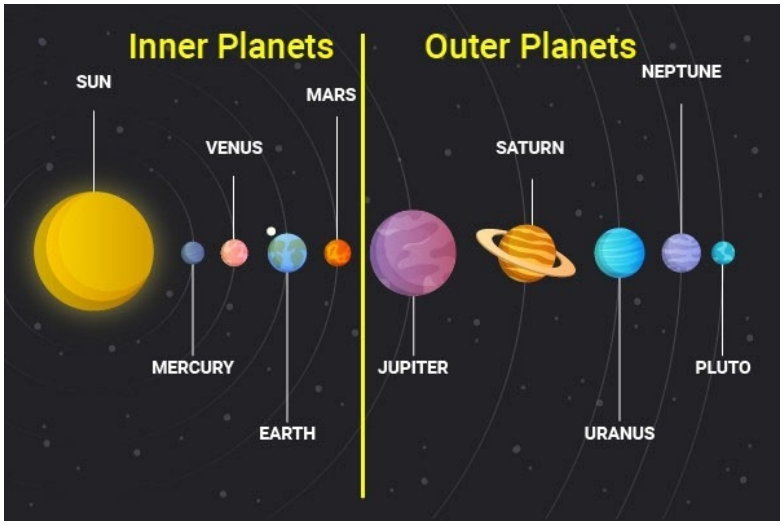

E_1 এবং P_1 এর এমন একটি অবস্থান দেখানো হয়েছে যেখানে সূর্য, পৃথিবী এবং গ্রহটি একই সরলরেখায় অবস্থান করে। (একে heliocentric conjunction বলে)। ধরা যাক, কোনো একদিনে সূর্য, পৃথিবীর এবং গ্রহটি একই সরলরেখায় অবস্থান করছে। তখন সময় রেকর্ড করা হলো। ধরা যাক সময়টি হলো t_1। সময় বয়ে যাওয়ার সাথে সাথে গ্রহের এই সরলরেখা বরাবর অবস্থান এর পরিবর্তন হবে। ধরা যাক পরবর্তী কোনো এক সময় t_2 তে পৃথিবী E_2 অবস্থানে এবং গ্রহটি

P_2 অবস্থানে গিয়ে আবারও সূর্যের সাথে সরলরেখা গঠন করল। যেহেতু সূর্য হতে P গ্রহটি পৃথিবীর চেয়ে দূরে অবস্থিত তাই পৃথিবীর চেয়ে P গ্রহটির বেগ কম। বেগ কম হওয়ার কারণে পৃথিবী হয়তো একটি ঘূর্ণন সম্পন্ন করতে পারবে কিন্তু বাইরের গ্রহটি ততক্ষণে একটি ঘূর্ণন সম্পন্ন করতে পারবেনা। তাই P গ্রহটি P_1 থেকে যখন P_2 অবস্থানে আসলো ততক্ষণে পৃথিবী (E) একটি ঘূর্ণন সম্পন্ন করে E_1 এ পুনরায় এসে আবার E_2 অবস্থানে যায় এবং S E_2 P_2 সরলরেখা গঠন করে। ধরা যাক, এই সময়টি t_2। তাহলে আমরা বলতে পারি t_2-t_1 সময় ব্যবধানে সূর্য, পৃথিবী এবং গ্রহটি দুই বার একই সরলরেখায় আসবে।

এবার ধরি, পৃথিবীর পর্যায়কাল T_e এবং গ্রহটির পর্যায়কাল T_p। তাহলে পৃথিবীর কৌণিক বেগ $\frac{2\pi}{T_e}$ এবং গ্রহটির কৌণিক বেগ $\frac{2\pi}{T_p}$

এবার $\measuredangle E_2SE_1 = \left(\frac{2\pi}{T_p}\right) \times (t_2 - t_1)$ [গ্রহটির জন্য]

এবং $2\pi + \measuredangle E_2SE_1 = \left(\frac{2\pi}{T_e}\right) \times (t_2 - t_1)$ [পৃথিবীর জন্য]

যেহেতু পৃথিবী অতিরিক্ত একটি ঘূর্ণন সম্পন্ন করেছে তাই 2π যোগ করা হয়েছে।

এবার উপরের সমীকরণ দুটি হতে পাই,

$$(t_2 - t_1) \times \left(\frac{1}{T_e} - \frac{1}{T_p}\right) = 1$$

$$\text{বা, } \frac{1}{S} = \frac{1}{T_e} - \frac{1}{T_p}$$

এখানে $t_2 - t_1 = S$

এই S কেই synodic পর্যায়কাল বলা হয়।

তাহলে সহজ ভাষায় বলা যায়, দুটি পরপর heliocentric conjunction এর মধ্যবর্তী সময়কে সাইনোডিক পর্যায়কাল বলা হয়। পৃথিবীর পর্যায়কাল ৩৬৫ দিন এবং মঙ্গলের ৬৮৬ দিন। এ থেকে বের করা যায় কতদিন পরপর পৃথিবী, সূর্য, মঙ্গল একই সরলরেখায় আসবে। একই সরলরেখায় আসলে বাইরের গ্রহটি Opposition এ আছে বলা হয়। লক্ষ্যণীয় যে, এ হিসাবটি করার সময় কক্ষপথ বৃত্তাকার ধরা হয়েছে যা আসলে সঠিক না। কারণ আমরা জানি গ্রহের কক্ষপথ উপবৃত্তাকার। কিন্তু এই হিসাবটা খুবই উপযোগী। আমাদের উপগ্রহ চাঁদের সাইনোডিক পর্যায়কাল ২৯.৫৩০৬ দিন।

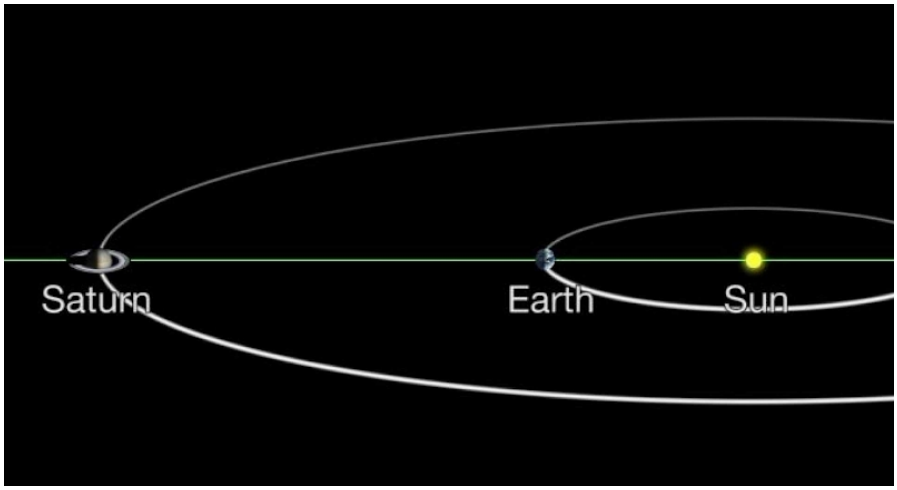

নিচের চিত্র হতে সহজেই বোঝা যাবে।

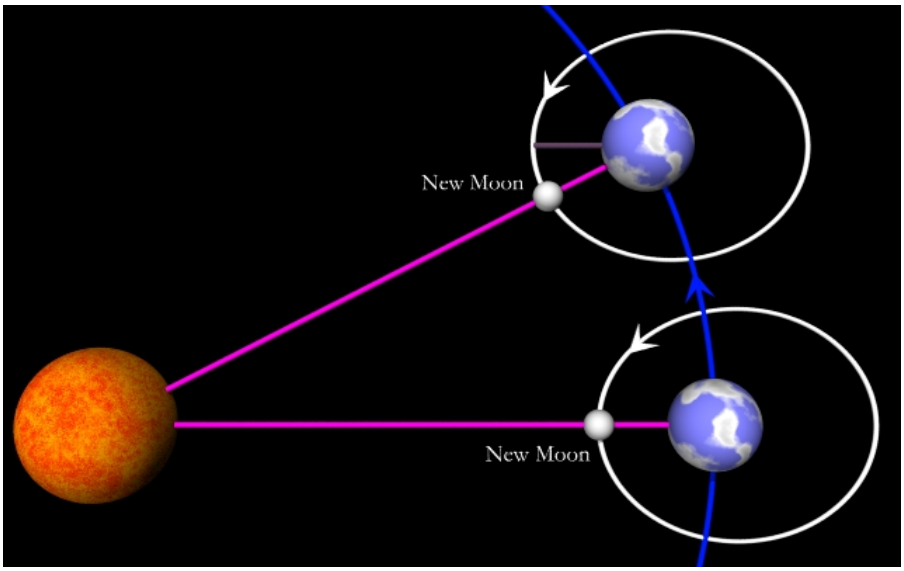

চাঁদের জন্য সাইনোডিক পর্যায়কালকে সাইনোডিক মাস বলা হয়।

Sideral month: আমরা চাঁদের জন্য আমাদের আলোচনা সীমিত রাখব। চাঁদ নিজ অক্ষের উপর একবার ঘুরে আসতে যে সময় লাগে সেটাই sideral month.

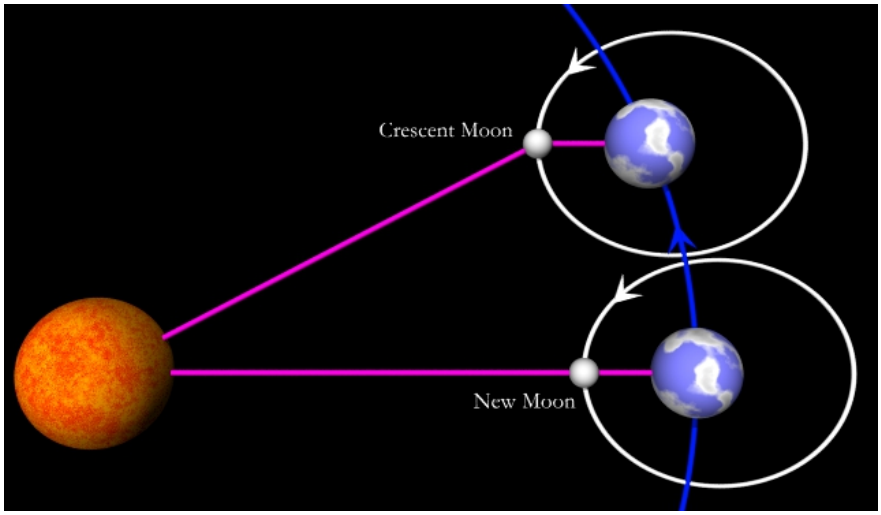

তবে sideral month এর দৈর্ঘ্য ২৭.৩২১৭ দিন। সুতরাং এক নতুন চাঁদ থেকে আরেক নতুন চাঁদই sideral month না সেটা সাইনোডিক মাস। সাইনোডিক মাস পরপর নতুন চাঁদ কিন্তু sideral মাস পরপর চাঁদের ৩৬০ ডিগ্রি ঘূর্ণন। এটাই পার্থক্য। নিচের চিত্রটি হতে ক্লিয়ার বোঝা যাবে।

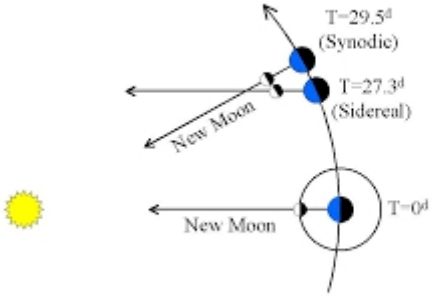

	Synodic (year)	Sidereal (year)
Mercury	0.318	0.241
Venus	1.599	0.616
Earth	—	1.0
Mars	2.136	1.9
Jupiter	1.092	11.9
Saturn	1.035	29.5
Uranus	1.013	84.0
Neptune	1.008	164.8

Draconic month: চাঁদ যে তলে থেকে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে সেই তল এবং পৃথিবী যে তলে থেকে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে সেই তল এক নয়। চাঁদের কক্ষতল পৃথিবীর কক্ষতলের সাথে প্রায় ৫° কোণে আনত থাকে। চিত্রটি খেয়াল করলেই বোঝা যাবে।

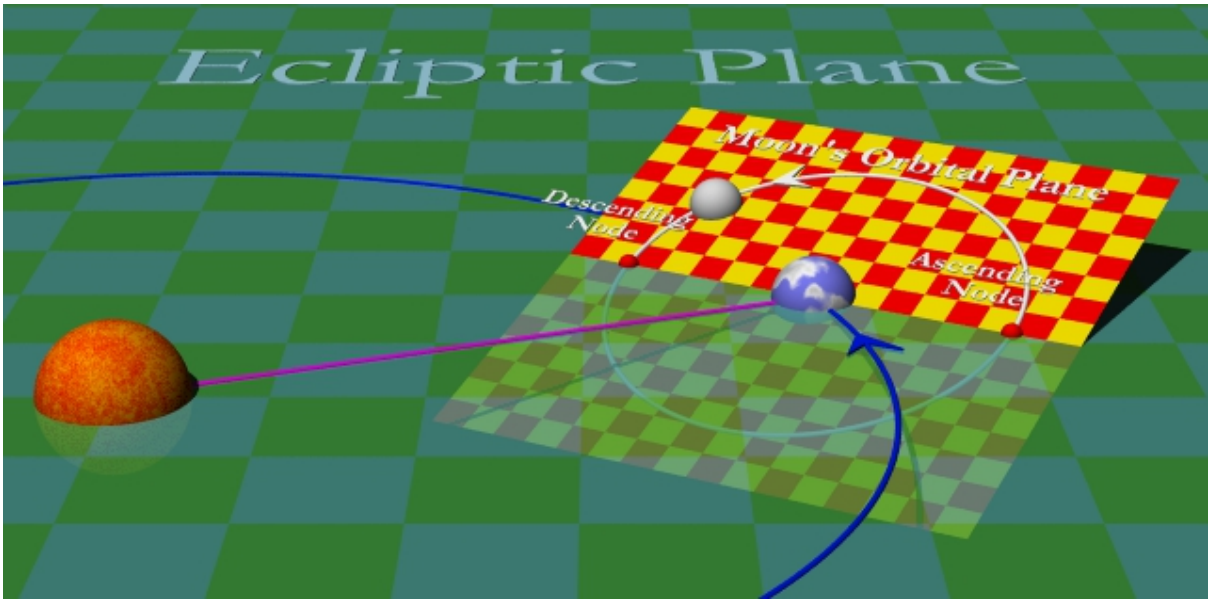

চাঁদের কক্ষতল পৃথিবীর কক্ষতলকে যে দুটি বিন্দুতে ছেদ করে তাকে node বলা হয়। চাঁদের এক নোড থেকে আরেক নোডে যেতে সময় লাগে ২৭.২১২২২ দিন। এ সময় টিকে draconic মাস বলা হয়। প্রশ্ন জাগতে পারে, এক নোড থেকে শুরু করে আবার ঐ নোডেই ফিরে আসলে তো চাঁদ ৩৬০ ডিগ্রিই ভ্রমণ করল। তাহলে তো এটা sideral মাসের সমান হওয়ার কথা ছিল। আসলে তা হয় না কারণ কক্ষপথের অয়ন চলন। এই অয়নচলন বিষয়ে আলোচনা পরে করা হবে। আপাতত জেনে রাখলে ভালো। Draconic মাসকে Nodical মাস ও বলা হয়।

Anomalistic month: পৃথিবীর চারপাশে ঘোরার সময় চাঁদের অনুসূর অবস্থান থেকে আবার অনুসূর অবস্থানে ফিরে আসতে সময়কালকেই Anomalistic মাস বলা হয়।

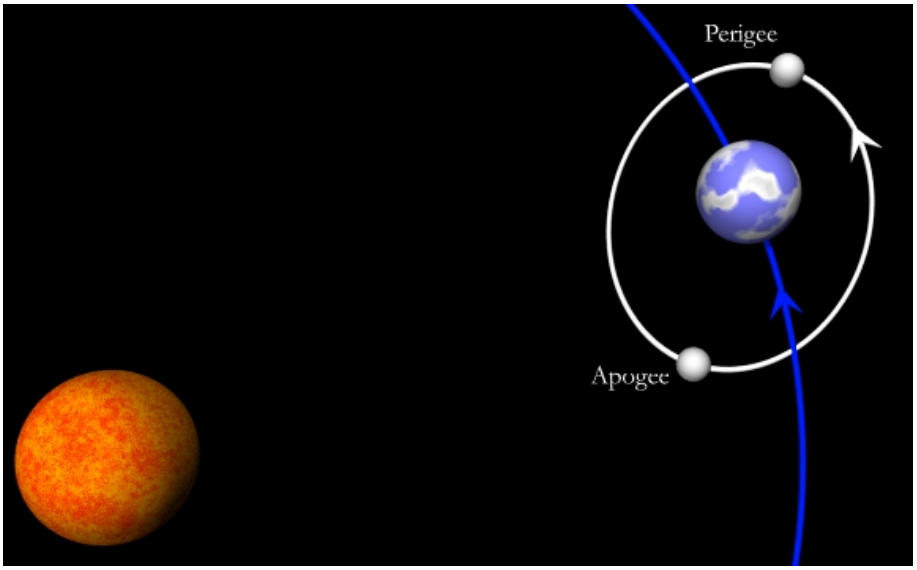

এই সময়কাল গড়ে ২৭.৫৫৪৫৫ দিন।

এবার ফিরি মূল আলোচনায়।

পৃথিবী এবং সূর্যের মাঝে যখনই চাঁদ অবস্থান করে তখন হয় সূর্যগ্রহণ। পৃথিবী ও সূর্যের মাঝে যদি চাঁদ অবস্থান করে, তাহলে সূর্যের আলো চাঁদের বিপরীতপৃষ্ঠে পড়বে। আমরা যে পাশে থাকব সে পাশে পড়বে না। অর্থাৎ চাঁদ থেকে কোনো আলো আসবে না। অর্থাৎ, আমরা চাঁদ দেখব না। মানে অমাবস্যা থাকবে। সুতরাং সূর্যগ্রহণ চাঁদের অমাবস্যার সময়ই হয়। আবার চন্দ্রগ্রহণ বিপরীতভাবে পূর্ণিমার সময়ই হয়।

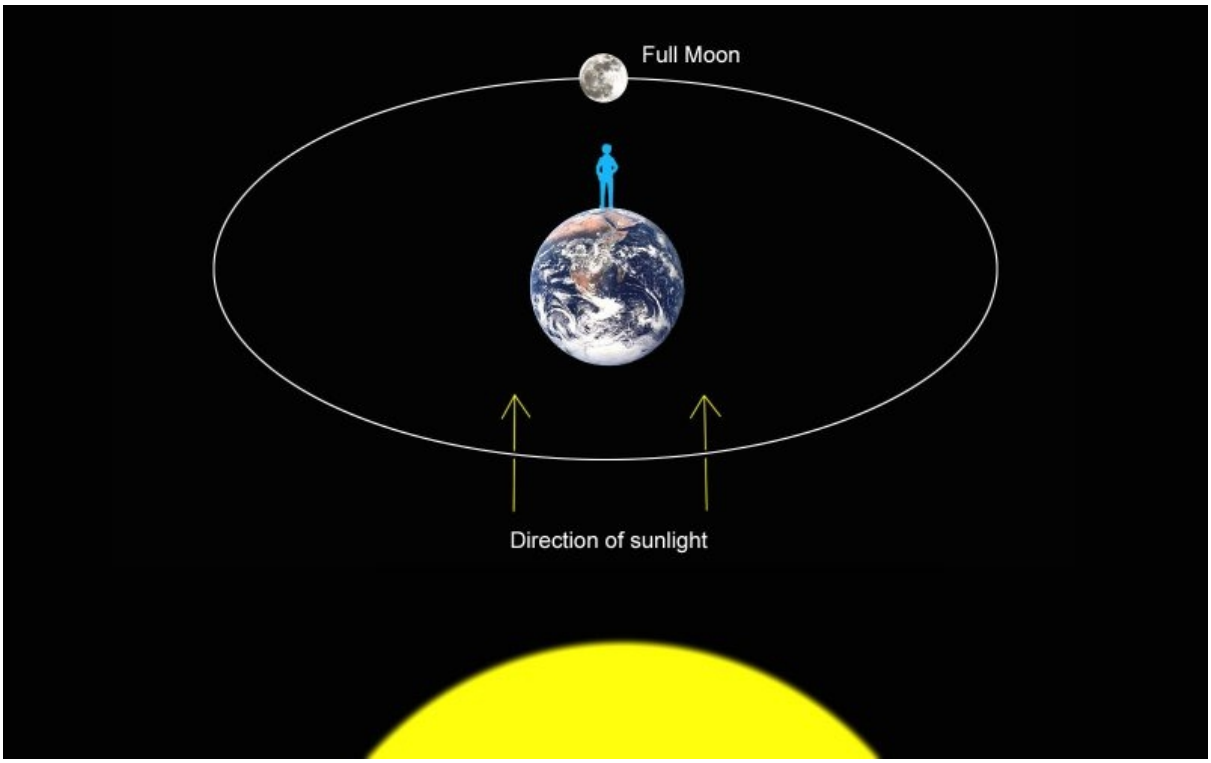

তাহলে যদি প্রতি অমাবস্যা বা পূর্ণিমাতে গ্রহণ হয় তাহলে প্রতি মাসে গ্রহণ হয় না কেন?

এর উত্তর লুকিয়ে আছে ড্রাকোনিক মাসের ঐ চিত্রটিতে। চাঁদের কক্ষতল যেহেতু ৫° কোণে আনত তাই বিশেষ অবস্থান ছাড়া গ্রহণ হবে না। কী সেই বিশেষ অবস্থান?

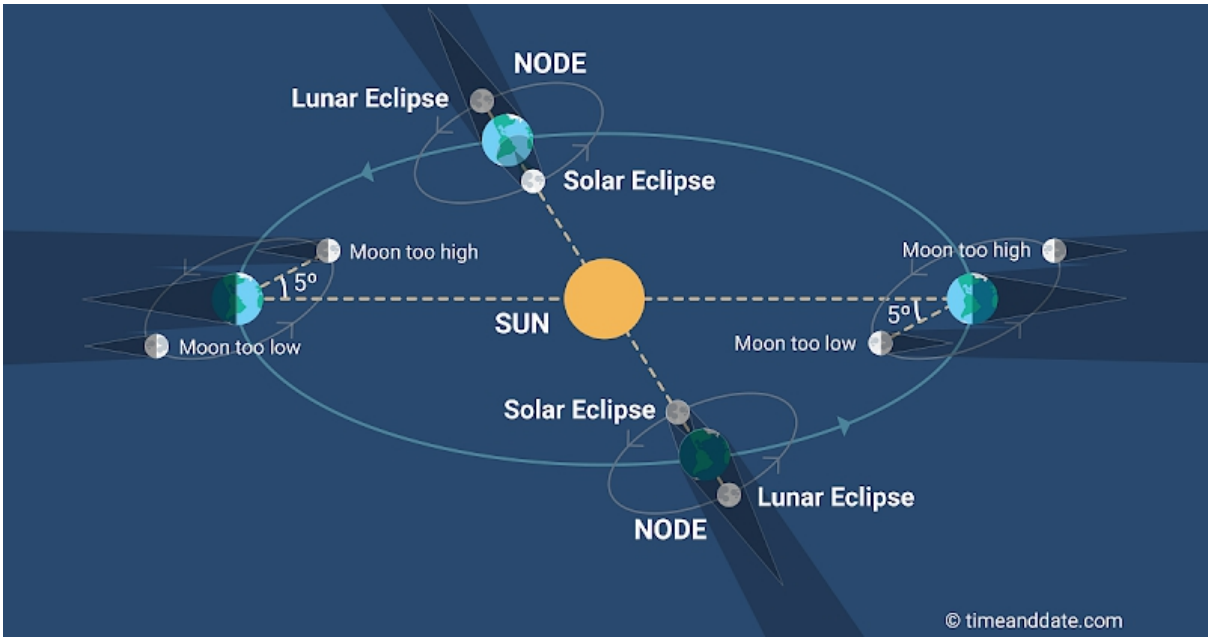

চিত্রটি মন দিয়ে দেখুন। দেখবেন, চাঁদ যখন নোডে আছে তখন গ্রহণ হচ্ছে এবং নোডে থাকা অবস্থায় যদি পূর্ণিমা বা অমাবস্যা হয় তা হলে গ্রহণ হচ্ছে। তাহলে এখানে উপরে আলোচিত দুটি মাস জড়িত। একটি হলো পূর্ণিমা থেকে পূর্ণিমা (অমাবস্যা থেকে অমাবস্যা ও বলা যায়) এসময়টি সাইনোডিক মাস (না বুঝলে উপরে আবার পড়ুন)। আবার একই সাথে চাঁদকে নোডেও থাকতে হবে। নোড থেকে নোড এই সময়টা হলো ড্রাকোনিক মাস। ধরি আজ সূর্যগ্রহণ হলো। তাহলে আজ ১.চাঁদ নোডে আছে ২.আজ অমাবস্যা।

এখন পরের সূর্যগ্রহণ যদি হতে হয় তাহলেও একই শর্ত পালন করতে হবে। যেহেতু অমাবস্যা থেকে অমাবস্যা সাইনোডিক মাস, তাই ধরি x সাইনোডিক মাস পরে গ্রহণ হবে। অর্থাৎ ২৯.৫৩০৬x দিন পর আবার গ্রহন হবে। একই সময় চাঁদ যেহেতু নোডেও থাকবে, তাহলে ধরি y ড্রাকোনিক মাস পরে গ্রহণ হবে। অর্থাৎ ২৭.২১২২y দিন পর আবার গ্রহন হবে। যেহেতু গ্রহন হতে গেলে উপরের শর্ত দুটি পালন করতে হবে তাই,

$$29.5306x = 27.2122y$$

এখান থেকে $x,\ y$ এর সবচেয়ে ভালো পূর্ণসংখ্যায় যে সমাধানটি পাওয়া যায়, সেটা হলো x=223 এবং y =242। তাহলে বলা যায় একটা সূর্যগ্রহণ হওয়ার পর ২২৩টি সাইনোডিক মাসের পর অথবা ২৪২টি ড্রাকোনিক মাসের পর আবার গ্রহণ হবে। এখন ২২৩টি সাইনোডিক মাস =২২৩× ২৯.৫৩০৬ =৬৫৮৫.৩২৩৮ দিন এবং ২৪২টি ড্রাকোনিক মাস =২৪২×২৭.২১২২=৬৫৮৫.৩৫২৪ দিন

প্রায় সমান! অর্থাৎ মোটামুটি ৬৫৮৫.৩ দিন পর আবার গ্রহণ হবে! এই যে ৬৫৮৫.৩ বছরের ব্যবধান বা চক্র এটাকেই সারোস চক্র বলা হয়। শুধু সূর্যগ্রহণ না, চন্দ্রগ্রহণের জন্যও সারোস চক্র প্রযোজ্য।

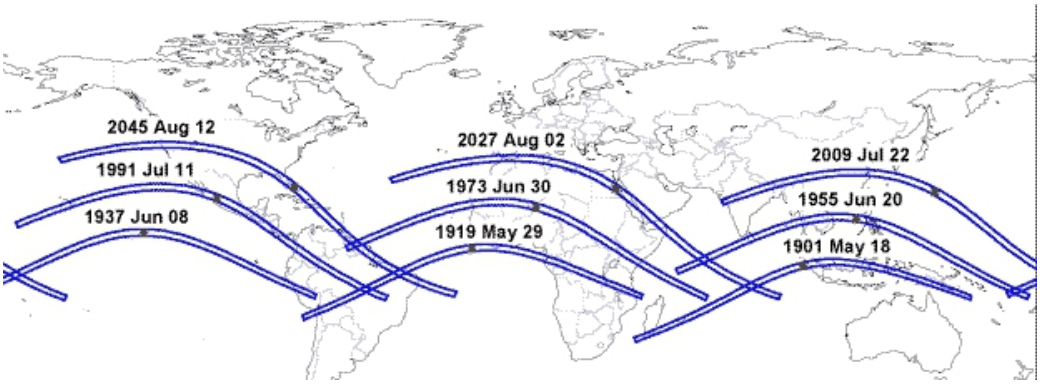

এখানে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে আজ বাংলাদেশে সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ দেখা গেলেও ৬৫৮৫.৩ দিন পরেরটি কিন্তু বাংলাদেশ থেকে দেখা যাবেনা। কেন? এটা নাহয় আপনারাই ভাবুন।

তাহলে যে প্রতিবছর ২-৩ টি সূর্যগ্রহণ হচ্ছে সেগুলো তো সারোস এর নিয়ম মানছে না। কেননা গ্রহণ তো ৬৫৮৫.৩ দিন পর পর হওয়ার কথা। এখানে বিষয়টি হলো একেকটি গ্রহণ একেকটি সারোস চক্রের অংশ। সারোস চক্রে প্রতি গ্রহণের পরপর সময় না বরং প্রতি সারোস চক্রের পরপর দুটি গ্রহণের হিসাব নিকাশ করা হয়।

Syzygy

সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ কিংবা heliocentric conjunction যাই বলি না কেন সবগুলোতে একটা ব্যাপারের কিন্তু মিল রয়েছে। সূর্যগ্রহণের সময় সূর্য, চাঁদ, পৃথিবী একই সরলরেখায়। চন্দ্রগ্রহণের সময় সূর্য, পৃথিবী, চাঁদ একই সরলরেখায়। আবার heliocentric conjunction এ আমরা দেখেছি সূর্য, পৃথিবী এবং একটি বহির্গ্রহ (outer planet) একই সরলরেখায়। এই যে একই সরলরেখায় আসার যে ব্যাপারটা এটা কিন্তু গ্রহন কিংবা conjunction এর জন্য কমন। আমরা সকলেই জানি যে পৃথিবী, সূর্য, চাঁদ কিংবা ঐ বহিগ্রহটি সবই মহাকর্ষ এর প্রভাবে প্রভাবিত। জ্যোতির্বিদ্যায় syzygy নামে একটি টার্ম আছে। তিন বা ততোধিক মহাজাগতিক বস্তু যদি মহাকর্ষ এর প্রভাবে প্রায় একই সরলরেখায় আসে তখন সে বিষয়টিকে Syzygy নামে অভিহিত করা হয়। চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ কিংবা conjunction সবই syzygy এর উদাহরণ কারণ এখানে তিনটি মহাজাগতিক বস্তু মহাকর্ষের প্রভাবে একই সরলরেখায়,আসে। এবার বর্ণনায় থাকবে syzygy র আরও দুইটি উদাহরণ। একটি হলো Transit, আরেকটি Occultation।

Transit: জ্যোতির্বিজ্ঞানের পরিভাষায়, কোনো মহাজাগতিক বস্তু যখন পর্যবেক্ষক এবং অন্য কোনো বৃহৎ মহাজাগতিক বস্তুর মাঝ দিয়ে গমন করে তখন তাকে transit বলা হয়। ধরুন পৃথিবী থেকে বৃহস্পতি গ্রহ পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। এখন বৃহস্পতি গ্রহের উপগ্রহের সংখ্যা ৭৯টি। বৃহস্পতি গ্রহটি দেখার সময় আপনি যদি দেখেন বৃহস্পতি গ্রহের একটি চাঁদ ঠিক বৃহস্পতি গ্রহের সামনে দিয়ে গমন করছে, তাহলে এখানে যে জিনিসটি হলো সেটাই ট্রানজিট। এখানে বৃহৎ মহাজাগতিক বস্তু হিসেবে বৃহস্পতি, পর্যবেক্ষক আপনি এবং যে বস্তুটি ট্রানজিট হলো সেটা বৃহস্পতি গ্রহের ঐ উপগ্রহটি। তবে বৃহস্পতি গ্রহের উপগ্রহের transit তো আর খালি চোখে দেখা যাবে না। খালি চোখে ট্রানজিট দেখার সৌভাগ্য হবে আমাদের যখন বুধ এবং শুক্র গ্রহ সূর্যের সামনে দিয়ে গমন করে ট্রানজিট ঘটাবে। আমাদের আলোচনা তাই বুধ এবং শুক্র গ্রহের ট্রানজিট নিয়ে।

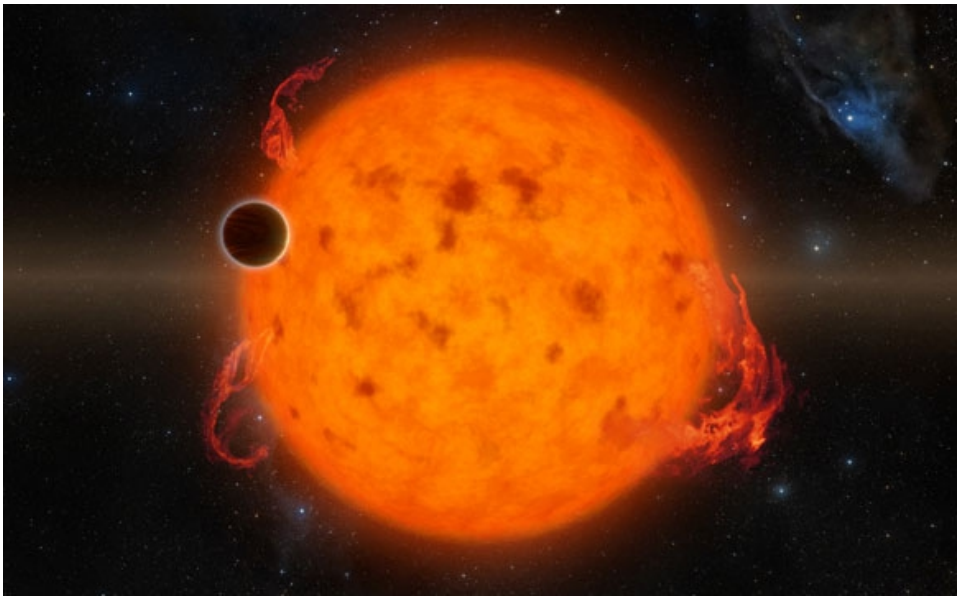

তার আগে আসি একটি প্রশ্নে। বুধ এবং শুক্র গ্রহ ছাড়া অন্য কোন গ্রহের কিন্তু ট্রানজিট হয়না। এর কারণ কিন্তু খুবই সহজ। পৃথিবী সৌরজগতের তৃতীয় গ্রহ। প্রথম গ্রহটির নাম বুধ, দ্বিতীয়টির নাম শুক্র। নিচের চিত্রটি খেয়াল করুন, বুধ

এবং শুক্র গ্রহেরই একমাত্র পৃথিবী এবং সূর্যের মাঝে আসা সম্ভব। পৃথিবীর বাইরের গ্রহ মঙ্গলের কিন্তু কখনই সূর্য এবং পৃথিবীর মাঝে আসা সম্ভব নয়।

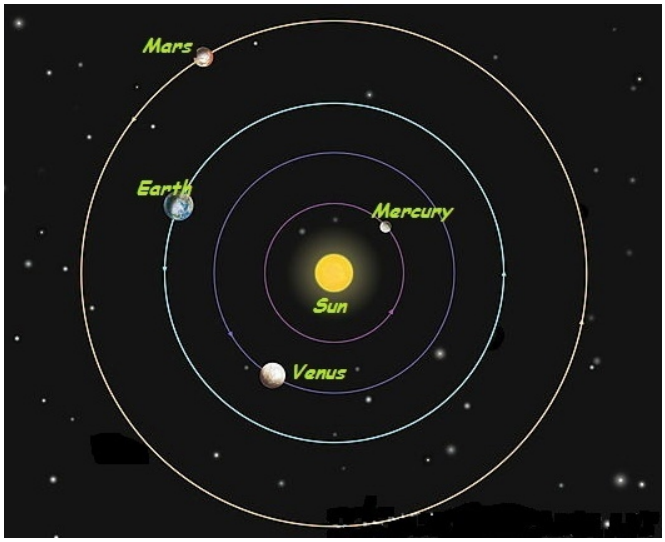

তাই পৃথিবী থেকে মঙ্গলের ট্রানজিটও দেখা যাবে না। এ কারণে শুধুমাত্র বুধ এবং শুক্র গ্রহেরই ট্রানজিট হয়।

বুধ গ্রহের ট্রানজিট:

বুধ গ্রহ প্রায় ৮৭.৯৬৯ দিনে এবং পৃথিবী প্রায় ৩৬৫.২৫৬ দিনে নিজ অক্ষের উপর এক বার আবর্তন করে। ধরা যাক আজ বুধ গ্রহের ট্রানজিট ঘটলো। তাহলে পরবর্তী ট্রানজিট কবে হবে সেটার ভবিষ্যদবাণী করা যাক।

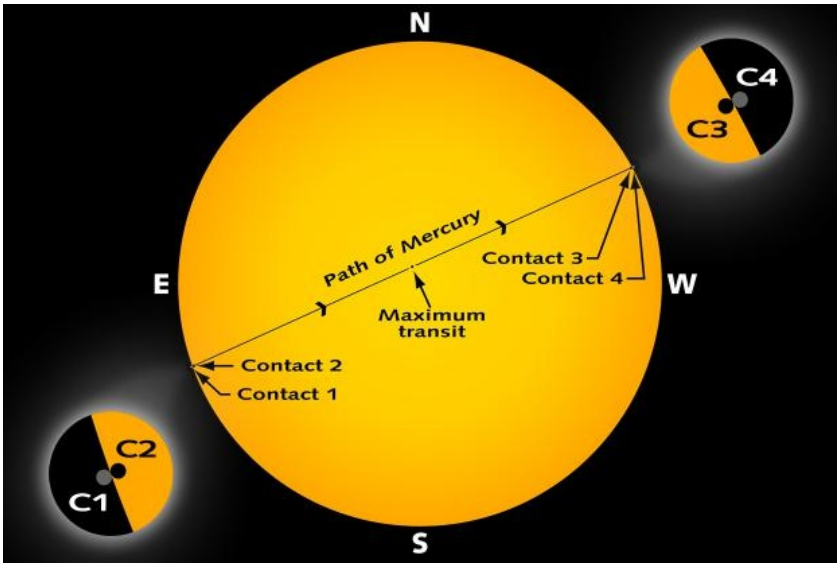

ধরি, পরবর্তী ট্রানসিটের আগ অব্দি বুধ গ্রহ xটি এবং পৃথিবী yটি পূর্ণসংখ্যাক ঘূর্ণন সম্পন্ন করল। তাই পরবর্তী ট্রানজিট হবে যদি

$$87.969x = 365.256y \tag{1}$$

এ থেকে সমাধান করলে পূর্ণসংখ্যায় সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য সমাধান x =191 এবং y=46। সুতরাং বলা যায়, পরবর্তী ট্রানজিটের আগে পৃথিবী ৪৬টি ঘূর্ণন সম্পন্ন করবে। অর্থাৎ ৪৬ বছর পার হবে। ততদিনে বুধ গ্রহে ১৯১ বছর পার হবে। এবার আমাদের এই হিসাব কতটা নির্ভুল সেটি দেখতে বুধের কয়েকটি ট্রানসিটের তারিখ লক্ষ্য করা যাক:

১৯২৭ সালের ১০ নভেম্বর

১৯৭৩ সালের ১০ নভেম্বর

২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর

দেখুন, দুইটি পরপর তারিখের ব্যবধান ৪৬ বছর করে। অর্থাৎ ৪৬ বছর পরপর বুকের ট্রানজিট হবে। তাহলে আমরা পরবর্তী ট্রানজিট কবে হবে সেটা কিন্তু বলতে পারি ২০১৯+৪৬ =২০৬৫ সালের ১০/১১ নভেম্বর। এবার ১৯২৭ এর আগে কত কত সালে ট্রানজিট হয়েছে সেটাও হিসাব করতে পারব আমরা। উলটো দিকে হিসাব করতে করতে আপনি পাবেন ১৫৫৯ সালে ট্রানজিট হয়েছিল। সেই হিসেবে ১৫১৩ সালেও ট্রানজিট হওয়ার কথা। কিন্তু ১৫১৩ সালে কোন ট্রানজিট হয়নি। একইভাবে ২৪৩৩ সালেও ট্রানজিট হবেনা। আসল কথা হলে সারোস চক্রের মতো এই ট্রানসিটের ও একটি ব্যবধান থাকে। আপনি যদি ৪৬ বছরের হিসাবটি করুন, তাহলে এই হিসাবটি ১৫৫৯ থেকে ২৩৮৭ সাল পর্যন্ত চলবে।

তাহলে প্রশ্ন আসতে পারে আমরা এই সীমাবদ্ধতা কীভাবে কাটাতে পারি?

আবারও ফিরে যাই 1নং সমীকরণ এর কাছে। আরেকটি প্রায় নিখুত সমাধান হলো x=901 এবং y=217। তাহলে বুধ গ্রহের ৯০১টি ঘূর্ণন এর পর এবং পৃথিবীর ২১৭টি ঘূর্ণন এর পর আবারও ট্রানজিট হবে। সুতরাং ২১৭ বছর পরপর ট্রানজিট হবে। ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখব ১২৪০, ১৪৫৭, ১৬৭৪, ১৮৯১ সালগুলোতে ট্রানজিট হয়েছিল। এবং ২৯৭৬ সালেও এ নিয়ম মেনেই ট্রানজিট হবে। সুতরাং আমরা পেলাম দুইটি পর্যায়কাল। একটি ৪৬ বছরের এবং আরেকটি ২১৭ বছরের। ১৯৫৭ সালে ট্রানজিট হয়েছিলো। সেই হিসেবে ১৯৫৭, ২০০৩, ২০৪৯, ২০৯৫... এবং ১৯৫৭, ২১৭৪, ২৩৯১... সালেও ট্রানজিট ঘটবে। নিচের দুইটি সারণিতে সালগুলো দেওয়া হলো। প্রথম সারণিটি মে মাসে যেসব ট্রানজিট হবে সেগুলো এবং দ্বিতীয় সারণিটি নভেম্বর মাসে যেসব ট্রানজিট হবে সেগুলোর সাল নির্দেশ করে।

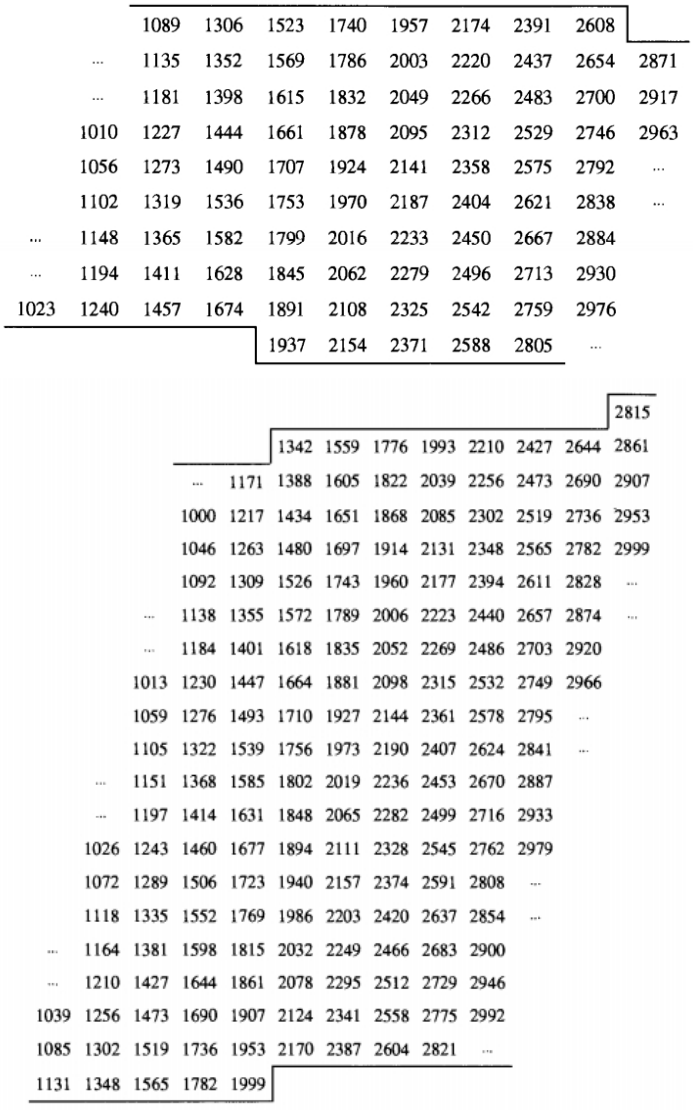

		1089	1306	1523	1740	1957	2174	2391	2608	
	...	1135	1352	1569	1786	2003	2220	2437	2654	2871
	...	1181	1398	1615	1832	2049	2266	2483	2700	2917
	1010	1227	1444	1661	1878	2095	2312	2529	2746	2963
	1056	1273	1490	1707	1924	2141	2358	2575	2792	...
	1102	1319	1536	1753	1970	2187	2404	2621	2838	...
...	1148	1365	1582	1799	2016	2233	2450	2667	2884	
...	1194	1411	1628	1845	2062	2279	2496	2713	2930	
1023	1240	1457	1674	1891	2108	2325	2542	2759	2976	
				1937	2154	2371	2588	2805	...	

										2815
				1342	1559	1776	1993	2210	2427	2644	2861
		...	1171	1388	1605	1822	2039	2256	2473	2690	2907
		1000	1217	1434	1651	1868	2085	2302	2519	2736	2953
		1046	1263	1480	1697	1914	2131	2348	2565	2782	2999
		1092	1309	1526	1743	1960	2177	2394	2611	2828	...
	...	1138	1355	1572	1789	2006	2223	2440	2657	2874	...
	...	1184	1401	1618	1835	2052	2269	2486	2703	2920	
	1013	1230	1447	1664	1881	2098	2315	2532	2749	2966	
	1059	1276	1493	1710	1927	2144	2361	2578	2795	...	
	1105	1322	1539	1756	1973	2190	2407	2624	2841	...	
...	1151	1368	1585	1802	2019	2236	2453	2670	2887		
...	1197	1414	1631	1848	2065	2282	2499	2716	2933		
1026	1243	1460	1677	1894	2111	2328	2545	2762	2979		
1072	1289	1506	1723	1940	2157	2374	2591	2808	...		
1118	1335	1552	1769	1986	2203	2420	2637	2854	...		
...	1164	1381	1598	1815	2032	2249	2466	2683	2900		
...	1210	1427	1644	1861	2078	2295	2512	2729	2946		
1039	1256	1473	1690	1907	2124	2341	2558	2775	2992		
1085	1302	1519	1736	1953	2170	2387	2604	2821	...		
1131	1348	1565	1782	1999						

এবার আসি আরেকটা টার্মে। পার্শিয়াল ট্রানজিট। যখন বুধ বা শুক্র গ্রহ সূর্যের মাঝামাঝি এলাকা দিয়ে গমন না করে কোনোরকমে ছুয়ে চলে যায় বলে মনে হয় তখনই এই ট্রানজিট কে পার্শিয়াল ট্রানজিট বলা হয়।

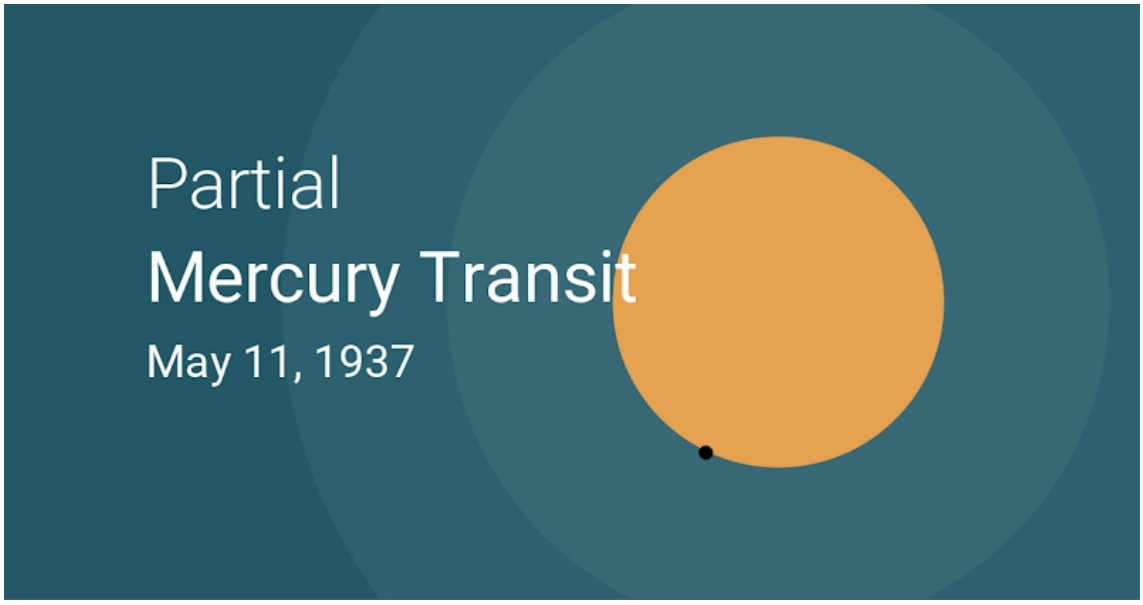

পার্শিয়াল ট্রানজিট খুবই বিরল ঘটনা। ১০০০ সাল থেকে ৩০০০ সালের ভিতরে মাত্র ৬টি পার্শিয়াল ট্রানজিট হবে। ১৩৪২, ১৯৩৭ এবং ১৯৯৯ সালের ট্রানজিট গুলো পার্শিয়াল ছিল। এরপর ২৩৯১ সালের ১১ মে, ২৬০৮ সালের ১৩ মে এবং ২৮১৫ সালের ১৬ নভেম্বর পার্শিয়াল ট্রানজিট দেখা যাবে।

1 নং সমীকরনে আরেকটু তাকানো যাক। আমরা মাত্র দুইটি সমাধান বের করেছি। 1 নং হতে আরও সমাধান বের করা সম্ভব যেগুলো প্রায় কাছাকাছি পূর্ণ সংখ্যায় সমাধান দেবে। তারমধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য সমাধান আছে ২০ বছর, ৩৩ বছর। কিন্তু এগুলো ৪৬ কিংবা ২১৭ এর মতো নিখুঁত নয়।

বুধের ট্রানজিটের আলোচনা শেষ করা যাক একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে। আমরা উপরে যেসব ট্রানজিটের আলোচনা করলাম, সেগুলোতে যে ব্যাপারটি লক্ষ্যণীয় তা হলো ট্রানজিট শুধু মে অথবা নভেম্বর মাসে হচ্ছে। অন্য কোন মাসে বুকের ট্রানজিট হচ্ছে না। এর কারণ কী?

এর কারণ হলো, বুধের কক্ষতল পৃথিবীর কক্ষতলের সাথে কোণ করে আনত। ফলে বুধের কক্ষতল পৃথিবীর কক্ষতলকে দুইটি বিন্দুতে ছেদ করে (Saros এ আলোচনার মতোই) বুধ যখন এই ছেদ বিন্দুতে থাকে, তখন ট্রানজিট হতে হলে পৃথিবীকে অবশ্যই সূর্য এবং বুধের সংযোগ সরলরেখায় থাকতে হবে। নিচের চিত্রটি হতে বুঝতে পারবেন। পৃথিবী ঐ দুটি স্থানে নভেম্বর এবং মে মাসেই থাকে। তাই বুধের ট্রানজিট মে এবং নভেম্বরেই হয় অধিকাংশ সময়।

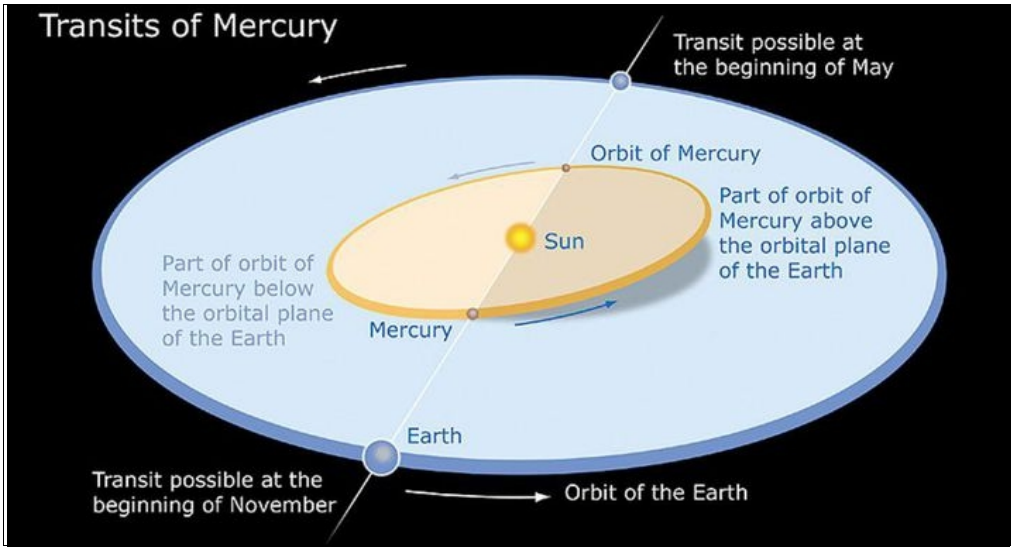

শুক্র গ্রহের ট্রানজিট:

১৬২৯ সালে জোহানেস কেপলার একটি ভবিষ্যদবাণী করেন। সেই ভবিষ্যদবাণীতে তিনি উল্লেখ করেন, ১৬৩১ সালের নভেম্বর মাসে বুধ গ্রহ সৌর চাকতির সামনে দিয়ে গমন করবে (অর্থাৎ ট্রানজিট হবে) এবং ঠিক পরের মাসেই শুক্র গ্রহের ট্রানজিট হবে। তার এই ভবিষ্যদবাণী পূর্বে কেউ করেনি। তাই ভবিষ্যদবাণী অনুযায়ী অপেক্ষা করাই ছিল একমাত্র উপায়। দুর্ভাগ্যবশত ১৬৩০ সালে কেপলার মারা যান।

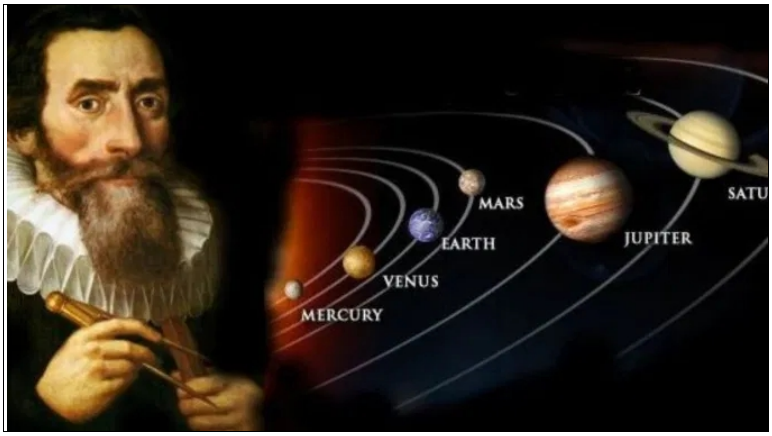

নিজের ভবিষ্যদবাণীর বাস্তবায়ন দেখে যাওয়া হলো না। কিন্তু কেপলারের এই ভবিষ্যৎ বাণী স্মরণ করে প্যারিস থেকে পিয়েরে গ্যাসেন্ডি বুধের ট্রানজিট দেখার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি বুধ গ্রহের ট্রানজিট দেখলেন ঠিকই কিন্তু শুক্র গ্রহের ট্রানজিটটি তার চোখে ধরা দিলো না। এর কারণ ছিল শুক্র গ্রহের এই ট্রানজিট সূর্যোদয়ের ৫০ মিনিট আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। ১৬২৯ সালের কেপলার এর ভবিষ্যদবাণী তাহলে সত্য ছিলো। কিন্তু কেপলার আরও একটি ভবিষ্যদবাণী করেছিলেন একই সময়। তিনি বলেছিলেন ১৬৩১ সালের পর ১৭৬১ সালের আগ পর্যন্ত শুক্র গ্রহের আর কোন ট্রানজিট হবে না। কিন্তু ১৬৩৯ সালে এক তরুন ইংরেজ জ্যোতির্বিদ Jeremiah Horrocks বুঝতে পারেন যে কেপলার আসলে ভুল ছিলেন। কারণ Jeremiah নিজের হিসাব থেকে দেখেছিলেন ৪ ই ডিসেম্বরে শুক্র গ্রহের ট্রানজিট হবে।

তিনি তার ছোটোভাই এবং বন্ধুকে এই বিষয়টির কথা বললেন এবং তাদেরও বললেন ৪ ডিসেম্বর সূর্য এর দিকে নজর রাখতে। কিন্তু সমস্যা বাঁধল ৪ তারিখের আকাশ নিয়ে। আকাশ পরিষ্কার ছিল না ঐদিন ব্রিটেনে। তাই আশাহত হলেন তরুন জ্যোতির্বিদ Jeremiah। কিন্তু সূর্যাস্তের সামান্য কিছু আগে চোখের সামনে ধরা দিল শুক্র গ্রহের ট্রানজিট। ওদিকে তার ছোটোভাই এবং বন্ধুও ট্রানজিট দেখেছিলেন বলে মন্তব্য করেন। ১৬৪১ সালে Jeremiah মারা যাওয়ার আগে প্রকাশের উদ্দেশ্য নিয়ে তার পর্যবেক্ষণ লেখেন। এর একটি কপি ১৬৬১ সালে ডাচ বিজ্ঞানী ক্রিশ্চিয়ান হাইগেনের হাতে পড়ে। তিনি এটি পোল্যান্ডের জ্যোতির্বিদ জোহানেস হেভেলিউস এর কাছে দেন। হেভেলিউস ১৬৬২ সালে এটি প্রকাশ করেন।

বুধ গ্রহের জন্য যেমন, ৪৬ বছর এবং ২১৭ বছরের পর্যায়কাল পাওয়া যায়, শুক্র গ্রহের জন্য ৮ বছর এবং ২৪৩ বছরের পর্যায়কালও বেশ প্রসিদ্ধ। কিন্তু ৮ বছরের এই পর্যায়কালটি বেশ একটা কাজের না। এবার আসুন দেখা যাক, ৮ বছরের পর্যায়কালের সমস্যাটা কোথায়। সাইনোডিক পিরিয়ডের সুত্রটা থেকে হিসাব করা যায় ৫৮৩.৯২ দিন পরপর শুক্র, পৃথিবী এবং সূর্য একই সরলরেখা বরাবর আসে। এই রকম ধরা যাক ৫ বার শুক্র পৃথিবীর সাথে একই সরলরেখা বরাবর আসলো। ততদিনে কেটে যাবে ৫৮৩.৯২×৫=২৯১৯.৬ দিন। আবার এদিকে যদি পৃথিবীর ৮ বছর কেটে যায়, তাহলে দিনের সংখ্যা হবে ৩৬৫.২৫×৮=২৯২২ দিন। এই মান কিন্তু মিলল না।যদি মান মিলে যেত তাহলে বলা যেত ঠিক ৮ বছর পর পর ট্রানজিট হবেই। কিন্তু উল্লেখযোগ্য ব্যাপারটি হলো পার্থক্য মাত্র ২.৪ দিনের। তাই ৮ বছর পরপর ট্রানজিট না হলেও অনেকটাই কাছাকাছি দিয়ে যাবে।

চিত্র Jeremiah Horrocks

নিচের চিত্রটি হতে বোঝা যাবে।

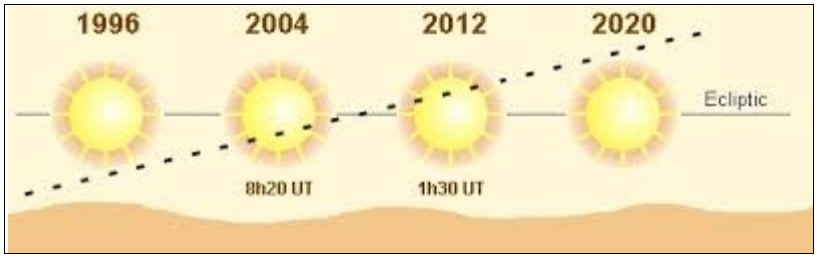

এবার চলুন তাকানো যাক ২৪৩ বছর পর্যায়কালের দিকে। সাইনোডিক পিরিয়ড ৫৮৩.৯২ দিন। এখন ৫৮৩.৯২×১৫২=৮৮৭৫৫.৮৪ দিন। অন্যদিকে ৩৬৫.২৫×২৪৩=৮৮৭৫৫.৭৫ দিন। মাত্র কয়েক ঘন্টার ব্যবধান। তাই ২৪৩ বছর পরপর গ্রহণ দেখার সম্ভাবনা ৮ বছর পর্যায়কালের তুলনায় অনেক বেশি। শুক্র গ্রহের ট্রানজিট কিন্তু বুকের তুলনায় খুবই দুর্লভ। শুক্র গ্রহের ট্রানজিট প্রতি শতকে মাত্র ২টি হয়। কোন কোন শতকে ১টিও হয়। ২০০৪ এবং ২০১২ সালে এ শতকের ট্রানজিট হয়ে গেছে। পরবর্তী শতকে ট্রানজিট ২১১৭, ২১২৫ সালে যথাক্রমে ডিসেম্বরের ১১ এবং ৮

তারিখ দেখা যাবে। যেহেতু আমরা ২০০৪ সালে হবে এটা জানি তাই বলতে পারি ২২৪৭, ২৪৯০, ২৭৩৩,২৯৭৬... সালগুলোতে ট্রানজিট হবে (২৪৩ বছর পর্যায়কাল) এভাবে ভবিষ্যদবাণী কিন্তু করাই যায়।

পাশে ২০০০-৪০০০ সাল পর্যন্ত কখন ট্রানজিট দেখা যাবে সেই তালিকা দেওয়া আছে।

সুতরাং বোঝা গেলো বুধ গ্রহের মতো শুক্র গ্রহের ট্রানজিট সহজে দেখা যায় না। বহু বছর পরপর ট্রানজিট গুলো হয় কিন্তু একই শতাব্দীতে ২টি মাত্র ট্রানজিট ৮ বছরের পর্যায়কাল মেনে চলে। তবে আমাদের জীবদ্দশায় মনে হয়না শুক্র গ্রহের আর ট্রানজিট দেখা সম্ভব।

উপরের সারণিটি দেখলে বোঝা যাবে শুক্র গ্রহের ট্রানজিট জুন এবং ডিসেম্বরেই হয়। এটার কারণ ও বুধের ট্রানসিটে বর্ণিত কারণের মতো।

শেষে মনে রাখার জন্য পুনরায় একটা কথা বলি। একই সরলরেখা বরাবর আসা আর ট্রানজিট কিন্তু এক জিনিস নয়। নিচের চিত্রটিতে সূর্য, পৃথিবী, শুক্র একই সরলরেখা বরাবর এসেছে বটে কিন্তু এটা ট্রানজিট নয়। কারণ এই পজিশনে পৃথিবীর কোনো মানুষ শুক্র গ্রহকে সূর্যের সামনে দিয়ে যেতে দেখবে না।

Date
2004 Jun 08
2012 Jun 06
2117 Dec 11
2125 Dec 08
2247 Jun 11
2255 Jun 09
2360 Dec 13
2368 Dec 10
2490 Jun 12
2498 Jun 10
2603 Dec 16
2611 Dec 13
2733 Jun 15
2741 Jun 13
2846 Dec 16
2854 Dec 14
2976 Jun 16
2984 Jun 14
3089 Dec 18
3219 Jun 19
3227 Jun 17
3332 Dec 20
3462 Jun 22
3470 Jun 19
3575 Dec 23
3705 Jun 24
3713 Jun 21
3818 Dec 25
3956 Jun 23

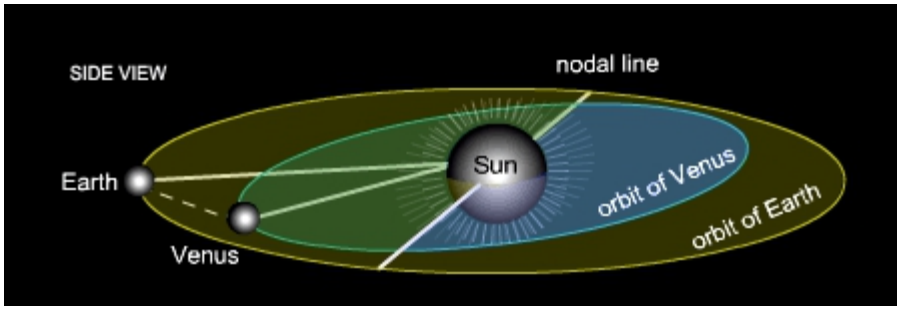

ট্রানজিট হলো একমাত্র সেই অবস্থা যখন যে গ্রহটির ট্রানজিট হবে সেটি নোডাল পয়েন্টে থাকবে। (যেমনটি বুধের জন্য দেখেছি)

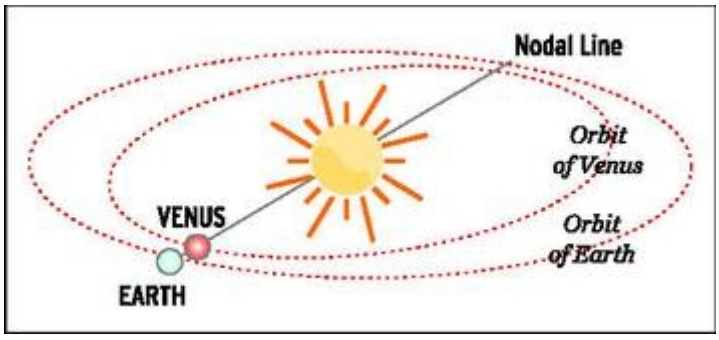

এবার বলব অতি দুর্লভ ট্রানজিটের কথা। ১৩৪২৫ সাল! পৃথিবীর অবস্থা কী হবে জানি না আমরা। ১৩৪২৫ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর হবে এক অভুতপূর্ব ঘটনা। ১৬ সেপ্টেম্বর 23 টা 57 এর সময় হতে শুক্র গ্রহের ট্রানজিট শুরু হবে। সেই ট্রানজিট চলবে পরদিন সকাল ৭ টা ৩০ এ। ঠিক ঐ দিন বিকেলেই ৪টা ২৭ এর সময় বুধের ট্রানজিট শুরু হয়ে যাবে! প্রায় এমন ঘটনা আবার ঘটবে ৬৯১৬৩ সাল এবং ২২৪৫০৮ সালে! এই সময় বুধ, শুক্রকে একই সাথে সৌর চাকতিতে দেখা

যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি! এবার আসি সবচেয়ে দুর্লভ ঘটনায়। বুধ, শুক্র একই সাথে একই সময়ে ট্রানজিট হতে পারবে কি না? এর সঠিক উত্তর হলো, না। কারণ একই সাথে ট্রানজিট হতে হলে বুধ, শুক্রের নোডাল পয়েন্ট প্রায় একই জায়গায় থাকতে হবে। যা এখন নেই। তবে আশার খবর হলো এই দুই গ্রহের নোডাল পয়েন্ট কাছাকাছি আসছে। এই হিসাব কাজে লাগিয়েই বের করা সম্ভব কোনো দূর ভবিষ্যতে হতে পারে এমন ঘটনা। উপরের ৬৯১৬৩ সাল কিংবা ২২৪৫০৮ সাল এ বিষয়টি মাথায় রেখেই বের করেছেন জ্যোতির্বিদরা।

এবার আসি ট্রানজিট এত গুরুত্বপূর্ণ কেন! ট্রানজিট এখন এত গুরুত্বপূর্ণ না হলেও ১৭০০ সালের দিকে ট্রানজিটের কল্যাণে কিছু জিনিস আমাদের সমানে এসেছিল ১৬৭৭ সালে ইংরেজ জ্যোতির্বিদ এডমন্ড হ্যালি পৃথিবী থেকে সূর্য এর দূরত্ব নির্ণয় করার জন্য একটি উপায়ের প্রস্তাব করেন। তিনি শুক্র গ্রহের ট্রানজিট পর্যবেক্ষণ করে ত্রিকোনোমিতির সাহায্যে পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব বের করার উপায় বলেন।

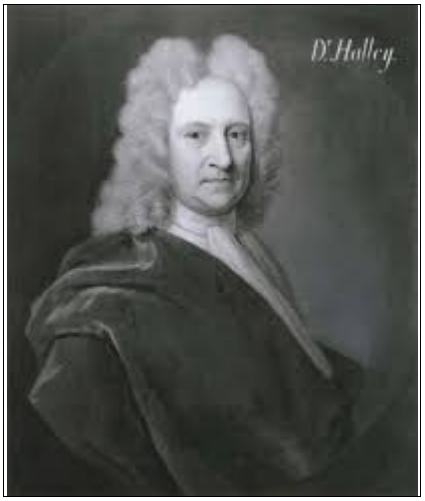

এডমন্ড হ্যালি

কিন্তু ১৭৪২ সালে হ্যালি মারা যায়। ওদিকে কেপলারের ভবিষ্যদবাণী অনুসারে ১৭৬১ সালে শুক্র গ্রহের ট্রানজিট হয়। তখন হ্যালি প্রদত্ত নিয়মানুযায়ী পরীক্ষা করার জন্য জ্যোতির্বিদরা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছুটে যান ট্রানজিট দেখার জন্য। এই সময়ের ট্রানজিট থেকে পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব হিসাব করা হয় প্রায় ৯৫ মিলিয়ন কিলোমিটার এর কাছাকাছি। যা বর্তমান হিসেবে প্রায় ৯২.৯৫ মিলিয়ন মাইল। এছাড়া ১৭৬১ সালের ট্রানজিট আরও একটি কারণে উল্লেখযোগ্য। ট্রানজিট হওয়ার সময় জ্যোতির্বিদরা লক্ষ করেন যে শুক্র গ্রহের চারদিকে এক অস্পষ্ট আবছা আবরণ। এই আবরণটি তখনই দেখা গেল যখন শুক্র গ্রহ সূর্যের একেবারে পৃষ্ঠ বরাবর ছিল তখন।

সেই ঘটনা হতে তারা ধারণা করলেন হয়তো শুক্র গ্রহে বায়ুমণ্ডল আছে যার দরুন সেখান থেকে আলো আসতে গিয়ে এমন ধোঁয়াটে ভাব তৈরি হয়েছে শুক্রের পাশে।

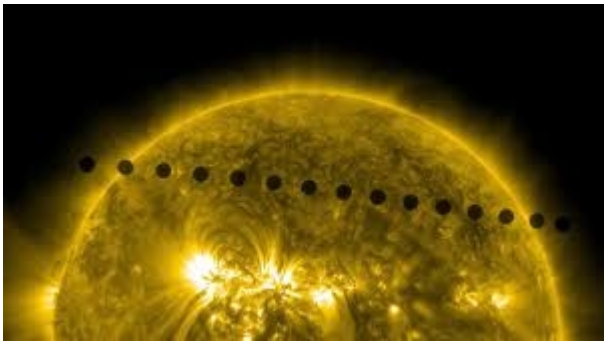

আমরা এখন জানি যে শুক্রেরও বায়ুমণ্ডল আছে। এখন হয়ত আমরা এসব জানলেও তখন ব্যাপারটি কিন্তু বেশ চাঞ্চল্যকর ছিল। তবে এখন যে ট্রানজিট দেখার দরকার নেই তা না। ট্রানজিট পর্যবেক্ষণ করে বোঝা যায় বহুদূরের কোনো তারা-গ্রহ সিস্টেমের আদ্যোপান্ত। ট্রানজিটের ফলে মূল তারার উজ্জ্বলতা কিছুটা হলেও কমে যায়। সেই পরিমাপ থেকে হিসাব করা যায় তারাটির ঔজ্জ্বল্য, পৃষ্ঠ তাপমাত্রা ইত্যাদি বিষয়াদি। এই দুর্লভ ঘটনাগুলোর কারণেই আমাদের মহাজগৎ হয়ে ওঠে বাঙময়।

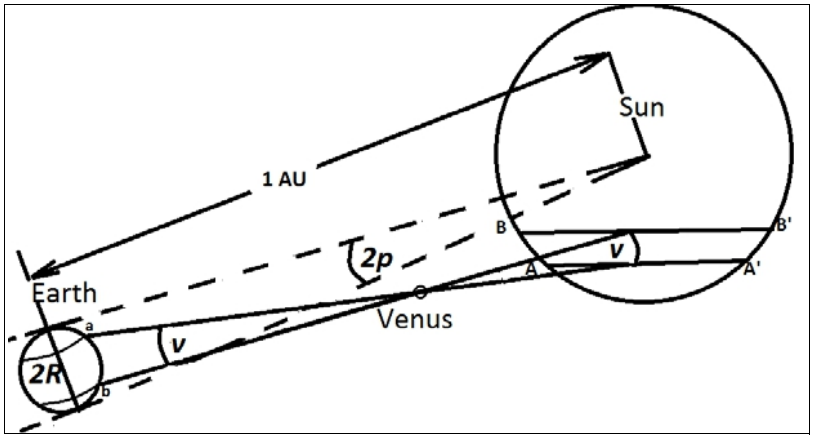

চিত্র: হ্যালির নিয়মানুসারে পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব নির্ণয়

এতক্ষণ পৃথিবী থেকে শুক্র এবং বুধ গ্রহের ট্রানজিট দেখলাম। কিন্তু আপনি যদি মঙ্গলের অধিবাসী হতেন তাহলে পৃথিবীর ট্রানজিটও দেখতে পেতেন আপনি।

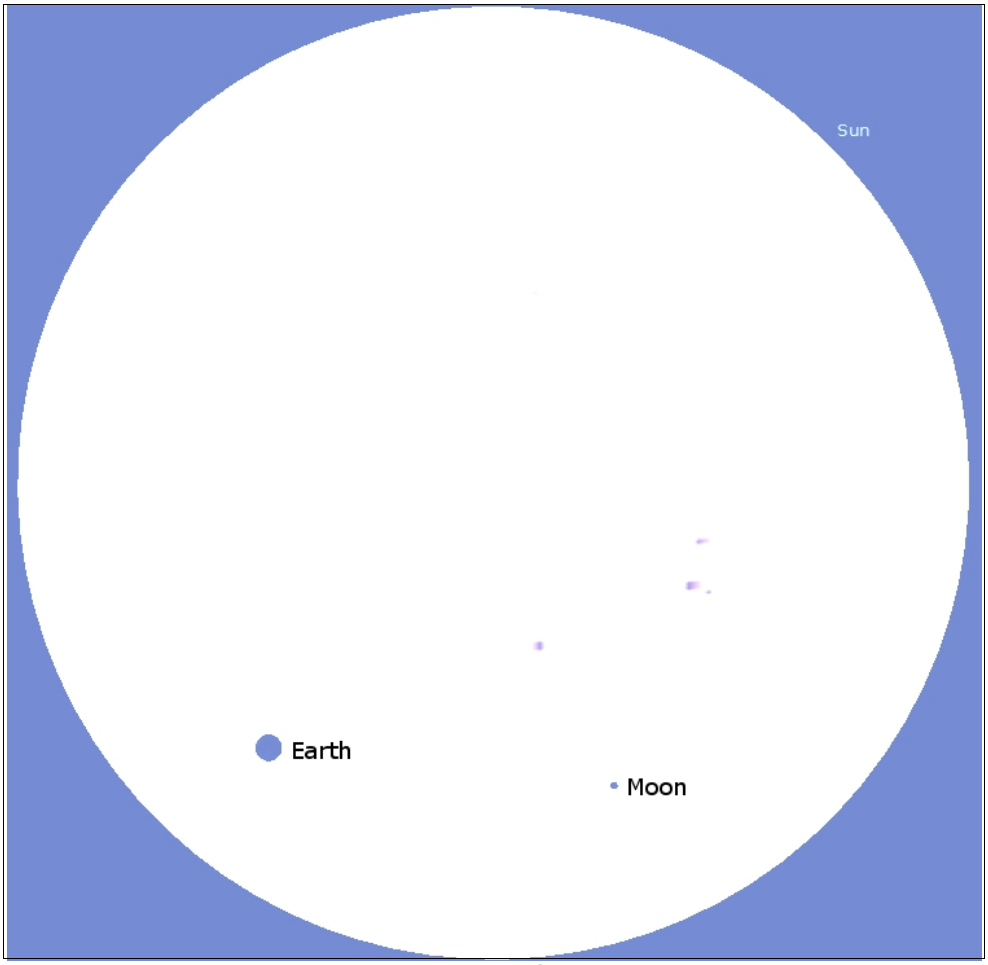

চিত্র: Mars থেকে পৃথিবীর ট্রানজিট

একইভাবে নেপচুনে গেলে হয়তো বাকি সাতটা গ্রহের প্রতিটিরই ট্রানজিট দেখা যেত। এ আলোচনা আর দীর্ঘ করব না। তবে জেনে রাখুন ট্রানজিট কিন্তু তিনটি গ্রহ দিয়েও হয়। সূর্য এর প্রয়োজন নেই। একটি গ্রহের ঠিক সামনে দিয়ে অপর একটি গ্রহ গেলে যদি পিছনের গ্রহটি ঢাকা পড়ে তাহলে এমন হয়।

Occultation: Occultation এর বাংলা অদৃশ্যকরণ। Occultation-ও Syzygy এর একটি উদাহরণ। যখন কোন মহাজাগতিক বস্তু অপর কোন মহাজাগতিক বস্তু দ্বারা ঢাকা পড়ে যায় তখন সেই অবস্থাটিকে বলা হয় Occultation। পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময় চাঁদ দ্বারা সূর্য ঢাকা পড়ে যায়। তাই বলা যায়, চাঁদ দ্বারা সূর্য ঢাকা পড়েছে বা অদৃশ্য হয়েছে। অন্য কথায় চাঁদ দ্বারা সূর্যের Occultation ঘটেছে। Occultation, Transit এর মতোই ঘটনা।কিন্তু ট্রানজিটে আমরা দেখেছি, বুধ বা শুক্র সূর্যের সামনে দিয়ে গমন করছে। অন্যদিকে যদি বুধ বা শুক্র সরাসরি সূর্য দ্বারা ঢাকা পড়ে যায় তাহলে বলা যাবে সূর্য দ্বারা বুধ বা শুক্রের Occultation ঘটেছে। তাহলে Transit এবং Occultation এর মধ্যে পার্থক্য কি? পার্থক্য হলো ট্রানজিটের সময় একটি বড়ো মহাজাগতিক বস্তুর সামনে দিয়ে ছোট একটি বস্তু গমন করবে, ফলে ছোট বস্তুটিকে বড়োটির সামনে দেখা যাবে। অন্যদিকে Occultation এ বড়োবস্তুটি ছোটটিকে ঢেকে ফেলবে। ট্রানজিট এবং Occultation কে একত্রে Occulsion বলা হয়। Occulsion এর সাথে চন্দ্রগ্রহণ কিংবা সূর্যগ্রহণের মিল আছে (বলতে গেলে প্রক্রিয়া একই) কিন্তু চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণে ছায়া পড়লেও Occulsion এ সেটা হয়না। এভাবেই আলাদা করে এদের সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে।

Occultation বিভিন্নভাবে হতে পারে।

চিত্র: চাঁদ দ্বারা বৃহস্পতি গ্রহের occultation

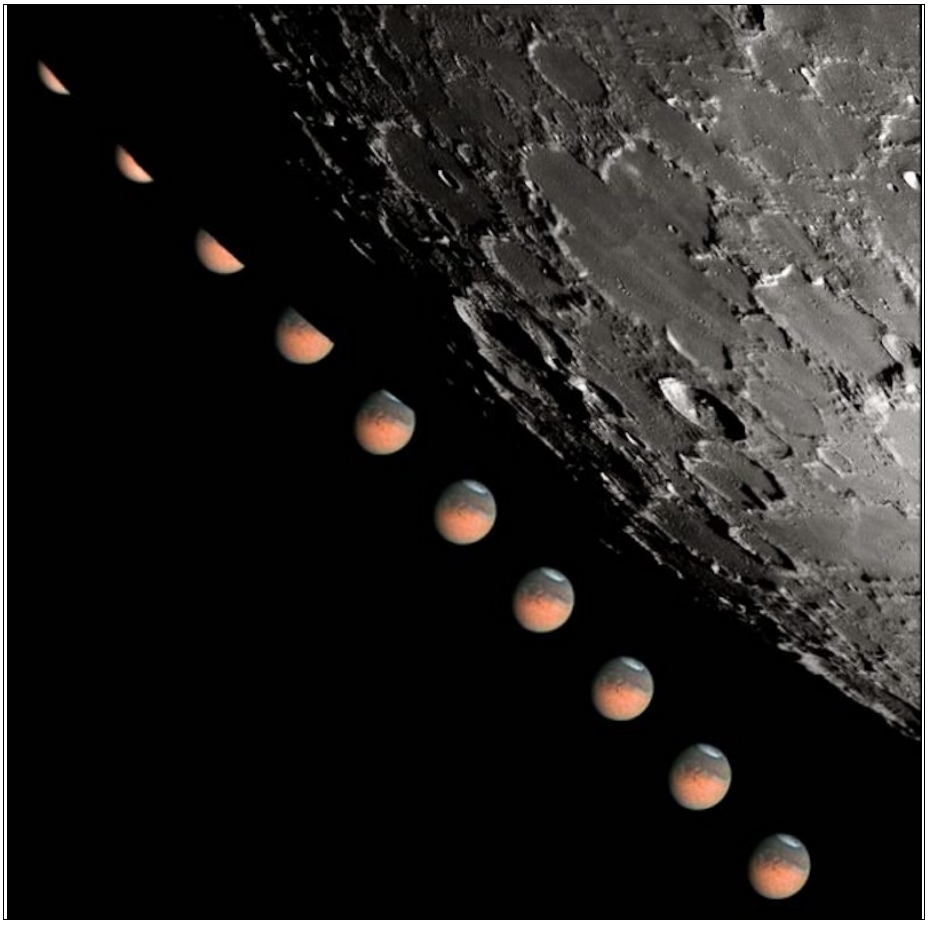

চিত্র: চাঁদ দ্বারা মঙ্গল গ্রহের occultation

চিত্র : চাঁদ দ্বারা শনি গ্রহের Occultation

চিত্র: চাঁদ দ্বারা শুক্র গ্রহের Occultation

গ্রহ দ্বারা কোন একটি তারা ঢেকে যেতে পারে। যেমন ২০১৪ সালের ১৬ এপ্রিল শুক্র গ্রহ দ্বারা ল্যাম্বডা অ্যাকুয়ারিস তারাটির Occultation। ২০১৫ সালের ১৮ ই অক্টোবর মঙ্গলগ্রহ দ্বারা কাই লিও তারাটির occultation ইত্যাদি এমন বহু Occultation এর তালিকা আছে। ২০২০ থেকে ২০৪০ সালের মাঝে এমন বহু Occultation ঘটবে। কিন্তু জেনে রাখা ভালো গ্রহণ বা Eclipse যেমন পৃথিবীর সমস্ত অংশ থেকে দেখা যায় না তেমনি occultation-ও কিন্তু পৃথিবীর সব অংশ থেকে দেখা যায় না। যেমন ২০৩২ সালের ৭ এপ্রিল শনি গ্রহের আড়ালে ঢাকা পড়বে 104 tauri তারকাটি। এটা শুধুমাত্র নিউজিল্যান্ড, গ্রিনল্যান্ড এবং উত্তর আমেরিকার অর্ধাংশে দেখা যাবে। আবার কিছু কিছু Occultation দিনের বেলায়ও হতে পারে। যেমন ২০৩২ সালের ২৯ মে শুক্র গ্রহ ঢেকে ফেলবে 53 tauri তারাটিকে। এটা শুধু মাত্র দক্ষিণ প্যাসিফিক সাগরের অংশে দেখা যাবে। কিন্তু তখন সেখানে দিনের আলো থাকবে।

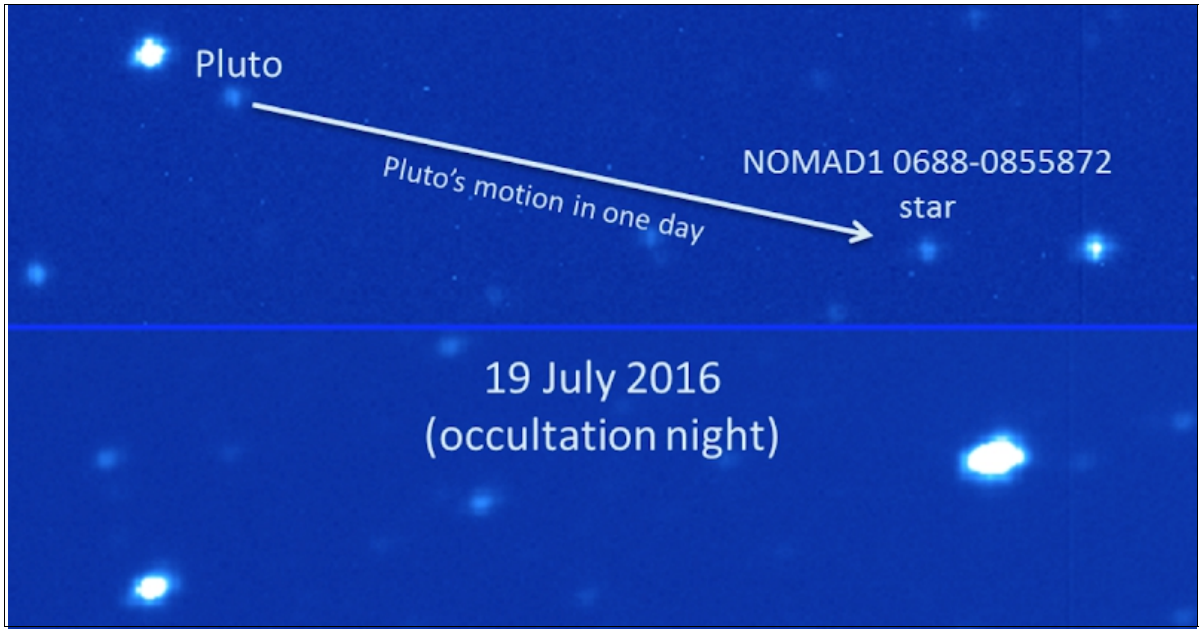

চিত্র: Pluto গ্রহ দ্বারা একটি তারার Occultation

তবে এই ধরনের Occultation দেখার জন্য বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে আমাদের জন্য দেখা খুবই কঠিন ব্যাপার।

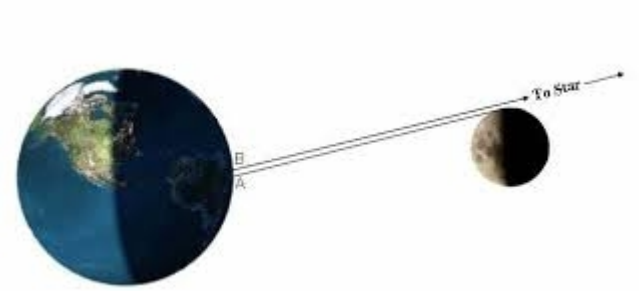

চিত্র: A স্থানের পর্যবেক্ষকের কাছে তারাটি চাঁদ দ্বারা ঢাকা পড়লেও B স্থানের পর্যবেক্ষকের কাছে মনে হবে চাঁদ তারাটিকে ঢাকতে পারেনি। তাই শুধুমাত্র A পর্যবেক্ষকই Occultation দেখবে।

১৯৯৮ সালের ১৩ এপ্রিল সকালবেলা পৃথিবীর কিছু মানুষের কাছে মনে হয়েছিল চাঁদের আড়ালে শুক্র এবং বৃহস্পতি দুটি গ্রহই ঢাকা পড়েছে। এই দৃশ্য শুধুমাত্র দক্ষিণ এশিয়া এবং আফ্রিকার কিছু অংশে দেকা গিয়েছিলো। কিন্তু পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ দেখেছিলো চাঁদ, শুক্র, বৃহস্পতি কে আলাদা আলাদা হিসেবে। সেদিন কেনিয়ার নাইরোবিতে বৃহস্পতি গ্রহের Occultation শুরু হয়েছিলো ৬টা ৪১ এ এবং শেষ হয়েছিল ৭টা ৪৯ এ। আবার শুক্র গ্রহের Occultation শুরু হয়েছিলো ৭টা ২৫ এ এবং শেষ হয়েছিল ৮টা ৫৯ এ। দুইটি গ্রহ একই সাথে ২৪ মিনিট ধরে চাঁদের আড়ালে ছিল। কিন্তু এগুলো সবই হয়েছিলো সকালবেলা। দিনের আলোয়। তাই এগুলো খালি চোখে না বরং টেলিস্কোপের সাহায্যেই বোঝা যেত। ১৬০০ থেকে ২২০০ সালের মাঝে এমন ২২ টি সময় পাওয়া গেছে যখন চাঁদের আড়ালে দুটি গ্রহ ঢেকে যাওয়ার মতো এমন ঘটনা ঘটবে। পরবর্তী তারিখটি হলো ২০৩৭ সালের ৬ সেপ্টেম্বর। তখন বৃহস্পতি এবং ইউরেনাস চাঁদের আড়ালে চলে যাবে কিছুক্ষনের জন্য। তবে এটি কিন্তু খালি চোখে দেখা যাবে না কারণ ইউরেনাস গ্রহ এমনিও খালি চোখে বোঝা যায় না। তাই খালি চোখে আলাদা করতে অপেক্ষা করতে হবে ২০৫৬ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত। তখন

বুধ এবং মঙ্গল এর একই সাথে Occultation ঘটবে। আবার আমরা জানি উপযুক্ত পরিবেশ ছাড়া বুধ গ্রহও দেখা যায়না। তাই ২০৫৬ সালেরটিও চোখ এড়িয়ে যেতে পারে। তাহলে আপনার জীবদ্দশায় হয়ত আর দেখা হবেনা কারণ শুক্র এবং মঙ্গলের একই সাথে occultation হবে ২১৪৭ সালের ২৭ আগস্ট।এটি খালি চোখে দেখা যাবে যদি আমরা বেচে থাকি। দুইটি গ্রহ একই সাথে চাঁদের পিছনে গিয়ে Occultation ঘটার এই ব্যাপারটিকে Simultaneous occultation of planets নামে অভিহিত করা যায়। দুটি গ্রহ যেমন চাঁদের পিছনে গিয়ে Occultation ঘটালো তেমনি একটি গ্রহ এবং একটি উজ্জ্বল তারা-ও occultation ঘটতে পারে। পরবর্তী তারিখটি হলো ২০২৫ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর যখন শুক্র গ্রহ এবং মঘা তারা (সিংহ রাশির তারকা) একসাথে চাঁদের আড়ালে ঢাকা পড়বে কিছু সময়ের জন্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো আপনি যদি ভেবে থাকেন এটি দেখবো তাহলে আপনি ভুল করছেন কারণ এই ঘটনাটি শুধুমাত্র সাইবেরিয়ার উত্তর পশ্চিমের কিছু অংশে দেখা যাবে তাও দিগন্তরেখার কাছাকাছি! বোঝাই যাচ্ছে কত বিরল ঘটনা এগুলো।

আরেক ধরনের Occultation হতে পারে চন্দ্রগ্রহনের সময় চাঁদের আড়ালে deep sky object ঢেকে যাওয়ার মাধ্যমে। কিন্তু এ আলোচনা এখানে করবনা। কারণ এটা খালি চোখে দেখতে পারবনা আমরা।

Mutual Occultation of Planets: যখন একটি গ্রহ অন্য একটি গ্রহের ঠিক সামনে দিয়ে গমন করে তখনই হবে এই ঘটনা। কিন্তু এটি অতি দুর্লভ ঘটনা। কারণ ১. পৃথিবী থেকে দেখলে শুক্র ছাড়া আর কোন গ্রহকে তারার আকারের ছাড়া কিছুই মনে হয়না ২. গ্রহের অনিয়মিত চলন। পৃথিবী থেকে দেখা হলে একটি গ্রহ তখনই অপর একটি গ্রহের আড়ালে অদৃশ্য হবে যখন ২য় গ্রহটি সূর্যের কাছে থাকে। উদাহরণ স্বরুপ মঙ্গল গ্রহ দ্বারা বৃহস্পতি গ্রহের Occultation হবে কিন্তু বৃহস্পতি দ্বারা মঙ্গলের Occultation হবেনা। কারণ প্রথম ক্ষেত্রে মঙ্গল যখন বৃহস্পতির Occultation ঘটাচ্ছে তখন দেখুন, মঙ্গল বৃহস্পতির চেয়ে সূর্যের কাছের গ্রহ। তাই প্রথমটি সম্ভব, দ্বিতীয়টি না। আবার অনুরূপভাবে মঙ্গলের Occultation বুধ গ্রহ দিয়ে হতে পারে কিন্তু বিপরীতটি সঠিক নয়।

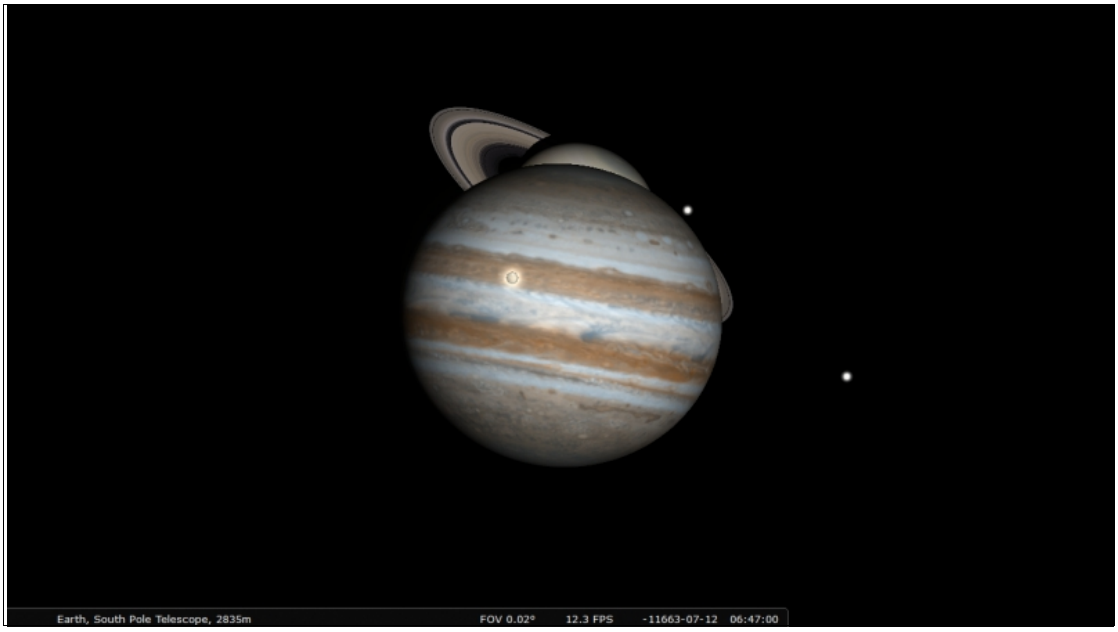

চিত্র : বৃহস্পতি গ্রহ দ্বারা শনি গ্রহের Occultation

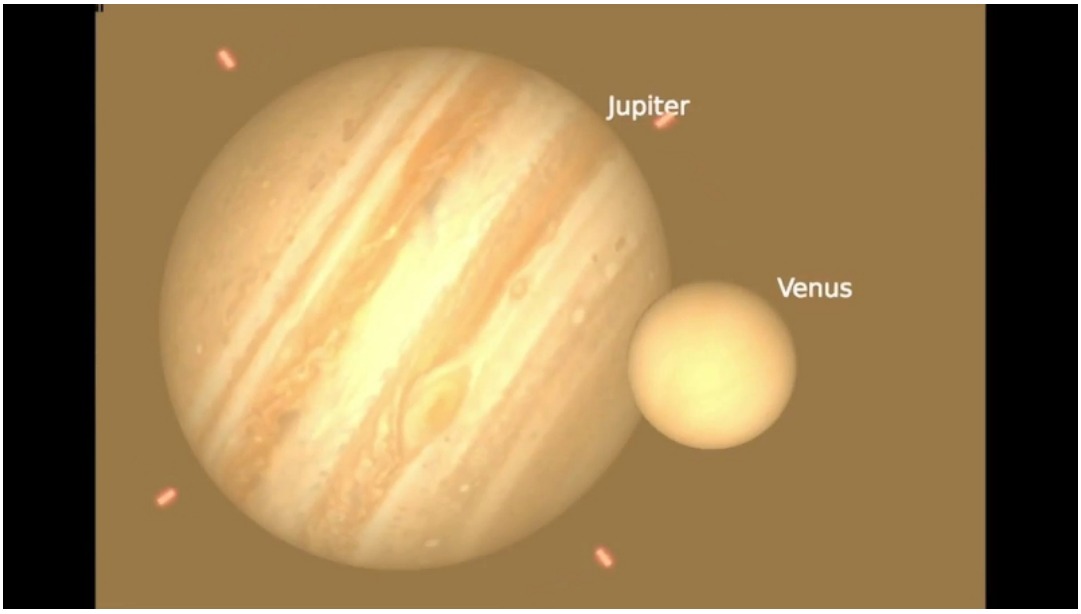

চিত্র : শুক্র গ্রহ দ্বারা বৃহস্পতি গ্রহের Occultation

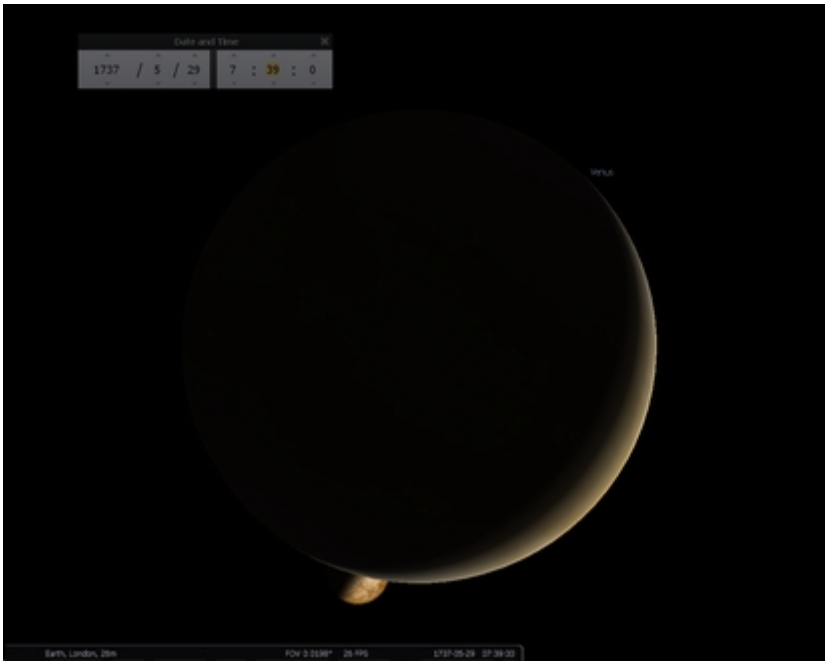

চিত্র : শুক্র গ্রহ দ্বারা বুধ গ্রহের Occultation

কিন্তু এর মাঝেও একটি ব্যতিক্রম আছে। শুক্র এবং বুধ গ্রহের মাঝে বুধ গ্রহ সূর্যের কাছে অবস্থান করে। তাই বুধ দ্বারা শুক্রের Occultation তো ঘটবেই। সাথে শুক্র দ্বারা বুধেরও ঘটবে। কিভাবে ঘটতে পারে এমন ঘটনা? নিচের চিত্র দেখুন।

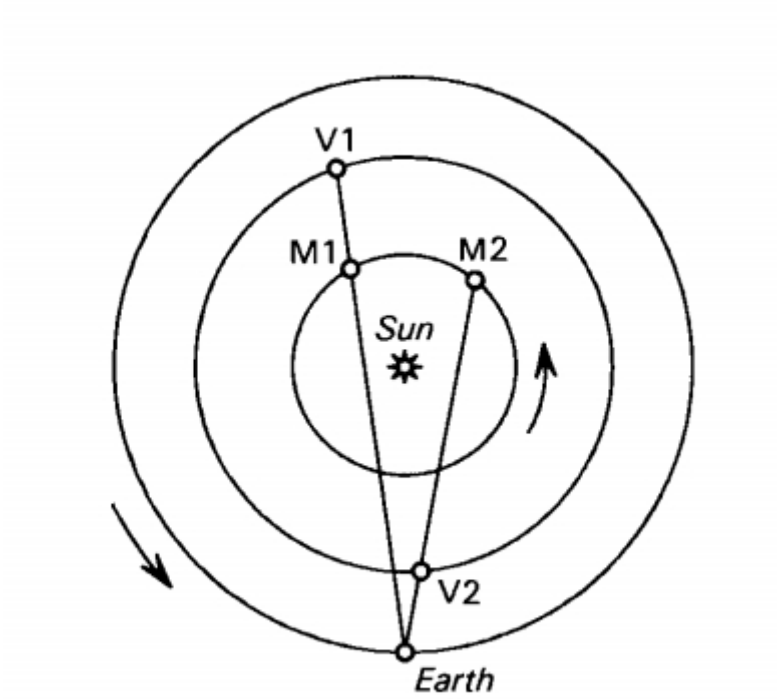

চিত্র : পৃথিবী এবং শুক্র গ্রহের মাঝে যেমন বুধ গ্রহ আসা সম্ভব তেমনি পৃথিবী এবং বুধ গ্রহের মাঝে শুক্র গ্রহেরও আসা সম্ভব. তাই দুই ধরনের Occultation ই ঘটবে। (V=Venus, M=Mercury)

1590 সালের ১৩ অক্টোবর জার্মান জ্যোতির্বিদ Michael Maestlin শুক্র গ্রহ দ্বারা মঙ্গলের Occultation লক্ষ্য করেন। আবার ১১৭০ সালের ১২ ই সেপ্টেম্বর চীনা জ্যোতির্বিদরা মঙ্গল দ্বারা বৃহস্পতি গ্রহের occultation লক্ষ্য করেন। গ্রিনিচ মানমন্দিরে ১৭৩৭ সালে জন বেভিস শুক্র গ্রহ দ্বারা বুধ গ্রহের Occultation পর্যবেক্ষণ করেন। পরবর্তী Occultation ঘটবে ২০৬৫ সালের ২২ নভেম্বর। এসময় শুক্র গ্রহের আড়ালে ঢাকা পড়ে যাবে গ্রহরাজ বৃহস্পতি। এই শতাব্দীতে ২০৬৫, ২০৬৭, ২০৭৯, ২০৮৮ এবং ২০৯৪ সালে দেখা যাবে গ্রহ-গ্রহ Occultation. তবে মহাজাগতিক ঘটনাগুলো সহজে পূর্ণতা পায়না কারণ এই শতাব্দীর occultation গুলোর মাঝে ২০৬৭, ২০৭৯ সালের দুইটি পার্ফেক্ট কিন্তু বাকিগুলো নয়। তাও আপনার স্থান হতে দেখা যাবে কিনা সেটাও ভাবার বিষয়।

এছাড়া আরও Occultation এর ধরন আছে! চাঁদ দ্বারা কোন উজ্জ্বল তারার Occultation, গ্রহনরত চাঁদ দ্বারা গ্রহের Occultation.গ্রহনরত সূর্য দ্বারা তারা, গ্রহের Occultation, গ্রহ দ্বারা তারার Occultation ইত্যাদি। এসব আর ডিটেইলস আলোচনা করবনা কারণ Occultation কি জিনিস তা আমরা উপরের আলোচনা থেকে বুঝে গেছি।

চিত্র : চাঁদ দ্বারা রোহিনী তারকার Occultation (1342 সালে ঘটা)

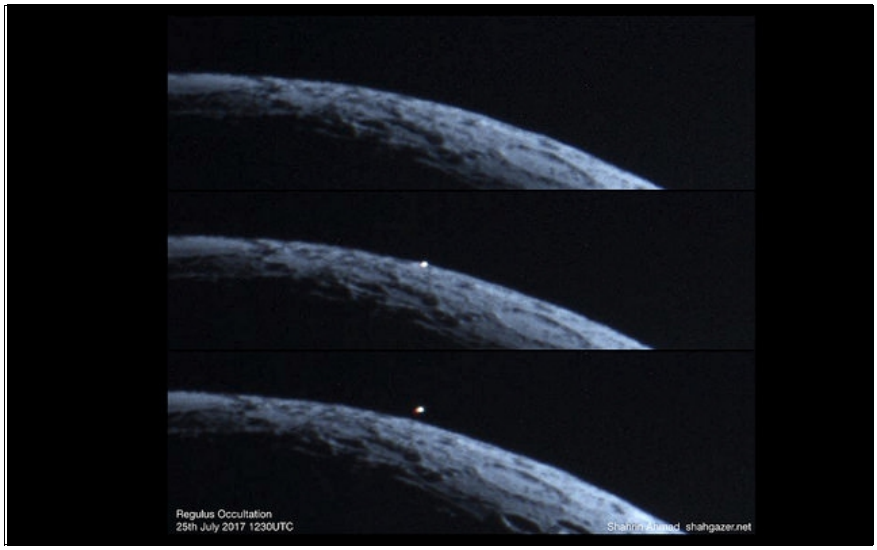

চিত্র : চাঁদ দ্বারা মঘা তারকার Occultation

চিত্র: চন্দ্রগ্রহনের সময় চাঁদ দ্বারা একটি তারার Occultation

মহাজাগতিক দূর্লভ ঘটনার শেষ নেই। Occultation তার একটি। আশা করি Syzygy এর শেষাংশে এসে আপনি Transit, conjunction, opposition, eclipse, occultation এর পার্থক্য বুঝতে পেরেছেন।

Planetary configuration

এই বিষয়টি জানার আগে আমাদের জ্যোতির্বিজ্ঞানের সুদীর্ঘ ইতিহাসের দিকে সংক্ষিপ্ত আকারে একটু দৃষ্টিপাত করে নেওয়া জরুরি। প্রাচীন কালের বিখ্যাত সব গ্রিক দার্শনিকেরা আকাশে যা দেখতেন সেগুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতেন। ফলশ্রুতিতে বেরিয়ে আসত নতুন নতুন ব্যাখ্যা যেগুলোর সঠিকতা যাচাই করতে গিয়েই বলা যায় আমরা পেয়েছি আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যা।

প্লেটো এবং অ্যারিস্টটল এর নাম শোনেননি এমন মানুষ খুজে পাওয় দুষ্কর। প্লেটো খ্রিষ্টপূর্ব ৪২৭ সালে জন্ম গ্রহন করেছিলেন। তার ছাত্র ছিলেন অ্যারিস্টটল। অ্যারিস্টটল জ্ঞানের সর্ব শাখায় বিচরণ করেছিলেন। ইতিহাসের সেরা দার্শনিকের একজন তিনি। এই গুরু শিষ্য দু'জন প্রথম গ্রহনযোগ্য আকারের কথা বলেছিলেন আমাদের মহাবিশ্বের।

চিত্র : অ্যারিস্টটল এবং প্লেটো

অ্যারিস্টটল বললেন, পৃথিবী এই মহাবিশ্বের কেন্দ্রে অবস্থিত। তিনি একটি মডেল তৈরি করলেন যেখানে ৫৫ টি গোলক একেছিলেন তিনি। এই গোলকগুলো আবার বিভিন্ন গতিতে বিভিন্ন কোণে ঘূর্ণনরত ছিলো। তিনি এই গোলকগুলোর মাঝে ৭ টি গ্রহ কল্পনা করেছিলেন। ৭ টি গ্রহ বলতে তখন অ্যারিস্টটল চাঁদ এবং সূর্যকেও গ্রহ বলে ধরেছিলেন। কারণ তার বিশ্বাস ছিলো পৃথিবী কেন্দ্রে অবস্থান করছে। তাই এটা স্থির। অ্যারিস্টটল এর এই মডেল ২০০০ বছর ধরে প্রভাব বিস্তার করে এসেছিলো। অ্যারিস্টটল এর যুগের প্রায় ৫০০ বছর পরে টলেমি আবার অ্যারিস্টটল এর মডেল এর দিকে দৃষ্টি দেন। পর্যবেক্ষনের মাধ্যমে তিনি ধারণা করেন অ্যারিস্টটল ই ঠিক ছিলেন।বলে রাখা ভালো টলেমি খুবই মেধাবী একজন গণিতবিদ ছিলেন।

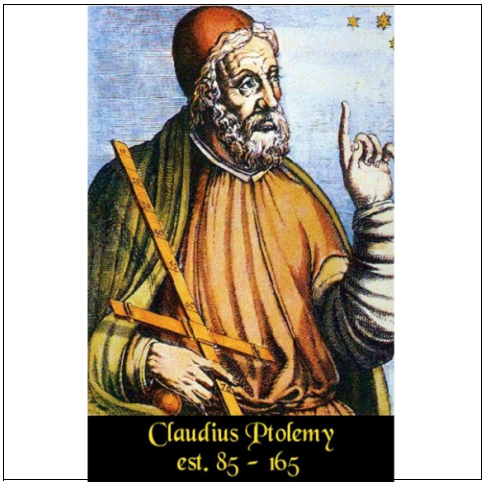

জ্যোতির্বিদ্যায় টলেমীর আগ্রহের কেন্দ্রে ছিলো গ্রহগুলোর গতিবিধি। তার জ্যামিতিক এবং গাণিতিক জ্ঞান কাজে লাগিয়ে তিনি পুরো মহাবিশ্বকে একটি গাণিতিক মডেলে এনে দাড় করার প্রয়াস দেখিয়েছিলেন। অ্যারিস্টটল এর মতবাদের সাথে টলেমীর গানিতিক মতবাদ এক হয়ে পৃথিবী কেন্দ্রিক মহাবিশ্বের ধারণা মানুষের মনে বদ্ধমূল হয়ে ওঠে। মোটামুটি ভাবে টলেমির মতবাদের বৈশিষ্ট্য গুলো ছিলো:

১. পৃথিবী এই মহাবিশ্বের স্থির কেন্দ্র।

২. তারকাগুলো একটি বিশাল বড়ো গোলকের ভিতরের পৃষ্ঠে অবস্থান করে। এই গোলকটি আবার ঘূর্ননরত। তাই মনে হয় তারাগুলোও পৃথিবীর চারপাশে ঘোরে।

৩. সূর্য, চাঁদ ও পৃথিবীর চারপাশে ঘোরে

৪. চাঁদ সূর্য বৃত্ত পথে পৃথীবিকে পরিভ্রমন করে। কিন্তু বুধ,এবং শুক্র গ্রহ বৃত্তপথে পরিভ্রমন করেনা। তারা আপন কক্ষপথে বৃত্ত রচনা করে পরিভ্রমন করে। মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি এই গ্রহগুলো যেমন পৃথিবীর চারপাশে ঘোরে তেমনি এরা নিজেরাও নিজেদের কক্ষপথে বৃত্ত রচনা করে পরিভ্রমন করে। একে epicycle বলে।

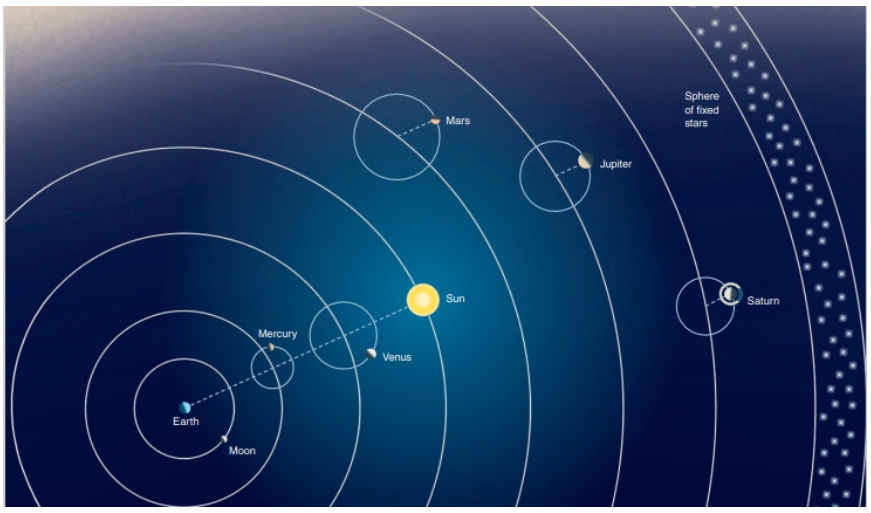

চিত্রঃ টলেমির মডেল

বুধ এবং শুক্র গ্রহকে সূর্যের কাছেই দেখা যায় সবসময়। তাও সকাল বেলা এবং সন্ধ্যাবেলা ছাড়া দেখা যায়না। তাই টলেমি ধারণা করেছিলেন এরা হয়ত পৃথিবীর চারপাশে ঘোরেনা। যদি ঘুরত তাহলে সূর্যের অত কাছে থাকতোনা। তাই শুক্র এবং বুধ গ্রহকে তিনি পুরো আলাদা কক্ষপথে ঢুকিয়ে দিলেন।

এদিকে প্রাচীনকাল থেকেই গ্রহদের একটি অন্যরকম বৈশিষ্ট্য জ্যোতির্বিদদের আকৃষ্ট করেছিলো। তারা লক্ষ্য করেছিলেন, গ্রহরা সবসময় পূর্ব থেকে পশ্চিমে যায়না। কিছুদিনের জন্য গ্রহরা দিক পরিবর্তন করে পূর্বে যাওয়া শুরু করে। আবার কিছুদিন পর পূর্বদিক হতে দিক পরিবর্তন করে পশ্চিমে যাওয়া শুরু করে। এই গতিকে বলা হয় Retrograde motion. এর সঠিক ব্যাখ্যা আমরা এখন জানলেও (একটু পরেই আসল ব্যাখ্যা জানব আমরা) তখন কিন্তু শুধুমাত্র পৃথিবী কেন্দ্রিক মডেলে এটা ব্যাখ্যা,করা যাচ্ছিলনা।তাই এই গতি ব্যাখ্যা করতে টলেমি Epicycle এর ধারণার অবতারনা করলেন।তিনি তার এই Epicycle এর ধারণার মাধ্যমে Retrograde loop এর একটি ব্যাখ্যা দাড় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। টলেমির মডেলানুসারে Retrograde motion তিনি নিচের পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করেছিলেন।

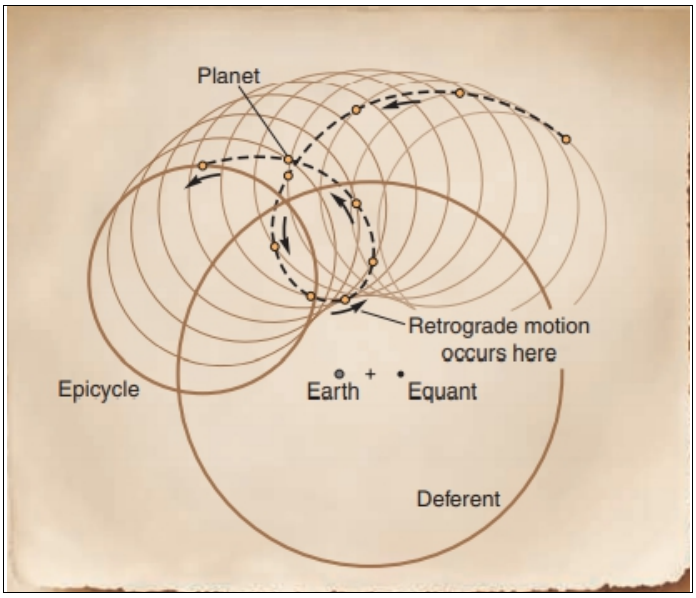

চিত্রঃ টলেমির মডেল অনুসারে retrograde motion এর ব্যাখ্যা

আরও অধিকতর সুক্ষ্ম ব্যাখ্যার জন্য টলেমি epicycle এর উপর আরও ক্ষুদ্র Epicycle এর ধারণাও দিয়েছিলেন। তার কিছু মডেলে ১০০ টির মতো Epicycle এর ধারণা তিনি দিয়েছিলেন বলে জানা যায়।

একটি বিষয় না বললেই নয়।প্রাচীন গ্রিকরা প্রচুর চিন্তাশীল ছিলো, তারা খুঁটিয়ে খুটিয়ে সবকিছু যাচাই করে তারপরই সিদ্ধান্ত দিত। তারা যদি প্যারালাক্স উপলব্ধি করতে পারতেন তাহলে হয়ত তারা স্থির কেন্দ্র ধরতেননা, এই পৃথিবীকে। কিন্তু প্যারালাক্স অতি সুক্ষ্ম যন্ত্রপাতি দিয়ে নির্ণয় করতে হয়। খালি চোখে এগুলো বোঝা আসলেই দুঃসাধ্য। এসব কারণেই তৈরি হয়েছিলো পৃথিবী কেন্দ্রিক এক মডেল

টলেমি তার এই মডেলের বিস্তারিত বিবরন তার বিখ্যাত বই Mathematical Syntaxis এ লিপিবদ্ধ করেন। মধ্যযুগে ইসলামি জ্যোতির্বিদদের হাত ধরে এই বইটি নিয়ে চর্চা শুরু হয়। তারা বইটির নাম দেন Al magisti । ১২ শতকে আরবি থেকে ল্যাটিন অনুবাদ করা হলে এই বইটি পরিচিতি পায় Almagest নামে।

এদিকে ১০ শতকের শুরুতে মুসলিম জ্যোতির্বিদদের মাঝে টলেমীর পৃথিবী কেন্দ্রিক মডেল নিয়ে সমালোচনা শুরু হয়।বসরার জ্যোতির্বিদ ইবনে আল হাইথাম টলেমীর সমালোচনা গুলো সব এক জায়গয় তুলে ধরেন। কিছু মুসলিম জ্যোতির্বিদ বলা শুরু করলেন টলেমীর মতানুযায়ী পৃথিবী স্থির নয়। এটাও ঘুর্ণনশীল। আবার ১০২০ সালে **আবু সাইদ আল সিজি** বললেন পৃথিবীও নিজ অক্ষের চারপাশে ঘোরে। এই ঘূর্ণন এর ফলেই মনে হয় তারারা আমাদের চারপাশে ঘুরছে। তার নিজের এই ধারণা কাজে লাগিয়ে তিনি নিজের মতো করে উদ্ভাবন করলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানের এক অপরিহার্য যন্ত্র অ্যাস্ট্রোল্যাব। ওদিকে ধীরে ধীরে পৃথিবীর নিজ অক্ষের ঘূর্ণন এর ব্যাপারটি আরও কয়েকজন জ্যোতির্বিদ বিশ্বাস করা শুরু করলেন। কিছু আরবি রেফারেন্স দিয়ে তারা বলতে লাগলেন তারকারা টলেমীর মতানুযায়ী গতিশীল না। তারা ঘুরছে মনে হয় আমাদের কাছে কারণ পৃথিবী নিজেই নিজের অক্ষের উপর ঘুরছে। ১২ শতকে আরবীয় জ্যোতির্বিদ **নুর আদ দীন আল ব্রিক্রুজি** টলেমীর মতবাদের বিকল্প একটি মতবাদ উত্থাপন করেন। কিন্তু তার মতবাদটি টলেমীর সাথে না মিললেও আল বিতরুজি ও তার মডেলে দেখাতে পারেননি যে সূর্যই এই সৌরজগতের কেন্দ্র। টলেমীর মডেল কে কাল্পনিক বলে আখ্যায়িত করলেন আল বিতরুজি। ১৩,১৪ শতকে আল উর্দি, আল তুসি, আল শাতির এদের হাত ধরে জ্যামিতি এবং গণিতে অভুতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়। আল শাতির দুইটি মডেল উত্থাপন করেন।এই দুই মডেল তখন সৌরকেন্দ্রিকতার ধারণাই দিচ্ছিলো।

১৪৭৩ সালে জন্মগ্রহন করেন নিকোলাস কোপার্নিকাস। ১৫১৪ সালে তিনি সৌরকেন্দ্রিক মহাবিশ্বের একটি মডেলের কথা উপস্থাপন করেন। পৃথিবীর নিজ অক্ষের উপর ঘূর্নন সহ তার যাবতীয় কাজ সমূহ ১৫২৯ সালে একটি বই আকারে লিখে রাখেন। বইটির নাম *De Revolutionibus Orbium Coelestium.*

চিত্রঃ *De Revolutionibus Orbium Coelestium.*

কিন্তু তার এই তত্ত্ব টলেমি কিংবা অ্যারিস্টটল এর ঘোর বিরোধী। তাই তিনি এটিকে প্রকাশ করতে ইতস্তত করছিলেন। এছাড়া চার্চের লোকজনের বিধি নিষেধও ছিলো। মূল কথা কোপার্নিকাসের চাচা নিজেই যখন চার্চের উচ্চপদস্থ এক কর্মকর্তা! এছাড়াও কোপার্নিকাস বুঝতে পেরেছিলেন তার তত্ত্বটি স্বয়ংসম্পূর্ন না। কারণ তার তত্ত্ব গ্রহগুলোর অবস্থান

সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারতোনা। তাই তিনি এটি প্রকাশ করার ইচ্ছে বাদ দিলেন। কিন্তু ১৫৪০ সালে তিনি **Joachim Rheticus** নামক এক জ্যোতির্বিদের সাথে দেখা করার সুযোগ পান। তখন কোপার্নিকাস তার মডেলের একটি খসড়া প্রিন্ট করতে পাঠিয়ে দেন। কারণ সেসময় Rheticus কোপার্নিকাসের কাজগুলো তার বই *Prima Narratio* তে প্রকাশের কথা বলেন। দুর্ভাগ্যবশত ১৫৪৩ সালে কোপার্নিকাস মারা যান। তখনও তার সেই মডেল ছাপা,হয়নি। তার ঐ মডেলের গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ ছিলো গ্রহের Retrograde motion এর ব্যাখ্যা। এই ব্যাখ্যা দিতে টলেমি Epicycle নামক এক জটিল ধারণা টেনে এনেছিলেন। কিন্তু কোপার্নিকাস সৌরকেন্দ্রিক মডেলে Epicycle এর সাহায্য ছাড়াই এটি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু কোপার্নিকান মডেলের অন্যতম ত্রুটি ছিল এই মডেল গ্রহের অবস্থান তখন সঠিক ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেনি কিন্তু এদিক থেকে টলেমি ছিলেন এগিয়ে। কোপার্নিকাসের আরও একটি ধারণায় ভুল ছিলো। তিনি মনে করেছিলেন গ্রহগুলো বৃত্তাকার পথে গতিশীল কিন্তু উপবৃত্তাকার গতিপথের কারনে গ্রহের বিচ্যুতির ব্যাপারটি তার নজর এড়ায়নি। তিনি বৃত্তাকার কক্ষপথে দিয়ে যখন ব্যাখ্যা করতে পারছিলেননা তখন তিনিও অতিক্ষুদ্র Epicycle ধারণা দিলেন যেটা কিনা গ্রহের এই পরিবর্তন এর জন্য দায়ী। কোপার্নিকান মডেলের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো তিনি পৃথিবী কে একটি গ্রহ রূপে দেখেছিলেন যা ছিলো যুগান্তকারী।

চিত্রঃ কোপারনিকাস এর ৫০০ তম জন্মদিন উপলক্ষে তৈরিকৃত স্টাম্প

অন্যদিকে ১৩ শতকের মাঝামাঝি সময় টলেমীর মতবাদ গ্রহন করে একদল জ্যোতির্বিদ টলেমীর Almagest ১০ বছর ধরে পড়াশোনা করেন। এবং শেষে একটি সারণি প্রকাশ করেন যেটা Alfonsine table নামে খ্যাত। রাজা Alfonso এর নামানুসারে এর নামকরন করা হয়। আবার কোপার্নিকাসের মডেল অনুসারে তৈরি করা হয় সারণি The prutenic table.

চিত্রঃ রাজা Alfonso ও তার জ্যোতির্বিদরা

দেখা গেলো, Alfonsine table এর চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে নিখুতভাবে গ্রহগুলোর অবস্থান ব্যাখ্যা করতে পারছেনা এই কোপার্নিকান মডেল।

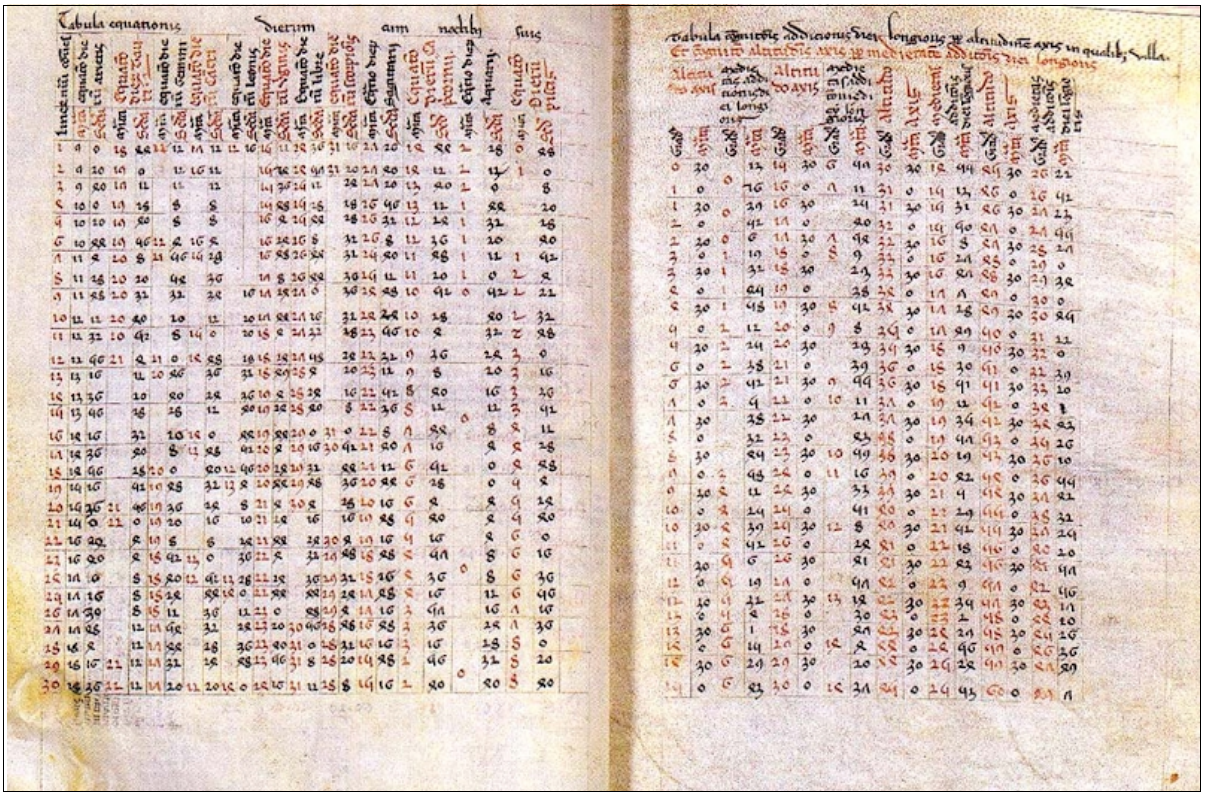

চিত্রঃ Alfonsine table

কোপার্নিকাসের এই মডেলের ত্রুটিই আমাদের প্রবেশ করালো আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের দিকে। এখন প্রশ্ন দেখা দিলো, গ্রহরা বৃত্তাকার পথে না চললে তাদের পথে আসলে কেমন?

রঙ্গমঞ্চে হাজির হলেন টাইকো ব্রাহে। যার পর্যবেক্ষণ আমাদের এনে দিয়েছিলো অভূতপূর্ব তথ্যসমূহ। ১৫৬৩ সালের ২৪ আগস্টের কথা। বৃহস্পতি এবং শনি গ্রহ খুবই কাছাকাছি এসেছিলো ঐদিন। মাত্র সামান্য ব্যবধান ছিলো গ্রহ দুটির মাঝে। টাইকো Alfonsine table খুললেন। দেখলেন ঐ সারণিতে যে তারিখে ঘটনাটা ঘটবে বলে উল্লেখ আছে সেটার সাথে ২৪ আগস্টের ব্যবধান ১ মাসের বেশি। আবার অন্যদিকে কোপার্নিকান মডেল অনুযায়ী রচিত Prutenic table হতে প্রাপ্ত তারিখের সাথেও কয়েক দিনের ত্রুটি দেখা গেলো। ১৫৭২ সালে আকাশে একটি নতুন তারা দেখা গেলো যার উজ্জ্বলতা শুক্র গ্রহের চেয়েও বেশি ছিলো। আসলে ওটি ছিলো সুপারনোভা যা বর্তমানে টাইকো সুপারনোভা নামে পরিচিত।

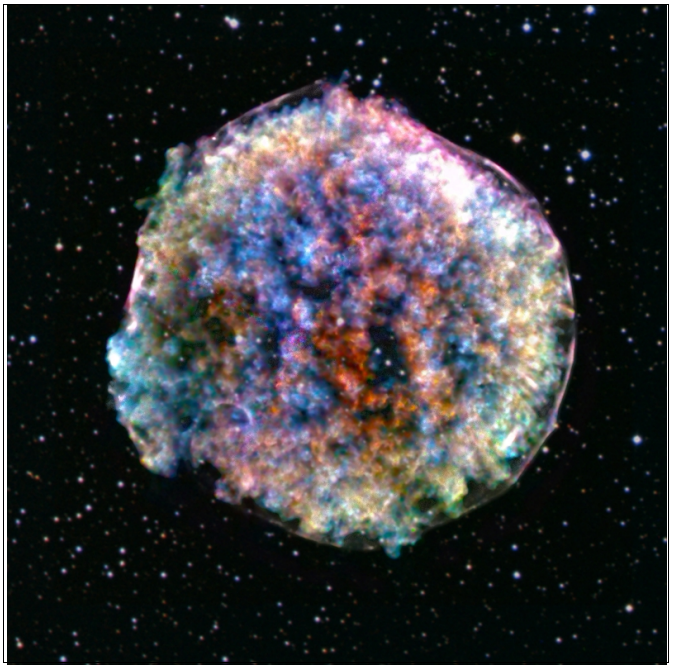

চিত্রঃ টাইকো সুপারনোভা

প্রাচীনকাল হতে ধারণা করা হতো আকাশে নতুন তারা দেখলে বুঝতে হবে স্বর্গে কোন পরিবর্তন হয়েছে। এর পরপরই তারাটি চাঁদের আড়ালে ঢাকা পড়বে। কিন্তু টাইকো দেখলেন তেমন কিছু হলোনা। তখন টাইকো ধারণা করলেন নিশ্চয়ই তারাটি চাঁদের থেকে অনেক দূরে অবস্থিত এবং হয়ত তারাটি নিজেও চাঁদের মতোই গোলকাকার। টাইকোর এইধারণা অ্যারিস্টটল, টলেমি কিংবা কোপার্নিকাসের ধারণা থেকেও আলাদা ছিলো।

চিত্রঃ টাইকো ব্রাহে

টাইকো যখন দেখলেন নতুন তারাটি জায়গা থেকে নড়ছেনা তখন তিনি বলতে গেলে টলেমীর মডেলের বিরুদ্ধে একটি যৌক্তিক প্রমান খুজে পেলেন। তিনি তার এই আবিষ্কার একটি ছোট্ট বই De stella nova তে লিপিবদ্ধ করে প্রকাশ করলেন। এই বই খুব দ্রুত ইউরোপ সহ বহু জায়গায় ছড়িয়ে পড়লো। ফলশ্রুতিতে ডেনমার্কের রাজা ফ্রেডরিখ ডেনমার্কেই তার নিজস্ব অর্থায়নে টাইকোকে মানমন্দির তৈরি করে দিলেন। টাইকোর জন্য রাজা পর্যবেক্ষণ করার উপযোগী টাওয়ার সম্বলিত মানমন্দির নির্মান করে দিলেন।

চিত্রঃ টাইকোর জন্য নির্মিত মানমন্দির

সেখানে তার দেখভালের জন্য সেবক, সহকারী সব নিযুক্ত করা হলো। রাজার হালে থাকতে শুরু করলেন টাইকো। টাইকো কোপার্নিকাসের মডেলও মানতেন না, টলেমীর মডেলও মানতেননা। তিনি কল্পনা করেছিলেন আরও জটিল একটি মডেলের। টাইকো বললেন, পৃথিবীই মহাবিশ্বের কেন্দ্র কিন্তু টলেমীর মডেলের মতো নয়। তিনি বললেন পৃথিবীর চারপাশে সূর্য ঘোরে। আবার সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘোরে বাকিগ্রহগুলো।

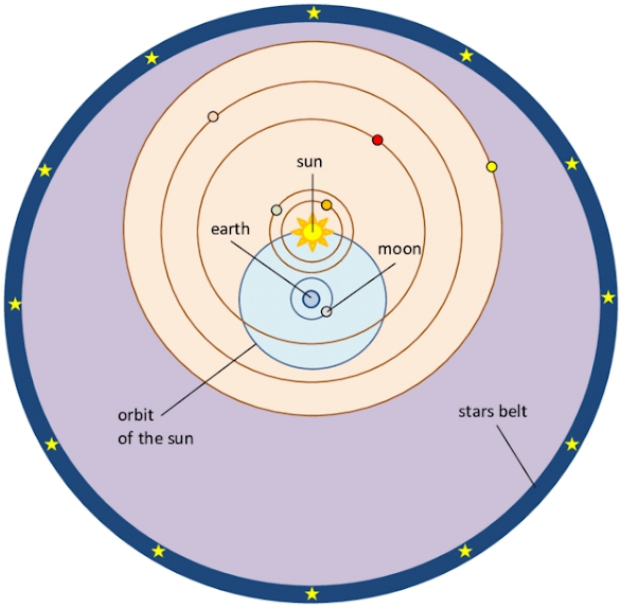

চিত্রঃ টাইকোনিক মডেল।

এ যেন টলেমি আর কোপার্নিকান মডেলের সংমিশ্রণ! টাইকোর এসব ক্ষেত্রে অবদান না থাকলেও টাইকোর মূল অবদান হলো পর্যবেক্ষণ মূলক জ্যোতির্বিদ্যায়। ২০ বছর ধরে রাতের পর রাত অমানুষিক পরিশ্রম করে গেছেন টাইকো। তার ফলশ্রতিতে সূর্য, চাঁদ, গ্রহ এসবের নিখুত অবস্থান শনাক্ত করে তাদের অবস্থান লিখেছিলেন তিনি। টেলিস্কোপ তখনও আবিষ্কার হয়নি। খালি চোখেই টাইকো করেছেন এই কাজ। ১৫৮৮ সালে রাজা ফ্রেড্রিক মারা যান। রাজা হন তার ছোট সন্তান। টাইকোর সুখের দিন শেষ। নিজের পর্যবেক্ষণ এর খসড়া নিয়ে বের হয়ে গেলেন তিনি। উপস্থিত হলেন প্রাগ শহরে। সেখানে রোমান সম্রাট Rudolph এর দরবারে গিয়ে গণিতবিদ হিসেবে নিযুক্ত হলেন। টাইকো এবার তার লক্ষ্য স্থির করলেন। টাইকো নিজে Alfonsine table এর মতো একটি সারণি বের করতে চাইলেন যার নাম হবে Rudolphine table। এটার মূল ভিতরের হবে টাইকোর উদ্ভাবিত টাইকোনিক মডেল। এই কাজ করার জন্য তিনি জড়ো করলেন কিছু গণিতবিদ এবং জ্যোতির্বিদকে। যার ভিতর ছিলেন জোহানেস কেপলার!

কেপলার ১৫৭১ সালে জার্মানির দক্ষিন পশ্চিমে এক অতি দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহন করেন। তার পরিবারের অবস্থা ভালো ছিলোনা। বহু পথ পাড়ি দিয়ে তিনি টাইকোর সাথে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু ১৬০১ সালে টাইকো মারা যান এবং টাইকোর পদটি কেপলার পেয়ে যান কিন্তু তিনি টাইকোর তুলনায় ১/৬ অংশ টাকা পেতেন তার এই কাজের জন্য। যাই হোক, তবুও তিনি এই কাজ পেয়ে যথেষ্ট খুশি ছিলেন। টাইকোর মৃত্যুর পর কেপলার মঙ্গল গ্রহের গতিপথ পর্যবেক্ষণ করা শুরু করলেন। ১৬০৬ সালের দিকে তিনি আসল রহস্য উদঘাটন করলেন। ২০০০ বছরের নিয়ম গুড়িয়ে দিয়ে তিনি বললেন মঙ্গলের গতিপথ উপবৃত্তাকার, বৃত্তাকার নয়। সৌরজগতের কেন্দ্র সূর্য। কেপলার লক্ষ্য করলেন গ্রহগুলোর বেগ আবার পরবর্তনশীল। তার বিশ্লেষণ হতে দেখা গেলো গ্রহগুলো সূর্যের কাছে গেলে বেগ বাড়ে কিন্তু সূর্য হতে দূরে গেলে বেগ কমে যায়।

অবশেষে দীর্ঘ সময় ধরে চলে আসা এক ধাধার সমাধান হলো। তিনি তার এই ফলাফল *Astronomia Nova* নামক বইয়ে প্রকাশ করলেন।

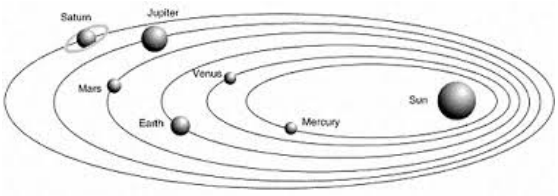

চিত্রঃ কেপলারের পর্যবেক্ষণ

এদিকে ১৬০৯ সালে গ্যালিলিও নিজে একটি টেলিস্কোপ উদ্ভাবন করে এক বিপ্লব ঘটালেন। তিনি তার টেলিস্কোপে যা যা দেখেছিলেন তার ভিতর ছিলো:

১. মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি অসংখ্য তারকা দিয়ে পূর্ণ।

২. তিনি সৌরকলঙ্ক আবিষ্কার করেন। তা হতে তিনি দেখলেন সূর্য নিজ অক্ষে প্রায় ২৭ দিনে একবার আবর্তন করে। সৌরকলঙ্ক এর গতিবিধি দেখে তিনি বুঝতে পারেন সূর্য একটি বৃহৎ গোলক।

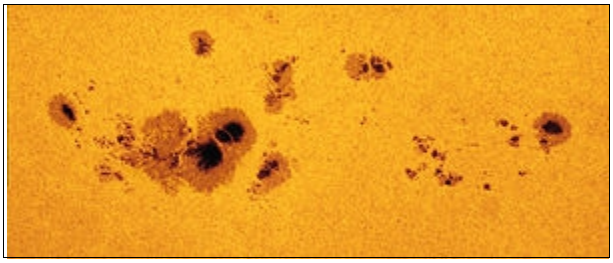

চিত্রঃ সৌর কলঙ্ক

৩. তার অন্যতম আবিষ্কার ছিল যখন তিনি তার টেলিস্কোপ শুক্র গ্রহের দিকে ফেরালেন। তিনি শুক্র গ্রহ পর্যবেক্ষনের সময় দেখেন শুক্র গ্রহেরও চাঁদের মতো কলা আছে। কিন্তু টলেমিক মডেল অনুসারে শুক্রগ্রহের সবসময় একটি অংশই আলোকিত হবে। কিন্তু তার পর্যবেক্ষণ বলে চাঁদের মতোই পরিবর্তন হচ্ছেশুক্রের দশা। চাঁদের যেমন নতুন চাঁদ, অর্ধচন্দ্র, পূর্ণিমা হচ্ছে তেমনই হয় শুক্রের। যেটা একমাত্র কোপার্নিকান মডেল দিয়েই ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

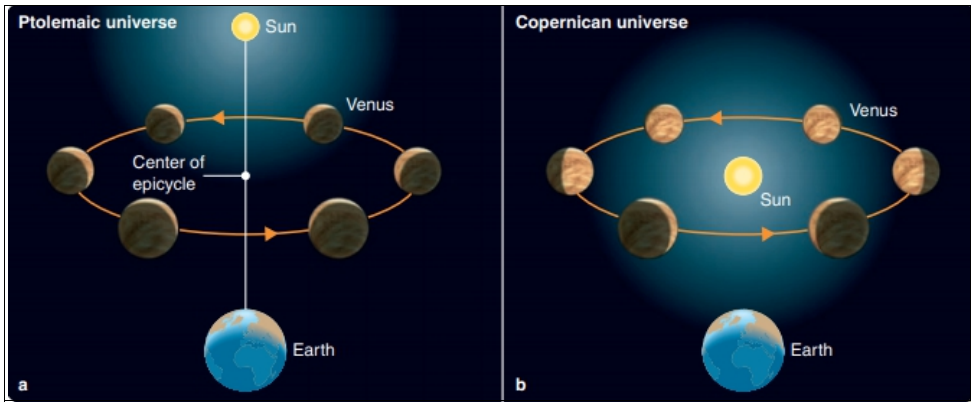

চিত্রঃ টলেমির মডেলানুসারে শুধু শুক্র গ্রহের সামান্য একটি অংশ আলোকিত হবার কথা (বামপাশের চিত্র) কিন্তু গ্যালিলিও শুক্র গ্রহে চাঁদের মতো কলা দেখেছিলেন যা একমাত্র কোপারনিকান মডেল দিয়েই ব্যাখ্যা করা যেত (ডানপাশের চিত্র)

৪.১৬১০ সালের ৭ জানুয়ারি রাতে গ্যালিলিও টেলিস্কোপে চোখ রেখে তাকালেন বৃহস্পতি গ্রহের দিকে। গ্যালিলিও তিনটি ছোট "তারা" দেখতে পেলেন বৃহস্পতি গ্রহের পাশে। এভাবে পরপর কয়েকটি রাত পর্যবেক্ষণ করলেন তিনি। পর্যবেক্ষণ টুকে রাখলেন তার নোটবুকে। ১৩ জানুয়ারির পর্যবেক্ষনে ধরা পড়ল আরও একটি তারা। আসলে গ্যালিলিও দেখেছিলেন বৃহস্পতি গ্রহের উপগ্রহ।

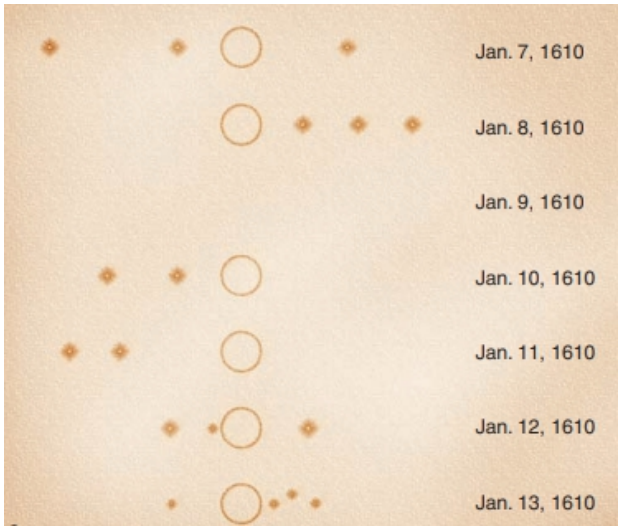

চিত্রঃ গ্যালিলিওর নোটবুকে আঁকা বৃহস্পতির চাঁদের ছবি

বৃহস্পতি গ্রহের উপগ্রহ কোপার্নিকান মডেলের স্বপক্ষে প্রমান এনে দিলো। কোপার্নিকাসের সমালোচকরা বলেছিলেন, যদি পৃথিবী গতিশীল হতো তাহলে চাঁদ পিছনে পড়ে থাকতো। তাই পৃথিবী স্থির। কিন্তু গ্যালিলিওর পর্যবেক্ষনে দেখা গেলো বৃহস্পতি গতিশীল এবং তার চাঁদ নিয়েই সে গতিশীল। তাই চাঁদ সহ পৃথিবীর গতিশীল হওয়াটা অসম্ভব কিছু না। এটাও একদিক থেকে কোপারনিকাসের মডেলের প্রমান ছিলো। গ্যালিলিও এবার নির্ণয় করলেন উপগ্রহগুলোর পর্যায়কাল। তিনি দেখলেন, সবচেয়ে ভিতরের দিকে অবস্থিত চাদরট বাকি চাদগুলের চেয়ে কম সময়ে বৃহস্পতি গ্রহকে পরিভ্রমণ করছে। এবং সবচেয়ে বাইরের দিকের চাদটি যেটি গ্রহ থেকে সবচেয়ে দুরে সেটি বেশি সময় নিয়ে গ্রহটিকে প্রদক্ষিন করে। বৃহস্পতি গ্রহের উপগ্রহরা যেমন ভাবে প্রদক্ষিন করছিলো, বিষয়টি সূর্যের চারদিকে গ্রহের গতিপথের সাতে মিলে যায়। যা কোপার্নিকান সৌরকেন্দ্রিক মডেলের মাঝেও ছিলো।

৫. কৃত্তিকা নক্ষত্রমন্ডলের দিকে খালি চোখে তাকালে ৬ টি /৭ টি তারা দেখা যায়। গ্যালিলিও সেখানে তার টেলিস্কোপ দিয়ে ৩৬ টি তারা দেখেছিলেন।

চিত্রঃ কৃত্তিকা নক্ষত্রমন্ডল

এছাড়া চাঁদের পাহাড়, গর্ত, খালি চোখে দেখতে না পাওয়া অগণিত তারকাসমূহের দর্শন যে আমরা পেতে পারি তার সূচনা করে গিয়েছিলেন গ্যালিলিও। তবে গ্যালিলিও তার এসব কথা প্রচার করে প্রচুর ঝামেলায় পড়েছিলেন। অন্যদিকে কোপার্নিকাসের সাথে মিল রেখে করা বলায় ব্রুনোকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হলো। যাই হোক, সব মিলিয়ে আমরা মোটামুটি পেলাম কেপলার এর সুত্র সমৃদ্ধ এক সৌরকেন্দ্রিক মডেল। দীর্ঘ পথে পরিভ্রমনের সংক্ষিপ্ত এই কাহিনিতে

আমরা পরিচিত হলাম একটি নতুন টার্মের সঙ্গে। Retrograde Motion বা পশ্চাদপসরণ গতি। এবার চলুন জানা যাক কি এটি আর কেন হয়। কেনই বা এটা ব্যাখ্যা করার জন্য এত জটিল মডেল বানাতে হয়েছিলো টলেমিকে।

Retrograde motion : আকাশে তারারা আমাদের থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। খালি চোখে তারাদের নিজস্ব গতি বোঝা যায়না। আমাদের চোখে মনে হয় পৃথিবী ঘুরছে তাই তারারা আমাদের চারপাশে ঘুরছে বলে মনে হয়। কিন্তু খালি চোখে দেখা গ্রহ গুলো আমাদের থেকে বেশি একটা দূরে অবস্থান করছেনা। তাই তারাদের মতো গতির পাশাপাশি গ্রহদের নিজস্ব গতি বেশ কিছুদিন ধরে আকাশ পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায়। গ্রহরা আপাত দৃষ্টিতে পূর্ব থেকে পশ্চিমে গমন করে। কিন্তু কিছুদিনের জন্য গ্রহরা দিক পরিবর্তন করে পূর্বে যাওয়া শুরু করে। আবার কিছুদিন পর পূর্বদিক হতে দিক পরিবর্তন করে পুনরায় পশ্চিমে যাওয়া শুরু করে। এই গতিকে বলা হয় Retrograde motion।

নিচের চিত্রটি খেয়াল করুন।

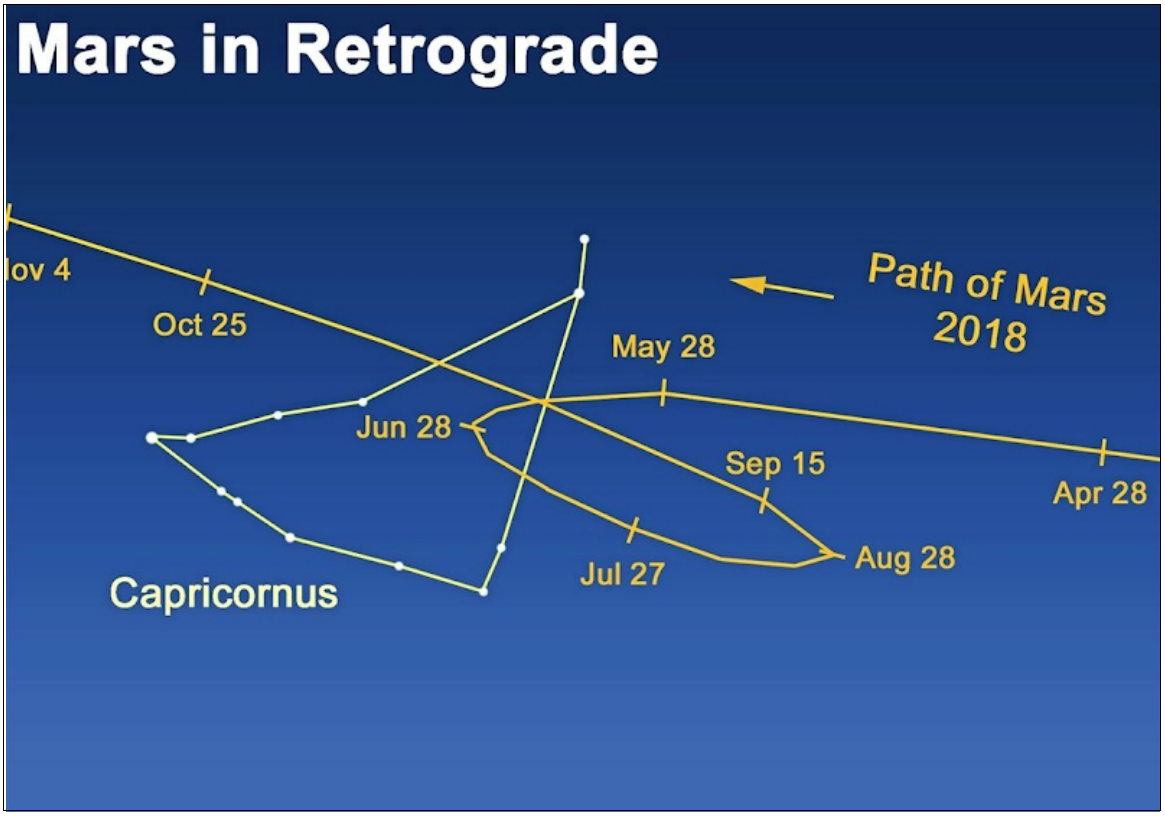

চিত্রটিতে ২০১৮ সালে মঙ্গল গ্রহের গতিপথের একাংশ দেখানো হয়েছে। চিত্রটি এপ্রিল মাসের ২৮ তারিখ থেকে শুরু হয়েছে। এ সময় মঙ্গল গ্রহ গতিপথ তীর চিহ্ন এর মাধ্যমে সহজেই বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু যেতে যেতে ২৮ শে জুনে মঙ্গল গ্রহের দিক পরিবর্তন হয়ে সে আবার উল্টোদিকে যাওয়া শুরু করেছে। আবার আগস্টের ২৮ তারিখ মঙ্গল তার আগের দিকানুযায়ী চলা শুরু করলো। এই যে পিছনে যাওয়া এটিই Retrograte motion. মঙ্গলের এই গতিপথে আকাশে দেখুন একটি লুপের মতো আকৃতির সৃষ্টি হয়েছে। একে বলা হয় Opposition loop।

চিত্রঃ Opposition loop.

আপনি ধরুন একটি গাড়িতে করে রাস্তায় ভ্রমন করছেন। আপনার গাড়িটির একটু সামনে দিয়ে আপনার চেয়ে কম গতির একটি গাড়ি যাচ্ছে। যেহেতু সামনেরটির গতি কম। তাই আপনি একসময় সেই গাড়িটিকে অতিক্রম করে যাবে। অতিক্রম করার আগে আপনি দেখবেন আপনার সামনের "ধীর গতির" গাড়িটি আপনি যেদিকে যাচ্ছেন সেদিকেই যাচ্ছে (দিক একই) এবার গাড়িটিকে অতিক্রম করার সময় আপনার কাছে মনে হবে গাড়িটি আপনার তুলনায় পিছনে চলে যাচ্ছে (যদিও আপনারা একই ডিরেকশনে যাচ্ছেন) গাড়িটিকে অতিক্রম করার পর আপনি যদি পিছনে তাকিয়ে গাড়িটিকে দেখেন তাহলে দেখবেন গাড়িটি আবারও আপনার সাথেই চলছে (যদিও গাড়িটি পিছনে পড়ে গেছে) এই সহজ ব্যাপারটি retrogration motion এর জন্যও প্রযোজ্য। পৃথিবী যখন পৃথিবীর চেয়ে কম গতিসম্পন্ন গ্রহের পাশ দিয়ে গমন করে (পৃথিবীর চেয়ে কম গতিসম্পন্ন বলতে মঙ্গল থেকে নেপচুন। এদের Superior planet ও বলা হয়) তখনও একই ঘটনা ঘটে। পৃথিবীর পর্যবেক্ষক ধরুন আপনি। তাহলে আপনি দেখতে পাবেন "ধীর গতির গ্রহ" টি প্রথমে পৃথিবীর সাথে একই ডিরেকশনেই যাচ্ছে (অর্থাৎ পূর্ব থেকে পশ্চিমে) কিন্তু আপনার "দ্রুত গতির পৃথিবী" যখন "ধীর গতির গ্রহকে" অতিক্রম করতে যাচ্ছে তখনই পৃথিবীতে থেকে আপনার মনে হচ্ছে গ্রহটি যেন পৃথিবী থেকে পিছনে পড়ে যাচ্ছে। অন্যভাবে বলতে গেলে ডিরেকশন চেঞ্জ হচ্ছে আপনার সাপেক্ষে। ঠিক এই সময় গ্রহটি পিছনে পড়ে যাবে। তাই আপনার কাছে মনে হবে গ্রহটির গতির দিক বিপরীতে বা পশ্চাতমুখী হয়ে গেছে। আবার একবার অতিক্রম করার পর আপনি গ্রহটির দিকে তাকালে সেই "ধীর গতির গাড়ি" টির মতো মনে হবে গাড়িটি আপনার ডিরেকশনেই যাচ্ছে। অর্থাৎ আবারও গ্রহটি আগের মতো চলছে। নিচের চিত্রগুলো হতে আশা করি সহজে বোঝা যাবে।

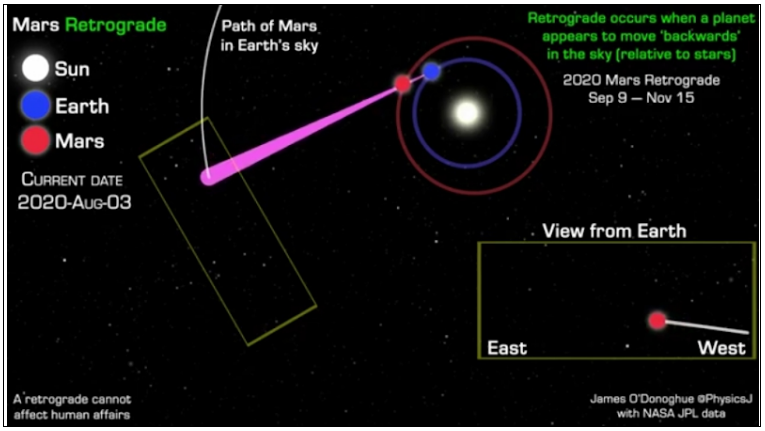

চিত্রঃ পৃথিবী এবং মঙ্গল ঘড়ির কাটার বিপরীতে ঘুরতে ঘুরতে পাশাপাশি একটি অবস্থানে আসলো

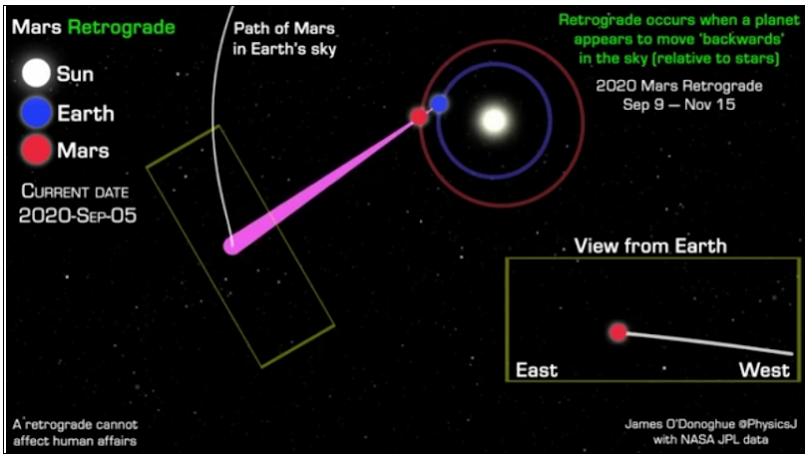

চিত্রঃ পৃথিবী থেকে মঙ্গল গ্রহকে কোন পথে গতিশীল দেখা যাবে তা নিচে ডানদিকে দেখানো হয়েছে। আর মাঝ বরাবর অংশটিতে পৃথিবী ও মঙ্গলের সংযোগ সরলরেখা আকাশে কেমন আকার ধারন করছে সেটি দেখানো হয়েছে।

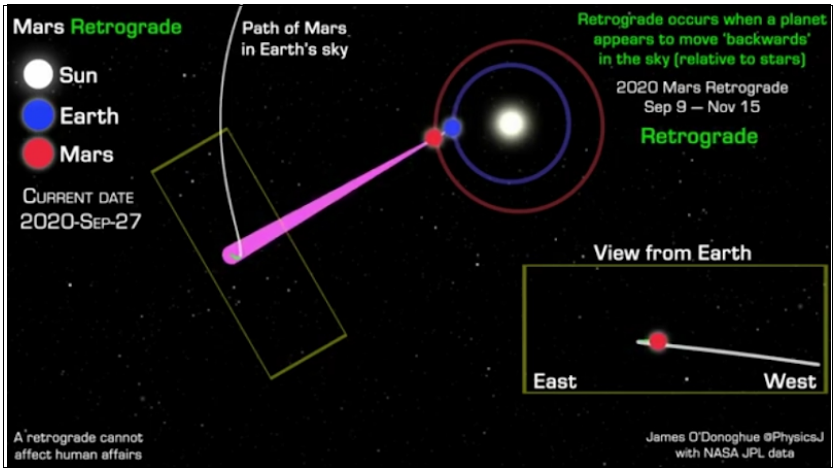

চিত্রঃ পৃথিবী মঙ্গলকে অতিক্রম করার পূর্ব মুহূর্ত

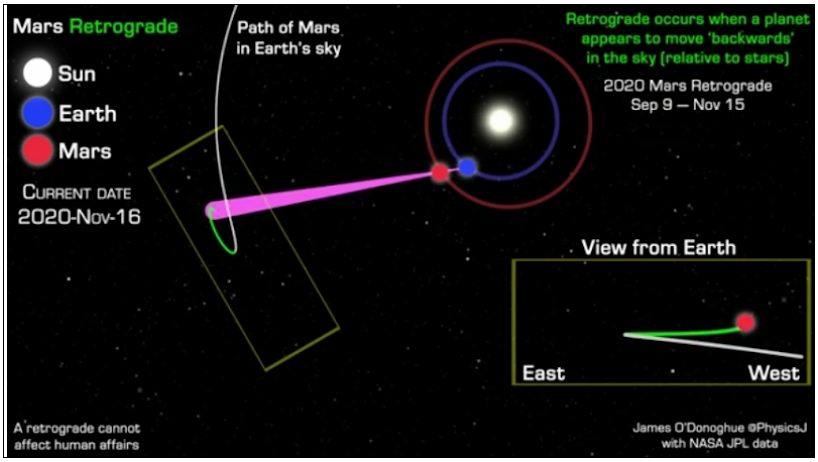

চিত্রঃ পৃথিবী মঙ্গলকে অতিক্রম করে গেল। নিচে ডানদিকের চিত্রে পৃথিবীবাসী দেখলো মঙ্গল বিপরীত দিকে যাচ্ছে।

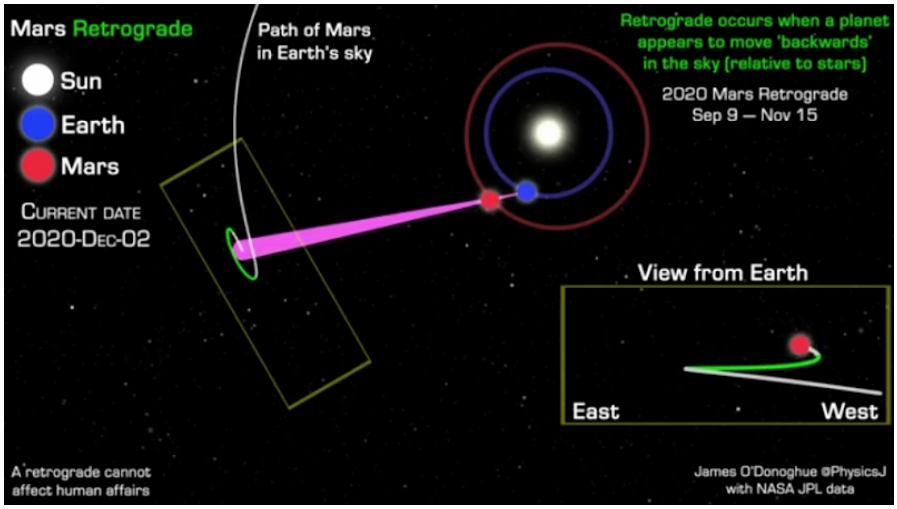

চিত্রঃ পৃথিবী সামনে এগিয়ে গেছে। পৃথিবীবাসীর কাছে মনে হচ্ছে, মঙ্গল আবার পৃথিবীর সাথে একই দিকে যাচ্ছে। তাই মঙ্গল আবার তার পথ পরিবর্তন করল বলে মনে হচ্ছে পৃথিবীবাসীর কাছে।

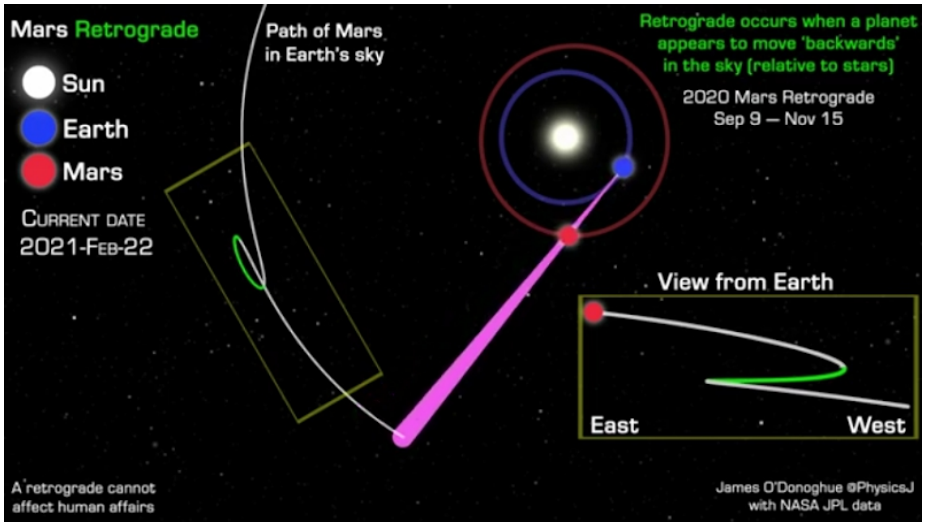

চিত্রঃ তৈরি হলো Opposition loop

একটি প্রশ্ন মনে আসা স্বাভাবিক যে বিপরীতমুখী চলনের কারণ তে ঠিক আছে, কিন্তু আকাশে অমন লুপ তৈরি হওয়ার কারণ কী? আমি গাড়িতে চললে পাশের "ধীর গতির" গাড়িটি তো আমার চোখে লুপ তৈরি করেনা। আসলে এখানে সামান্য একটু পার্থক্য আছে। আপনি যখন রাস্তায় চলছেন তখন আপনার "দ্রুত গতির" গাড়ি এবং রাস্তার "ধীর গতির" গাড়িটি একই সমতলে চলছিলো। কিন্তু গ্রহের গতিপথের একটু পার্থক্য আছে। পৃথিবী সূর্যকে যে সমতলে প্রদক্ষিণ করে মঙ্গল সেই একই সমতলে সূর্য কে প্রদক্ষিন করে না। এই কথাটি বাকি গ্রহগুলোর জন্যেও প্রযোজ্য। মঙ্গলের কক্ষতল পৃথিবীর কক্ষতলের সাথে একটি কোণ করে আনত থাকে। নিচের সারণিতে দেখানো হয়েছে কোনো গ্রহের কক্ষতল পৃথিবীর কক্ষতলের সাথে কত ডিগ্রি কোণ করে আনত।

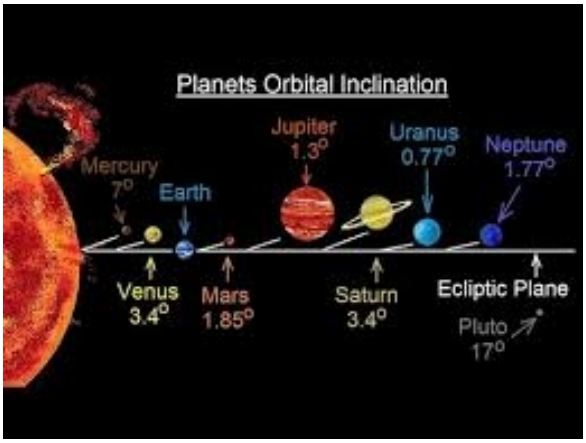

চিত্রঃ আনত কোণের মান

এই আনত থাকার ফলেই আকাশে তৈরি হয় লুপের সমাহার। যদি আনত না থাকত তাহলে লুপ হতো না কিন্তু Retrograde motion হতো। মঙ্গল আমাদের গ্রহ থেকে বেশি দূরে না কিন্তু বৃহস্পতি কিংবা শনি গ্রহ বেশ দূরে হওয়ায় তাদের কক্ষতল আনত থাকা সত্ত্বেও দূরে থাকার কারণে প্রায় সমতল বলেই ধরা যায়। তাই বৃহস্পতি বা শনি গ্রহ আকাশে দৃষ্টিনন্দন লুপ গঠন করে না। এরা সরলপথেই "ধীর গতির" গাড়িটির মতো চলছে বলে মনে হবে আমাদের কাছে।

অন্যদিকে বুধ এবং শুক্র গ্রহকে Inferior planet বলা হয়। বুধ গৃহের কক্ষতল সবচেয়ে খাড়া। কিন্তু বুধ, শুক্রের বেগ পৃথিবীর চেয়ে বেশি। তাই বুধ, শুক্রের তুলনায় আমরা "ধীর গতির গাড়ি" একারণে আমরা বুধ, শুক্রের Retrogration অন্য গ্রহগুলোর মতো দেখতে পাবোনা। তবে বুধ, শুক্র গ্রহদুটি সূর্যের চারপাশে দারুণ লুপ তৈরি করে, যার ফলশ্রুতিতে সন্ধ্যা এবং সকালে সূর্যের কাছে ছাড়া এদের দেখা যায় না। তবে এই লুপ সৃষ্টি হওয়া দিনের আলোয় ঢাকা থাকে। তাই দেখার সৌভাগ্য হবে না আমাদের।

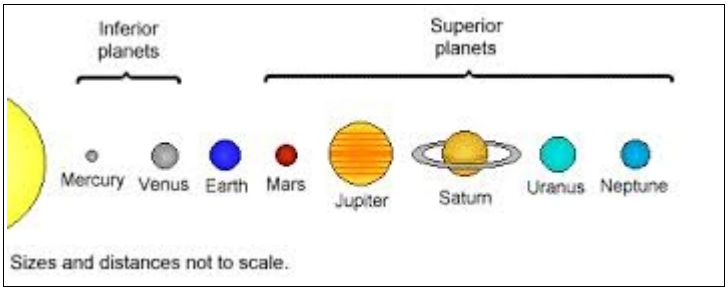

চিত্রঃ Superior and Inferior planets

লুপের আকার বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। এটা নির্ভর করে কক্ষপথে পৃথিবী এবং ঐ গ্রহটির অবস্থানের উপর। এই হলো সেই Retrogration যা ভাবিয়ে তুলেছিলো টলেমি, কোপার্নিকাসকে।

এবার আমরা দেখব আরেকটি নতুন বিষয়। নাম তার Elongation।

Elongation: মনে করি, M দ্বারা চাঁদকে E দ্বারা পৃথিবীকে এবং S দ্বারা সূর্যকে বোঝানো হয়েছে। যেহেতু পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্বের তুলনায় পৃথিবী এবং চাঁদ উভয় থেকে সূর্যের দূরত্ব অনেক বেশি তাই ES এবং MS প্রায় সমান্তরাল ধরা যায়।

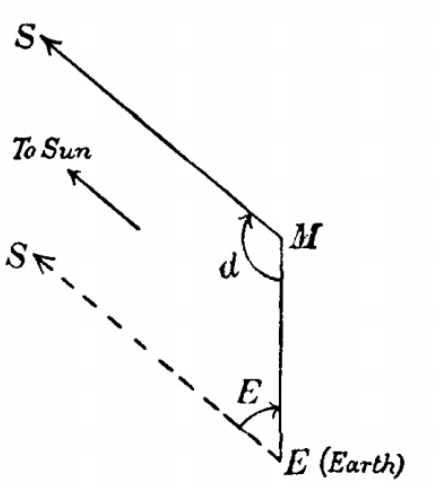

ধরি, ∡SEM কোণটি E দ্বারা প্রকাশিত। এই কোণ E কে সূর্য থেকে পৃথিবীর সাপেক্ষে চাঁদের Elongation কোণ বলা হয়। নতুন চাঁদের জন্য E এর মান প্রায় 0° কারণ নতুন চাঁদের সময় চাঁদ সূর্য এবং পৃথিবীর সংযোগ সরলরেখা বরাবর অবস্থান করে। আবার E এর মান যখন 180° তখন পূর্ণিমা হবে। E এর মান 90° হলে চাঁদের অর্ধাংশ আলোকিত হবে। অর্থাৎ ১/২ অংশ আলোকিত হবে। পৃথিবীর সাপেক্ষে চাঁদের যেমন Elongation angle পাওয়া গেল তেমনি পৃথিবীর সাপেক্ষে গ্রহগুলোরও Elongation কোণ পাওয়া যাবে। তাই গ্রহগুলোও চাঁদের মতো কলা বা দশা প্রদর্শন করবে (যেটা গ্যালিলিও তার টেলিস্কোপে দেখেছিলেন)

এবার নিচের চিত্রটির দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক। E দ্বারা পৃথিবীকে, V দ্বারা শুক্রকে এবং J দ্বারা বৃহস্পতি গ্রহকে বোঝানো হয়েছে। এখানে V হলো inferior planet এবং J হলো Superior planet। হিসাবের নিমিত্তে ধরে নেয়া হচ্ছে গ্রহের গতিপথ বৃত্তাকার এবং কক্ষতল একই সমতলে আছে। এবার নিচের বিষয়গুলো চিত্র থেকে মিলিয়ে নিন:

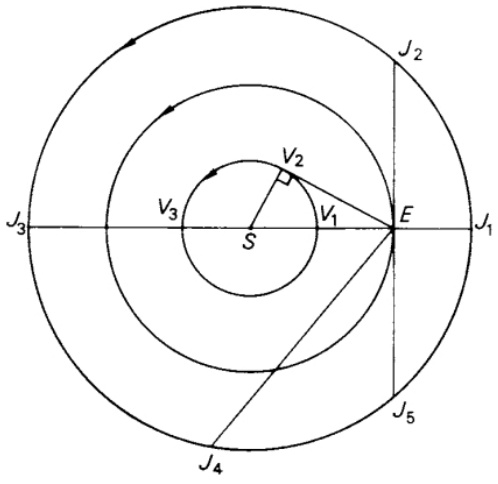

১. Superior planet (এখানে বৃহস্পতি) যখন J_1 অবস্থানে আসে তখন SEJ_1 সরলরেখা তৈরি হয়। এমতাবস্থায় J গ্রহটি Opposition এ আছে বলা হয়। Opposition এ থাকাকালীন J গ্রহটি সূর্যের সম্পূর্ণ বিপরীতে থাকে। তাই একদম ঠিক মধ্যরাত যখন হবে তখন J গ্রহটি রাতের বেলায় দেখা যাবে মাথার উপর। চিত্র হতে আরেকটি ব্যাপার লক্ষ্যণীয়। একটি Inferior Planet (চিত্রে V) কখনই Opposition অবস্থানে আসতে পারে না। তাই Inferior planet কে কখনই গভীর রাতের বেলায় মাঝ আকাশ বরাবর দেখাও সম্ভব নয়। তাই শুক্র এবং বুধ গ্রহ কখনই রাতের আকাশে নয় বরং সন্ধ্যাবেলা এবং সকালবেলা সূর্যের কাছাকাছি দেখা যায়।

২. যখন inferior planet V1 এবং V3 অবস্থানে থাকে তখন EV_1S এবং EV_3S সরলরেখা গঠিত হয়। এমতাবস্থায় V গ্রহটি Conjunction এ আছে বলা হয়। inferior planet এর conjunction বলে একে Inferior conjunction ও বলা হয়। তেমনি J গ্রহটি J_3 অবস্থানে থাকাকালীন Superior conjunction এ আছে বলা হয়।

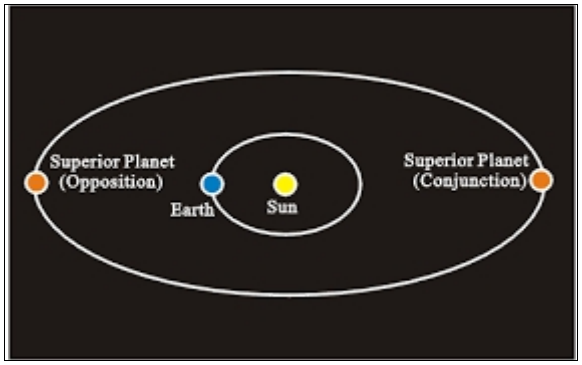

৩. পূর্বালোচিত Elongation angle এর সংজ্ঞানুযায়ী V গ্রহটি V_2 অবস্থানে থাকাকালীন elongation angle। হবে $\angle SEV_2$। আবার J_4 এ থাকাকালীন J গ্রহটির Elongation angle হবে $\angle SEJ_4$.

৪. Inferior planet এর Elongation সর্বনিম্ন 0 যখন Inferior planet টি conjunction এ থাকে।

আবার Inferior planet এর Elongation সর্বোচ্চ হবে যখন V গ্রহটি V_2 অবস্থানে থাকে। কারণ এসময় $\angle SV_2E$ এর মান 90° তাই EV_2 বৃত্তের উপর একটি স্পর্শক। সেই কারণে inferior planet টির Maximum elongation। এর মান $\angle SEV_2$। খেয়াল করলে দেখবেন inferior planet এর elongation কোণের মান আসলে পৃথিবী থেকে গ্রহ এবং সূর্যের কৌণিক দূরত্ব নির্দেশ করে। যেহেতু কৌণিক দূরত্বের মান সর্বোচ্চ SEV_2 হতে পারে তাই গ্রহটি সবসময় সূর্যের সাথেই কৌণিক দূরত্ব রেখে উদয় এবং অস্ত যাবে। শুক্র গ্রহের Maximum elongation গড়ে ৪৬ ডিগ্রি। এর অর্থ শুক্র গ্রহ সবসময় সূর্যের 0 থেকে 46 ডিগ্রির মাঝেই থাকবে। বছরের কিছু সময় সূর্য ওঠার আগে উঠবে (কিন্তু সূর্যকে ০-৪৬ °এর ভিতরে নিয়েই) । এসময় শুকতারা রূপে আকাশে শোভা পাবে শুক্র গ্রহ।

চিত্রঃ শুকতারা রূপে শুক্র গ্রহ

আবার বছরের কিছু সময় সূর্য আগে ডুবে যাবে এবং শুক্রগ্রহ তখন সন্ধ্যাতারা রূপে দেখা যাবে। আবার maximum elongation অর্থ বছরের অন্য যে-কোনো দিনের তুলনায় সূর্যের সাথে কৌণিক দূরত্ব বেশি থাকবে। মানে সূর্য ওঠার আগে বছরের অন্যদিনের চেয়ে বেশি সময় আকাশে থাকবে গ্রহটি (যেমন: শুকতারা)। সন্ধ্যাতারা হিসেবেও একই কথা প্রযোজ্য। এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝে গেছেন যে inferior planet এর দুইটি Maximum elongation হতে পারে। একটি Eastern elongation (সকাল বেলার তারা হিসেবে) অপরটি Western elongation (সন্ধ্যা বেলার তারা হিসেবে) নামে ডাকা হয়।

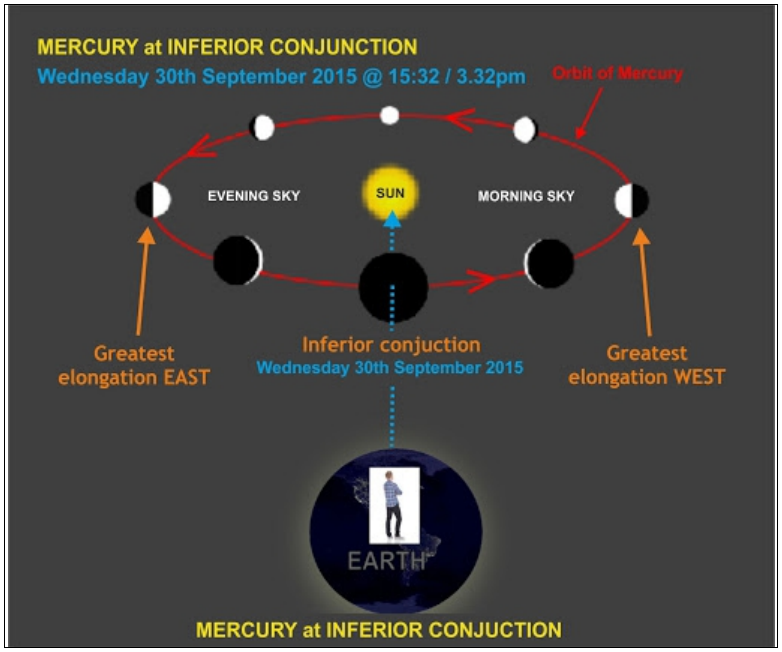

চিত্রঃ Conjunction of an inferior planet, greatest elongation as morning and evening star (Mercury)

৫. কিন্তু superior planet গুলোর জন্য সর্বনিম্ন elongation কোণ 0° এবং সর্বোচ্চ 180° পর্যন্ত হতে পারে। তাই গ্রহগুলো সূর্যের সাথে 0 থেকে ১৮০° কৌণিক পার্থক্য বজায় রাখতে সক্ষম। এ কারণে সূর্য ডুবে গেলেও এরা সারারাত আকাশে শোভা পেতে যেমন পারে তেমনি দিনের বেলায় সূর্যের পাশাপাশিও থাকতে পারে বছরের কিছু সময়। Superior planet এর J_2 এবং J_5 অবস্থানকে quadrature অবস্থান ও বলা হয়।

সাইকেল

জ্যোতির্বিদ্যায় কোনো ঘটনার পুনরাবৃত্তি কিন্তু বিরল নয়। এই ধরুন আজ সূর্য গ্রহণ হলো, তাহলে এক সারোস চক্র পর আবার সূর্যগ্রহণ হবে। ধরুন আজ পূর্ণিমা। তাহলে এক সাইনোডিক মাস পরে আবার পূর্ণিমা হবে। এই যে পুনরাবৃত্তি এই পুনরাবৃত্তিগুলো বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করতে কিংবা আলাদাভাবে নিখুঁত পুনরাবৃত্তির জন্য কতগুলো চক্রের কথা বলবো এখন।

Metonic Cycle: এক পূর্ণ চাঁদ থেকে আরেক পূর্ণ চাঁদ পর্যন্ত যতটুকু সময় গড়ে অতিবাহিত হয় সে সময় টুক 29.5305888606 দিন বা 29 দিন 12 ঘন্টা 44 মিনিট 2.88 সেকেন্ড। তাহলে ১২ মাস অতিবাহিত হয়ে গেলে অতিক্রান্ত দিনের সংখ্যা হবে 29.5305888606×12=354.37 দিন প্রায়। কিন্তু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এই দিনের সংখ্যা সৌরবর্ষের দিনের সংখ্যার থেকে কম। কারণ আমরা জানি ১ বছর = ৩৬৫ দিন ৫ ঘন্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড =প্রায় ৩৬৫.২৪ দিন। তাহলে যেটা দাড়ালো, চাঁদের হিসেবে বছর হিসাব করলে তা ৩৬৫.২৪-৩৫৪.৩৭ =প্রায় ১০.৯ দিন কম হয়। তাহলে আমরা যদি চাঁদ দিয়ে বছর হিসাব করতে যাই, তাহলে ১২ মাস পর আমরা প্রায় ১১ দিন পিছিয়ে থাকবো। এবার আরেকটু অগ্রসর হওয়া যাক। ধরুন, চাঁদের ২৫ মাস হলো এবং সৌর বর্ষের ২ বছর হলো। তাহলে চাঁদের ২৫ মাস =29.5305888606 × 25=738.26 দিন এবং ২ সৌরবর্ষ = 365.24 × 2=730.48 দিন। দেখুন, পার্থক্য হলো 738.26-730.48=7.8 দিন। মনে করে দেখুন, আগের বার পার্থক্য ছিল 10.9 দিন। কিন্তু এবার কমে এসেছে।

আমরা যদি এবার চাঁদের ৩৭ মাস এবং ৩ সৌরবর্ষ নিয়ে হিসাব করি, তাহলে পার্থক্য পাব মাত্র ৩.১ দিন। যেমনঃ ১৯৯৯ সালের ২৩ নভেম্বর আকাশে পূর্ণ চাঁদ ছিল। আবার ২০০২ সালের ২০ নভেম্বর আকাশে পূর্ণ চাঁদ ছিল। দেখুন ১৯৯৯ থেকে ২০০২ পর্যন্ত ৩ সৌরবর্ষ। কিন্তু পূর্ণ চাঁদ হওয়ার সময়ের পার্থক্য ৩ দিনের মতো। একটা ২৩ নভেম্বর, আরেকটা ২০ নভেম্বর। কিন্তু আমরা বের করতে চাই এমন একটি শর্ত, যেখানে ১৯৯৯ সালের ২৩ নভেম্বর পূর্ণ চাঁদ থাকলে আবার কত সালে ২৩ নভেম্বর আকাশে পূর্ণ চাঁদ থাকবে! ব্যাপারটা একটু সহজ করে বলি।

ধরুন আপনার জন্ম এপ্রিল মাসের ২৫ তারিখ। ঐদিন আকাশে পূর্ণিমা। তাহলে আর কত বছর পরে এপ্রিল মাসের ২৫ তারিখ আবার পূর্ণিমা হবে? এটাই বের করব আমরা।

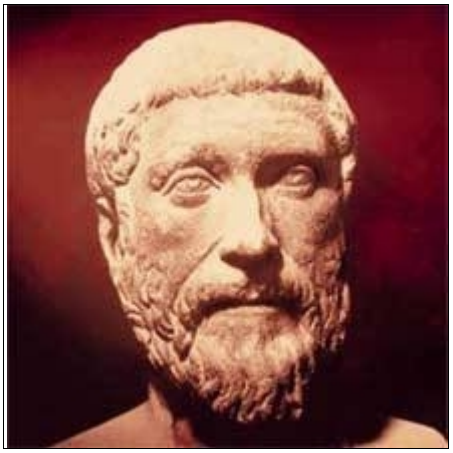

চিত্রঃ Meton of Athens

৪৩০ খ্রিষ্টপূর্বে জ্যোতির্বিদ Meton দেখান যে ১৯ সৌরবর্ষ =২৩৫ চান্দ্রমাস প্রায়। এর অর্থ কী? অর্থ হলো আপনি যেদিন জন্ম নিয়েছিলেন তার ঠিক ১৯ বছর পরে একই তারিখে আকাশে পূর্ণিমা থাকবে। (যেহেতু জন্মের দিনেও আকাশে পূর্ণিমা ছিল) আপনার জন্মদিনে আকাশে যদি চাঁদের বয়স ৩ দিন থাকে তাহলে ঠিক ১৯ বছর পরে ঐদিনেও আকাশে চাঁদের বয়স ৩ দিন থাকবে। তবে ত্রুটি আছে সামান্য। প্রায় ১.৪৮ ঘণ্টার ত্রুটি। এ ত্রুটি উপেক্ষা করলে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের হিসাব নিকাশে আহামরি সমস্যা হওয়ার কথা নয়। আমরা আমাদের ধারণাটা আরেকটু প্রসারিত করি।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর আমাদের বিজয় দিবস। আমরা এখন জানতে চাই বিজয় দিবসের দিন রাতে আকাশের চাঁদ কেমন অবস্থায় ছিল। যেহেতু ১৯ বছর পরপর ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয় সেহেতু ১৯৭১+১৯=১৯৯০ সালের ডিসেম্বরের ১৬ তারিখেও একই রকম চাঁদ দেখা যাবে। আবার ১৯৯০+১৯=২০০৯ সালের ১৬ ডিসেম্বরেও চাঁদের একই কলা থাকবে বা ঐ কলার আশেপাশে থাকবে (যদি ত্রুটি বিবেচনা করি) এবার ২০০৯ সালের ১৬ ডিসেম্বরের পঞ্জিকা দেখুন। বের হয়ে যাবে!

ঠিক একই রকম একটি ব্যাপার আছে। তার নাম Octaeteris। এটিও Metonic cycle এর অনুরূপ। এর ব্যবহার গ্রিকরা করত। এটি অনুসারে, আজকের চাঁদ যেমন আছে ৮ বছর পর চাঁদের অবস্থা এমনই থাকবে। তবে একদিন অথবা ২ দিন পর। এ নিয়মানুসারে ২০০৯ সালের ১৬ ডিসেম্বর চাঁদের যে দশা থাকবে ২০১৭ সালের ১৬ ডিসেম্বর নয় বরং ১৭/১৮ ডিসেম্বর চাঁদ একই দশায় থাকবে। Octaeteris এর এই ব্যাপারটি নোট করেছিলেন গ্রিক জ্যোতির্বিদ Cleostratus। আপনারা যদি Transit এ করা আমাদের হিসাবটি মনে রাখেন, তাহলে মনে করে দেখুন শুক্র গ্রহের জন্য আমরা ৮ বছর এর একটি পর্যায়কাল বের করেছিলাম। আবার Octaeteris এ-ও ৮ বছরের একটি পর্যায়কাল! তাহলে ব্যাপারটিকে সহজে এভাবে বলা যায়।

ধরুন, আজ সন্ধ্যায় আপনি বাইরে বেরিয়ে দেখলেন শুক্র গ্রহ এবং চাঁদ প্রায় পাশাপাশি অবস্থান করছে। তাহলে ঠিক ৮ বছর পর আজকের এই দিনের ১/২ দিন আগে পরে আপনি ভেনাসের পাশে চাঁদকে দেখতে পাবেন! যাই হোক metonic cycle নিয়ে বলছিলাম। Metonic cycle এর জন্য ১৯ বছরের পর্যায়কালের ১ঘন্টার মতো ত্রুটি আছে।তাই আজ পূর্ণিমা হলে ১৯ বছর পর এই দিনে পূর্ণিমা হবে ঠিকই কিন্তু আজ যদি সন্ধা ৭টার সময় হয়। পরের তারিখে হয়তো এক/দেড় ঘণ্টার পার্থক্যে পূর্ণিমা হবে। এই ত্রুটি থেকে উত্তরনের জন্য আরও বড়ো পর্যায়কালের চক্র আছে। তবে সেগুলো অনেক বড়ো সময়ের ব্যবধান। আমাদের জীবদ্দশায় ওগুলো পরীক্ষা করা সম্ভব নয়। তবু Metonic cycle-ই বা কম কীসে!

Callippic Cycle: এই চক্রটিও Metonic চক্রেরই অনুরূপ কিন্তু Callippic cycle-টি Metonic cycle কে 4 দিয়ে গুন করে তৈরি করা। Metonic cycle এর সময়সীমা ১৯ বছর। কিন্তু Callipic cycle এর সময়সীমা 19×4=76 বছর। এবার ৭৬ বছর পর থেকে ১ দিন বিয়োগ করা হলেই আসল Callippic cycle পাওয়া যায়। তবে এই চক্রেরও ত্রুটি আছে। এই চক্রটি 553 বছরে ১ দিন ত্রুটি দেয়।

Hipparchic Cycle: জ্যোতির্বিদ হিপারকাস পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে Callippic cycle ত্রুটি খুঁজে পান। তিনি Callippic cycle-কে 4 দ্বারা গুণ করে তার থেকে ১ বিয়োগ করেন। ফলে 76 × 4=304 বছরের একটি চক্র পাওয়া যায়। এটি অনেকটাই সঠিক। তবে ত্রুটি মুক্ত নয়।

সুতরাং এভাবে বলা যায় বিষয়গুলো:

1 Metonic cycle =19 years

1 Callippic cycle =4 Metonic cycle -1 day

1 Hipparchic cycle =4 Callippic cycle -1 day

Exeligmos cycle : Saros চক্রের কথা নিশ্চয় মনে আছে আপনার। Saros চক্র অনুসারে ৬৫৮৫.৩ দিন পর গ্রহণ হয়। কিন্তু মনে করে দেখুন সারোস চক্র শুধু গ্রহন হবে এই কথা বলে কিন্তু ৬৫৮৫.৩ দিন পরের গ্রহনটি যে একই জায়গায় হবে এমনটি কিন্তু বলেনা। ব্যাবিলোনিয়ান জ্যোতির্বিদদের উদ্ভাবিত এই সারোস চক্র তবুও কিন্তু গ্রহনের নিশ্চিত ভবিষ্যদবাণী করেছিলো। সারোস চক্রের মতো গ্রহন নিয়ে আরেকটি চক্র আছে। সারস চক্রকে ৩ দিয়ে গুন করলে Exeligmos cycle পাওয়া যায় (প্রায় ৫৪ বছর ৩৩ দিন) । এই চক্রের বিশেষত্ব হলো আজ আপনার স্থানে ধরুন গ্রহন হলো। তাহলে ৫৪ বছর ৩৩ দিন পরে যে গ্রহনটি হবে সেটাও আপনার স্থানে না হলেও সামান্য আশপাশে হবে। যেমন: ১৬১২ সালের সূর্য গ্রহন 65.7 ° দক্ষিণ অক্ষাংশে এবং 98.4 ° পশ্চিম দ্রাঘিমাংশে সবচেয়ে ভালো দেখা গেলেও ১৬৬৬ সালের গ্রহনটি 71.6° দক্ষিণ এবং 98.3 ° পশ্চিমে সবচেয়ে ভালো দেখা গিয়েছিলো। তাই একটু পার্থক্য থাকবে। গড়ে হিসেবে ৫৪ বছর ৩৩ দিন পরের গ্রহনটি ৫ থেকে ১৫ ডিগ্রি অক্ষাংশের ব্যবধানে হতে দেখা যায়।

যাই হোক, পরিশেষে 1 Exeligmos cycle=3 Saros cycle.

Saros cycle এর মতোই আরো একটি cycle বা চক্র আছে। সেটার নাম Inex cycle। Dr. G. van den Bergh এই চক্রটির প্রবক্তা।

Dr. G. van den Bergh

এই চক্র অনুসারে গ্রহন হওয়ার ২৯ বছর পর আবার গ্রহন হবে কিন্তু তারিখটি হবে আগের তারিখের চেয়ে প্রায় ২০ দিন কম। চলুন কিছু উদাহরণ দেখা যাক:

১৮৪৫ সালের ৬ মে তারিখে গ্রহণ হয়েছিলো। ২৯ বছর পর মানে ১৮৭৪ সালে আবার গ্রহন হলো কিন্তু তারিখ ছিলো ১৬ এপ্রিল। অর্থাৎ আগের তারিখের চেয়ে প্রায় ২০ দিন কম। পরবর্তী গ্রহন ১৯০৩ সালের ২৯ মার্চ। (২০ দিন না হলেও প্রায় কাছাকাছি), এরপর ১৯৩২ সালের ৭ মার্চ, ১৯৬১ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯০ সালের ২৬ জানুয়ারি..... এসব গ্রহন হতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে Inex চক্রটি বেশ উপযোগী। Van den Bergh দেখান যে পরপর দুটি গ্রহনের মাঝে সময়ের ব্যবধানকে নিচের সুত্র দিয়ে প্রকাশ করা যাবে।

$$t = mS + nI \tag{1}$$

এখানে S দ্বারা Saros এবং I দ্বারা Inex বোঝায়। $m,\ n$ দ্বারা পূর্ণসংখ্যা বোঝানো হয়। m,n এর মানের উপর ভিত্তি করে Bergh বিভিন্ন ধরনের পর্যায়কাল বেশ দারনভাবে বের করেন। তখন বোঝা যায় Inex আসলে Saros এর মতোই মোটামুটি গ্রহনের ভবিষ্যদবাণী করতে পারে। কিন্তু উপরের 1 নং Inex এবং Saros এর সমন্বয় হওয়ায় 1 নং হতে কিছু নতুন চক্র (cycle) বেরিয়ে আসে যেগুলো গ্রহনের ব্যাখ্যায় মোটামুটি উপযোগী।

Semester: m=5 এবং n=-8 হলে পাওয়া যায় $t = 5I - 8S$

বা প্রায় ১৭৭ দিন। এটি কতটা উপযোগী তা জানতে নিচের সূর্যগ্রহনের তারিখগুলো দেখুন।

১৯৯০ সালের ২৬ জানুয়ারি

১৯৯০ সালের ২২ জুলাই

১৯৯১ সালের ১৫ জানুয়ারি

১৯৯১ সালের ১১ জুলাই ⋯

⋮

দেখুন এদের মাঝে ব্যবধান প্রায় ১৭৭ দিন। সুতরাং এ চক্রটি বেশ কাজের।

Hepton: এ চক্রের জন্য m=5 এবং n=-3. তাহলে t=5I-3S বা প্রায় ১২১১ দিন বা প্রায় ৪১ চান্দ্রমাস। কয়েকটি সূর্যগ্রহনের তারিখ :

১৯৭১ সালের ২০ আগস্ট

১৯৭৪ সালের ১৩ ডিসেম্বর

১৯৭৮ সালের ৭ এপ্রিল

১৯৮১ সালের ৩১ জুলাই

১৯৮৪ সালের ২২ নভেম্বর

⋮

এদের মাঝে ব্যবধান গড়ে ১২১১ দিন। তাহলে Hepton ও দারুনভাবে ভবিষ্যদবাণী করতে সক্ষম।

Tritos: m=1 এবং n=-1 হলে Tritos cycle টি পাওয়া যায়। তখন 1 Tritos =135 lunations (চান্দ্রমাস) =প্রায় ৩৯৮৭ দিন। প্রমান হিসেবে নিচের কয়েকটি সূর্যগ্রহনের তারিখ দেখুন :

২০৬২ সালের ৩ সেপ্টেম্বর

২০৭৩ সালের ৩ আগস্ট

২০৮৪ সালের ৩ জুলাই

২০৯৫ সালের ২ জুন

⋮

এছাড়াও ২০৭৭ সালের ১৫ নভেম্বর

২০৮৮ সালের ১৪ ই অক্টোবর

২০৯৯ সালের ১৪ ই সেপ্টেম্বর

⋮

Metonic cycle এর কথা মনে আছে তো?? Metonic cycle কে 1 নং সমীকরনের মাধ্যমে এভাবে লেখা যায়:

1 Metonic cycle $= 10I - 15S$. কিন্তু দূর্ভাগ্যবশত metonic cycle কিন্তু গ্রহণের ভবিষ্যদবাণী খুব একটা ভালোভাবে করতে পারে না। এটা শুধুমাত্র চাঁদের কলা ব্যাখ্যা করতে পারে (Metonic cycle দ্রষ্টব্য) যেমন: ১৯৪২ সালের ১২ আগস্ট গ্রহণ হয়েছিল। Metonic cycle এর নিয়ম মেনে ১৯৬১ সালের ১১ আগস্টও গ্রহণ হয়েছিল। কিন্তু ২০১৮ সালের ১১ আগস্ট গ্রহণ হলেও ২০৩৭ সালের ১১ আগস্ট কোন গ্রহণ হবে না। আবার ১৯৯১ সালের ১১ জুলাই পূর্ণ সূর্যগ্রহণের পর আকাশে নতুন চাঁদের দেখা মিললো। সে নিয়মানুযায়ী ২১৮১ সালের ১১ জুলাই আকাশে নতুন চাঁদ ঠিকই দেখা যাবে কিন্তু ঐদিন গ্রহণ হবে না। তাই গ্রহণের ভবিষ্যদবাণীতে Metonic cycle তেমন একটা উপযোগী না।

Octon: metonic cycle কে 5 দিয়ে ভাগ করলে যে চক্রটি পাবেন সেটাই Octon। এটির দৈর্ঘ্য প্রায় ১৩৮৮ দিন (৩.৮০ বছর। ১৯৮০ সালের ১০ আগস্টের পর ১৯৮৪ সালের ৩০ মে এর গ্রহণ। তারপর ১৯৮৮ সালের ১৮ মার্চের গ্রহণ। এসব Octon এরই প্রমান।

এজাতীয় আরও Cycle আছে। Heliotrope, Megalosaros, Accuratissima, Horologia

1 Tetradia $=19I + 2S$

1 Heliotrope =$58I + 6S$

1 Megalosaros=$58I + 7S$

1 Accuratissima=$58I + 9S$

1 Horologia=$110I + 7S$

আরও কিছু cycle আছে। সেগুলো আমরা ধীরে ধীরে আলোচনা সাপেক্ষে জানতে পারব।

মুন ইলিউশান

Illusion শব্দের অর্থ হতে পারে মায়া, বিভ্রম, বিভ্রান্তি। আকাশের চাঁদ যখন দিগন্তের কাছাকাছি থাকে তখন চাঁদটাকে খেয়াল করেছেন? চাঁদ মাথার উপরে থাকলে যেমন দেখায়, দিগন্তের কাছাকাছি তার চেয়ে অনেক বড়ো দেখায়। চাঁদ উদয়ের সময় বা অস্ত যাওয়ার সময় মনে হয় চাঁদ অনেক রক্তিম আর বড়ো হয়ে গেছে। আকাশের অন্য কোনো স্থানের তুলনায় দিগন্তের কাছে চাঁদ বড়ো মনে হওয়ার এই ঘটনাটিকেই বলা হয় চন্দ্রবিভ্রম বা Moon illusion। চাঁদ কেন দিগন্তের কাছে লাল দেখায় তার ব্যাখ্যা সহজেই দেওয়া যায়। চাঁদ দিগন্তের কাছে থাকলে চাঁদের আলোকে অধিক বায়ুস্তর ভেদ করে আমাদের চোখে আসতে হয়। তাই অন্যান্য আলো বিচ্ছুরিত হয়ে ছড়িয়ে গেলেও লাল আলো চোখে আসতে পারে (ব্লাড মুনে দেখেছি আমরা সূর্য ডোবার সময় কিংবা সূর্য ওঠার সময় ও একই ঘটনা ঘটে)। একারণে দিগন্তের কাছে চাঁদকে লাল দেখায়।

চিত্রঃ দিগন্তের কাছে চাঁদের বড়ো আকার

কিন্তু বায়ুস্তরের এই ধরনের ব্যাখ্যা চাঁদ বড়ো হওয়ার ব্যাখ্যা দিতে পারে না। চোখের ভুল সবসময় সবার নাও হতে পারে কিন্তু চন্দ্রবিভ্রম এমন একটি ঘটনা যেটি সবাই বুঝতে পারে। আর এখন পর্যন্ত এর কোনো সঠিক ব্যাখ্যা বা ধ্রুব ব্যাখ্যার খোঁজ পাওয়া যায়নি। তবে অনেকগুলো ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। সেগুলোর দিকে একটু নজর বোলানো যাক।

এটাকে বিভ্রম কেন বলা হচ্ছে? আপনার মনে হতে পারে বায়ুস্তর অতিক্রম করতে গিয়ে আলোকরশ্মির গমন পথের পরিবর্তন এর ফলে হয়ত এমন ঘটনা ঘটছে। কিন্তু না। এটা বিভ্রম কিনা সেটা প্রমাণ করার একটি উপায় আছে। আপনি চাঁদ ওঠা থেকে শুরু করে চাঁদ মাথার উপরে আসা পর্যন্ত সময়ের মাঝে চাঁদের কয়েকটি ছবি তুলুন। এবার ছবিগুলো মিলিয়ে দেখুন চাঁদের আকার, ব্যাস প্রতিটি ছবিতেই একই! বিশ্বাস হচ্ছে না? নিচের চিত্রটি দেখুন।

চিত্রঃ চাঁদের আকারের কোনো পার্থক্য ক্যামেরাতে ধরা পড়ে না

এখানে দেখা যাচ্ছে চাঁদ যখন উঠছে তখনও চাঁদের আকার যা চাঁদ উপরে উঠতে থাকলেও চাঁদের আকার তা। তাহলে আপনার চোখে আপনি বড়ো দেখলেন কীভাবে যেটা ক্যামেরায় ধরা পড়লো না?

চন্দ্রবিভ্রমের ব্যাখ্যা সেই গ্রিকরা দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন। এখানেও মহা দার্শনিক অ্যারিস্টটল ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। অ্যারিস্টটল সহজ একটি ব্যাখ্যা প্রদান করলেন। তিনি বললেন পানির ভিতর কোন বস্তু রাখলে বড়ো দেখায়। তেমনি চাঁদের আলো বায়ুমণ্ডলের অধিক স্তর ভেদ করে আসার সময়ও বড়ো দেখাবে। অর্থাৎ তিনি বলতে চাইলেন পানির ভিতর বস্তু যে কারণে বড়ো দেখায় চাঁদও ঠিক একই কারণে দিগন্তের কাছে থাকা অবস্থায় বড়ো দেখায়। সহজ ভাষায় পানির মাঝে বস্তু রাখলে পানি যেমন লেন্সের মতো কাজ করে, তেমনি বায়ুস্তরও লেন্সের মতো কাজ করে চাঁদকে বড়ো করে দেখায়। তারপর যখন চাঁদ উপরে উঠে যায় তখন লেন্সের আকার ছোটো হয়ে যায় (বায়ুস্তর কমে যায়) তাই তখন চাঁদকে ছোটো মনে হয় আগের চেয়ে। দূর্ভাগ্যবশত, অ্যারিস্টটল ভুল ছিলেন। কারণ আমরা দেখেছি, চাঁদ যদি বায়ুমণ্ডলের কারণে বড়োই দেখাতো তাহলে সেটা ক্যামেরায় ধরা পড়ত। কিন্তু তা পড়েনি। সুতরাং, এই মতবাদ নিসন্দেহে ভুল। এদিকে বিখ্যাত গণিতবিদ, জ্যোতির্বিদ টলেমি তার বিখ্যাত Almagest এ এর একটি কারণ উল্লেখ করেন। কিন্তু তিনিও অ্যারিস্টটল এর মতোই প্রায় সমার্থক একটি ব্যাখ্যা দাড় করালেন। সমসাময়িক গ্রিক জ্যোতির্বিদ ক্লিওমিডিস ও একই কথায় সুর মেলালেন। তাহলে এখন মূল প্রশ্ন হলো আমাদের চোখ চাঁদকে দিগন্তের কাছে বড়ো বলে মনে করছে কেন?

এগারো শতকে আরব গণিতবিদ ইবনে আল হাইসাম এর একটি যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেন। তিনি চন্দ্রবিভ্রম এর জন্য আমাদের মস্তিষ্ককে দায়ী করলেন। তিনি বললেন, যখন চাঁদ দিগন্তের কাছে থাকে তখন আমাদের মস্তিষ্ক ধরে নেয় যে চাঁদ অনেক দূরে আছে আবার যখন চাঁদ মাথার উপরে থাকে তখন মস্তিষ্ক ধরে নেয় চাঁদ আমাদের অনেকটা কাছে অবস্থিত। আমাদের মস্তিষ্কের এহেন উপলব্ধির জন্য তৈরি হয় এই বিভ্রম। তার ব্যাখ্যাটিকে একটু সহজভাবে বলা যায় এভাবে। আমরা প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা থেকে দেখি যে পৃথিবী নিজ অক্ষে ঘোরার জন্য তারাগুলো আমাদের চারপাশে একটি গোলক তৈরি করে ঘুরছে বলে মনে হয়। এই গোলকটিকে বলা হয় Celestial sphere। এটা একটা অর্ধবৃত্তাকার গম্বুজের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। কিন্তু আমাদের মস্তিষ্ক এটাকে অর্ধবৃত্ত হিসেবে দেখে না, কারণ দিগন্তের কাছাকাছি এলাকাটি মস্তিষ্ক দূর হিসেবে দেখে এবং মাথার উপরের অংশটি নিকট হিসেবে দেখে। ফলে প্রকৃতপক্ষে আমাদের চোখে অর্ধগোলক আকারের কোন গম্বুজ নয় বরং মাঝখানে চাপানো, অনেকটা সমতল একটি গম্বুজ হিসেবে দেখে। এর ফলে আমাদের মনে হয় চাঁদ ঐ গম্বুজটির নিচের অংশে ভ্রমন করছে।সে হিসেবে চাঁদ দিগন্তের কাছে থাকলে বীক্ষণ কোণ বড়ো হয় এবং উপরে উঠে আসলে বীক্ষণ কোণ (কোন বস্তু আমাদের চোখে যে কোণ উৎপন্ন করে তাকে বীক্ষণ কোণ বলে) ছোটো হয়। তাই চাঁদকে দিগন্তের কাছে বড়ো দেখায় । চিত্র হতে বোঝা যাক ব্যাপারটা।

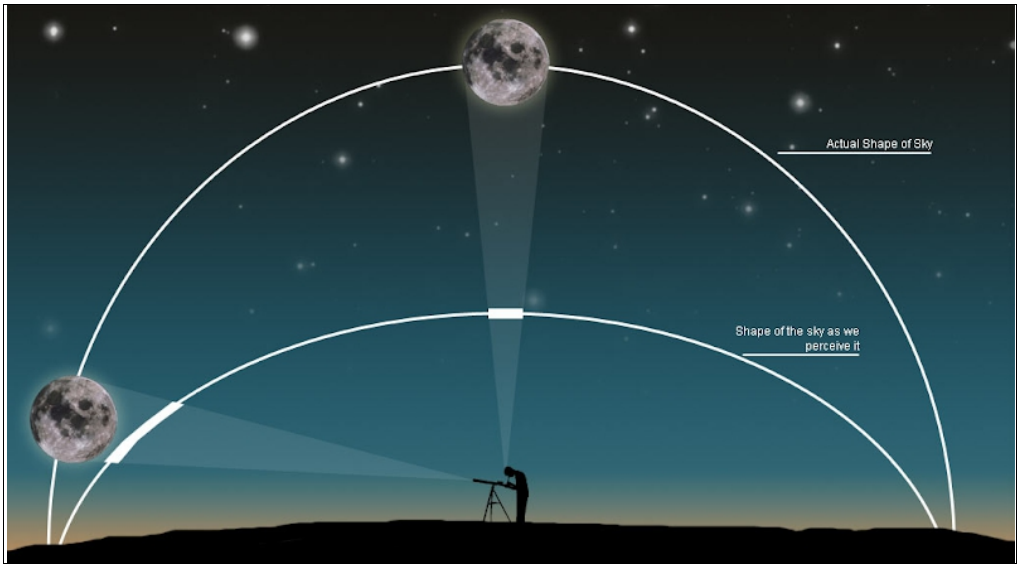

চিত্রঃ আসল অর্ধগোলকের আকার চাপানো গম্বুজ এর মতো হয়ে গেছে

তবে চন্দ্রবিভ্রম এর ব্যাখ্যা কিন্তু এখানেই শেষ নয়। এর পরের ব্যাখ্যাটি বুঝতে আমাদের জানা দরকার Ponzo illusion সম্পর্কে। ইতালিয়ান মনোবিজ্ঞানী Mario ponzo 1911 সালে একটি Illusion সম্পর্কে বলেন। তার এই বিভ্রমটি নিচে দেখানো হলো।

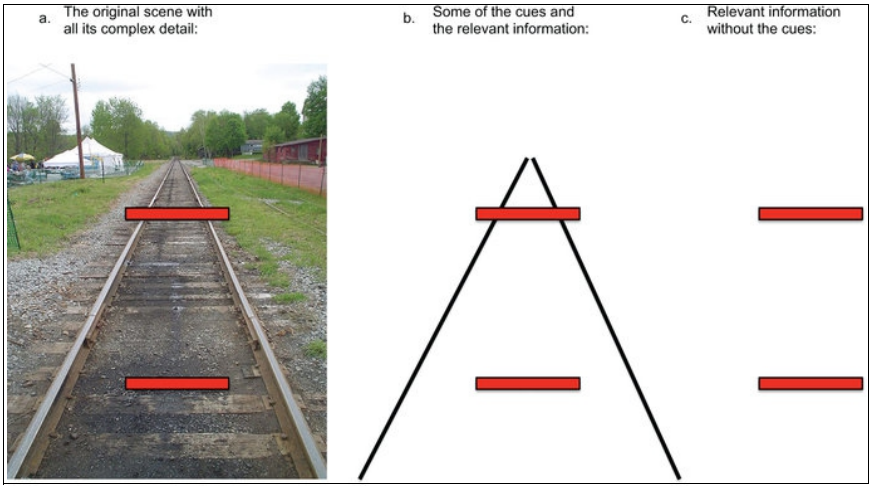

চিত্রঃ Ponzo illusion সবচেয়ে বামে রেললাইনের উপর উপরের রেখাটি বড়ো মনে হচ্ছে যদিও তারা সমান

এখানে দুইটি রেখার দৈর্ঘ্য একই হলেও আমাদের কাছে উপরের রেখাটিকে বড়ো বলে মনে হচ্ছে। এটাই Ponzo illusion। Ponzo এর মতে, আমাদের মস্তিষ্ক কোনো একটি বস্তুকে পিছনের দৃশ্যপটের (ব্যাকগ্রাউন্ড) সাথে মিলিয়ে দেখতে চায়। রেললাইন গুলো অভিসারী (অর্থাৎ দূরে গিয়ে এক হয়ে যায়) অভিসারী এই দৃশ্যপট পিছনে রেখে A সরলরেখাটি দেখলে বড়ো মনে হয় B সরলরেখার চেয়ে। ঠিক এই কারণেই হয়ত দূরে থাকা অবস্থায় চাঁদও বড়ো মনে হয় আমাদের কাছে। তবে এ ব্যাখ্যাটি কিন্তু সর্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত না।

Ebbinghaus illusion নামে আরেকটি বিভ্রম আছে যেটিও চন্দ্রবিভ্রম এর কারণ ব্যাখ্যা করতে ব্যবহৃত হয়। নিচের চিত্রে দুইটি ছবি দেওয়া আছে।

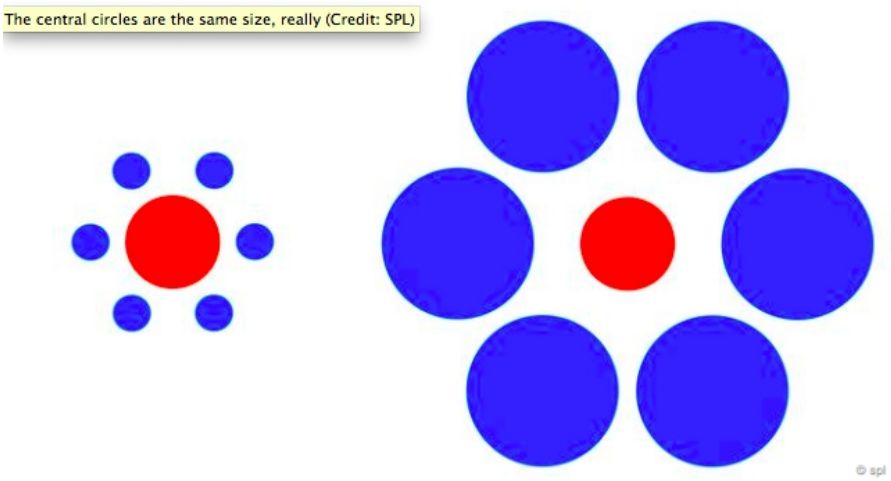

দুটি ছবিরই কেন্দ্রের বৃত্তটির একই ব্যাসার্ধের একই আকারের। কিন্তু দেখুন প্রথম চিত্রের কেন্দ্রের বৃত্তটি আমাদের কাছে বড়ো মনে হচ্ছে। আর দ্বিতীয় চিত্রের কেন্দ্রের বৃত্তটির আকার ছোট মনে হচ্ছে। এই illusion এর মূল কথাটি হলো আমাদের মস্তিষ্ক কোনো বস্তুর আকার শুধু ঐ বস্তুটি না। আশপাশের বস্তুগুলোর দিকে তাকিয়েও বিচার করে। তাই প্রথম চিত্রটিতে যখন ক্ষুদ্র বৃত্তগুলোর মাঝের বৃত্তটি বিবেচনা করা হচ্ছে তখন আশপাশের বৃত্তের তুলনায় কেন্দ্রের বৃত্তটির বড়ো মনে হচ্ছে। ২য় চিত্রের ক্ষেত্রেও বিপরীত কারণে মাঝের বৃত্তটির ছোটো মনে হচ্ছে। ঠিক একই ঘটনা চাঁদ ওঠার সময় ঘটে। দূরের গাছপালা, দালান কোঠা খুবই ছোটো মনে হয় আমাদের কাছে। তখন চাঁদ উঠলে চাঁদ হয়ে ওঠে প্রথম চিত্র এর কেন্দ্রীয় বৃত্ত এবং গাছপালা, দালানকোঠা হয়ে ওঠে আশপাশের ছোট বস্তু! এ কারণে প্রথম চিত্রের মতোই কেন্দ্রীয় বৃত্তের মতো চাঁদের আকার বড়ো দেখায়। আবার চাঁদ যখন উপরে উঠে আসে তখন চাঁদের আকারের তুলনা করার মতে একটি জিনিসই থাকে। সেটা হলো খোলা আকাশ। খোলা আকাশের বিশালতার তুলনায় চাঁদকে তো ক্ষুদ্র মনে হবেই। এভাবে Ebbinghaus illusion দিয়ে চন্দ্রবিভ্রমের ব্যাখ্যা দেয়া হয়।

তবে এই ব্যাখ্যার সীমাবদ্ধতা আছে। পৃথিবীতে না হয় দালানকোঠা গাছপালার কারণে দিগন্তের কাছে চাঁদ বড়ো দেখায়। কিন্তু প্লেনে বসে পাইলটরাও চন্দ্রবিভ্রম প্রত্যক্ষ করেছেন। সেখানে তো দিগন্তে গাছপালা কিংবা দালানকোঠা নেই। তাহলে সেখানে চন্দ্রবিভ্রম দেখা যায় কেন? এ কারণ Ebbinghaus illusion দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। এছাড়া সমুদ্রের নাবিক,

জেলে সবাই চন্দ্রবিভ্রম বা দিগন্তের কাছে চাঁদকে বড়ো হতে দেখেছেন। সেখানেও তো গাছপালা বা দালানকোঠা নেই। তাহলে? Ponzo illusion এ অভিসারী লাইন হিসেবেও দূরের দালানকোঠা, গাছপালার ভূমিকা দেখানো হয়। কিন্তু এটাও তো একদিক থেকে Ebbinghaus illusion এর মতোই হয়ে গেলো! সুতরাং বলা যায়, Ebbinghaus illusion কিংবা Ponzo illusion দ্বারা চন্দ্রবিভ্রম ব্যাখ্যা করা সমীচীন নয়।

এত ব্যাখ্যার পরও আমরা সঠিক একটি ব্যাখ্যা এখনও জানতে পারলামনা। moon illusion এর ব্যাখ্যার জন্য আরও ব্যাখ্যা আছে। এসবের কোনটিই উপরে আলোচিত ব্যাখ্যার মতো না। এ ব্যাখ্যাটি হলো convergence micropsia। Convergence micropsia দিয়ে চাঁদের এহেন বিভ্রম এর একটি ব্যাখ্যা দেয়া যায়। Moon illusion যে শুধুমাত্র চাঁদের ক্ষেত্রে দেখা যায় তা না, বরং কোন একটি তারামন্ডল দিগন্তের কাছাকাছি থাকলেও তারামন্ডলটিকে বড়ো দেখায়।

Precession

প্রাচীনকালের অধিকাংশ জ্যোতির্বিদেরই বিশ্বাস ছিল, আমাদের এই মহাবিশ্ব পৃথিবীকেন্দ্রিক। অবশ্য খালি চোখে মানুষ দেখত, সূর্য প্রতিদিন পূর্ব দিকে ওঠে এবং পশ্চিমে অস্ত যায়, চাঁদ অথবা তারকার গতিপথ দেখেও তাদের ধারণা হয়েছিল সমগ্র মহাবিশ্বের কেন্দ্র আমাদের এই পৃথিবী। কিন্তু, আমরা আজ জানি, তাদের ধারণা কতটা ভুল ছিল। আমরা আর সেই পুরনো আলোচনা শোনার জন্যেও প্রস্তুত নই। তবে এ কথাটি বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই আলোচনায় আমরা পৃথিবীকেই কেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করব। কেন?

খোলা মাঠে গিয়ে দাড়ালে আপনি যেদিকেই তাকান না কেন, সেদিকেই নীল আকাশ। কল্পনা করুন আপনাকে যদি এমন একটি স্থানে রাখা হয়, যার উপরের অংশ পুরোপুরি অর্ধগোলক, তাহলে উপরের দিকে তাকিয়ে আপনি অর্ধগোলকটির ভিতরের পাশ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবেন না। তেমনি এই যে আমাদের আকাশ, এটিকেও পৃথিবীর চারপাশে একটি গোলকরূপেই কল্পনা করা হয়। গোলকের ভিতরের দিকের অংশে তারাগুলো যেন আঁকানো আছে । এই কথা শুনে আবার ভেবে বসবেন না যে, আমি টলেমি কিংবা অ্যারিস্টটল এর মতো পৃথিবীকেন্দ্রিক মডেল সমর্থন করছি! এই আলোচনার মাধ্যমে আমরা গোলকীয় জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে জানতে পারব। বুঝতে পারব, পৃথিবীর নিজ অক্ষের আবর্তনের ফলে তারাদের গতিপথ কেমন হয়। আকাশে তারাদের অবস্থান কীভাবে নির্দিষ্ট করতে হয়। যাই হোক মূল কথায় ফিরে আসি। খোলা মাঠে দাড়ালে আপনি এই গোলকটির পুরোপুরি অর্ধাংশ ভিতরের দিক থেকে দেখতে পাবেন। আর আপনি থাকবেন ঐ গোলকটির কেন্দ্রে। আমাদের মহাজগতের বিশালতার তুলনায় পৃথিবীর আকার কিছুই না। পৃথিবীর আকার একটি নগণ্য বিন্দু সদৃশ। তাই আমরা যে গোলকটির কথা বলছি সেটি অকল্পনীয় আকারের বড়ো। আর তার কেন্দ্রে আমাদের পৃথিবী, আমরা। পৃথিবীর এই অতি ক্ষুদ্র আকৃতির জন্য ধরে নেয়া যায় আপনি পৃথিবীর যেখানেই থাকুন না কেন, আপনি এই বিশাল গোলকের কেন্দ্রেই আছেন। তাই আপনার অবস্থান পৃথিবীর কোথায় সেটা বিবেচনা না করে এই আলোচনা আপনাকে এই বিশাল গোলকের কেন্দ্রে ধরে অগ্রসর করা হবে। আপনিই হবেন গোলকীয় জ্যোতির্বিদ্যা বোঝার পর্যবেক্ষক। খোলা মাঠে দাড়ালে আপনি যে গোলকের কেন্দ্রে আছেন তার ঠিক উপরের অর্ধাংশই আপনি দেখতে পাবেন। বাকি অর্ধাংশ কিন্তু আপনার চোখে পড়বে না। এই দুই অর্ধাংশের ছেদন তল চিত্রে দেওয়া আছে। আর একটি কথা, অনেক দূরে দৃষ্টি দিলে যেখানে আকাশ ও পৃথিবী এক হয়ে গেছে বলে মনে হয়, সেটিই দিগন্ত (সহজ ভাষায়)।

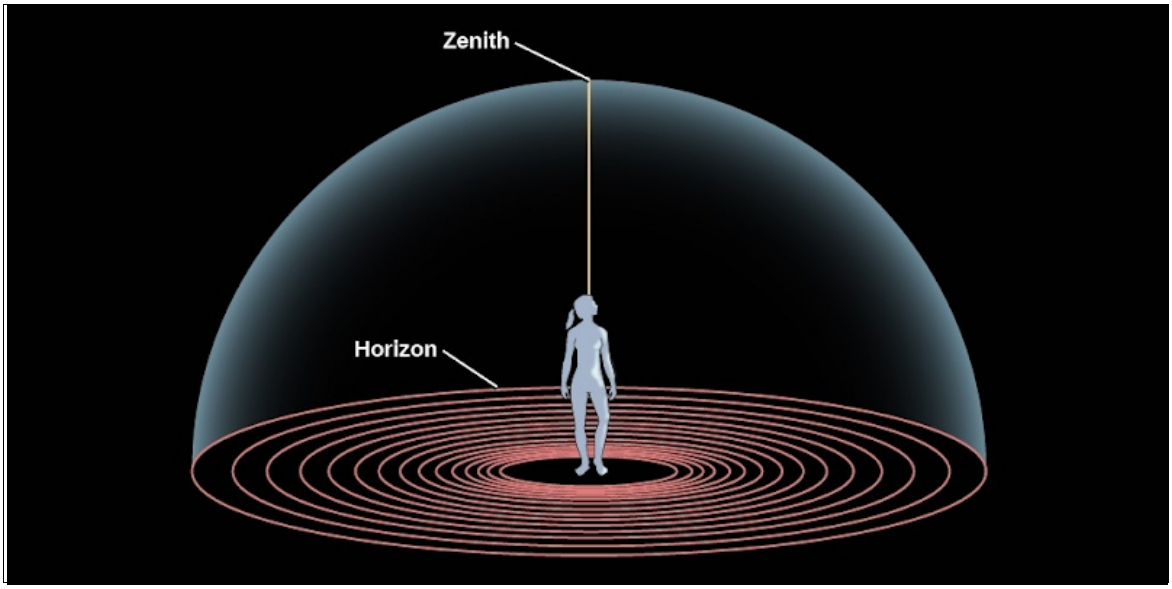

দেখুন, এই horizon এর নিচে কিন্তু আমরা কিছুই দেখব না কারণ এটিই আমাদের কল্পিত অর্ধগোলকের শেষ সীমা। কোনো তারকা যখন দিগন্তের উপরে থাকবে তখনই আমরা দেখতে পাব। যখনই দিগন্তের নিচে চলে যাবে, তখন আমাদের কাছে মনে হবে তারকাটি ডুবে গেছে।

আপনি পৃথিবীর যেখানেই থাকুন, আপনি একটি গোলকের কেন্দ্রে। আপনার মাথার উপরে সোজাসুজি যে বিন্দুটি আছে সেটার নাম সুবিন্দু (zenith)

আমরা জানি, পৃথিবীর দুই ধরনের গতি থাকে সূর্যের চারপাশে ঘোরার সময়। আহ্নিক এবং বার্ষিক। সূর্যের চারপাশে ঘোরাকে বার্ষিক এবং পৃথিবী নিজ অক্ষের চারপাশে ঘোরাকে আহ্নিক গতি বলে। পৃথিবী সূর্যের চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে একই সাথে যখন নিজ অক্ষের উপরেও ঘোরে তখন কিন্তু পৃথিবীর নিজ অক্ষের উপর ঘূর্ননটা একটু বাঁকাভাবে হয়। পৃথিবীর অক্ষটা পৃথিবীর গতির সাথে পুরোপুরি 90° কোণে থাকে না (সহজ ভাষায় বললে সোজা থাকে না)। পৃথিবীর ঘূর্ণন অক্ষটি একটু বাকাভাবে অবস্থান করে। (যেমনটি চিত্রটিতে দেখানো হয়েছে)

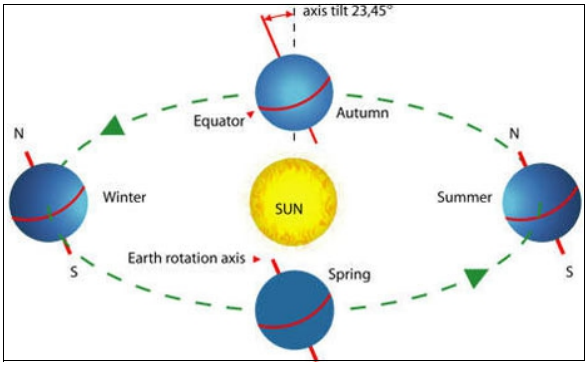

ঘূর্ণন অক্ষ পৃথিবীর বার্ষিক গতির দিকের লম্বের সাথে ২৩ ডিগ্রি ৪৫ মিনিট কোণ তৈরি করে। এভাবেই সারাবছর আহ্নিক গতি এবং বার্ষিক গতির সমন্বয়ে পৃথিবীর ঘূর্ণন হয়।

এবার দেখি আহ্নিক গতির সময় পৃথিবীর অবস্থা কেমন হয়। নিচের চিত্রটি দেখুন। চিত্রে পৃথিবীর ঘূর্ণন অক্ষ (Axis) এবং ঘূর্ণন এর দিক দেখানো হয়েছে। অক্ষটির দুইপ্রান্তকে দুই মেরু বলা হয়। পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ঘোরে। মেরু দুটিরউত্তর দিকেরটি north pole এবং দক্ষিণ দিকেরটি South pole। আসলে মেরু দুইটি হলো পৃথিবী নামক

গোলকের উপর দুইটি বিন্দু। পৃথিবীর নিজ অক্ষের উপর ঘূর্ণন হলেও এই দুইটি বিন্দু কিন্তু ঘুরছে না। কারণ এই দুটি বিন্দুই তো অক্ষ গঠন করে। তাহলে এই বিন্দু দুটি স্থির বিন্দু (পৃথিবীর নিজ অক্ষের ঘূর্ণন সাপেক্ষে)। উত্তর মেরু এবং দক্ষিণ মেরু থেকে সমান দূরত্বে পৃথিবী নামক গোলকের উপর যে বৃহৎ বৃত্ত টানা হয় সেটাকে Equator বা বিষুবরেখা বলে।

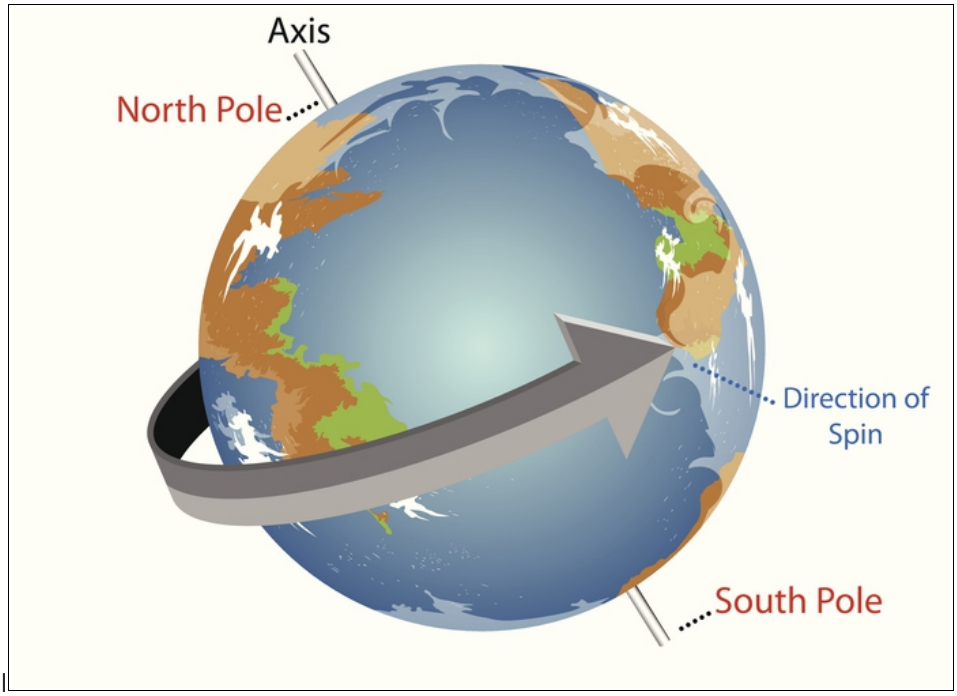

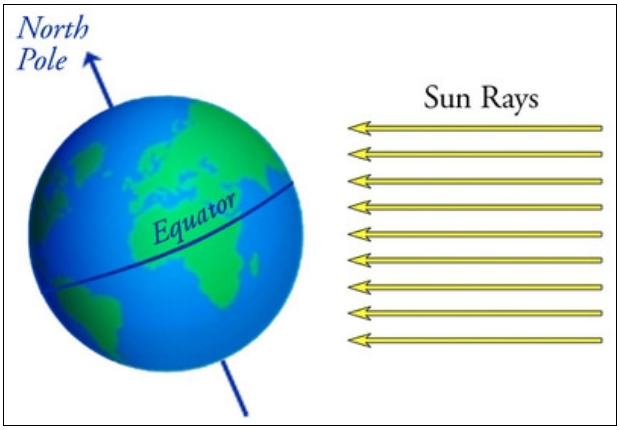

দেখুন, উত্তর মেরু থেকেও বিষুবরেখা 90° ব্যবধানে আবার দক্ষিণ মেরু থেকেও বিষুবরেখা 90° ব্যবধানে অবস্থান করছে। বিষুবরেখা পৃথিবীকে সমান দুইটি অর্ধগোলকে বিভক্ত করছে। উত্তর দিকের অংশ বা উপরের অংশ টাকে বলা হয় উত্তর গোলার্ধ। আর দক্ষিণ দিকের অংশ বা নিচের অর্ধগোলকটিকে বলা হয় দক্ষিণ গোলার্ধ। এবার মনে করুন সেই বৃহৎ গোলক বা celestial sphere কে। যার কেন্দ্রে আপনি, আমি, আমাদের এই পৃথিবী। প্রথমেই বলেছি এটি একটি কাল্পনিক বিশাল আকৃতির গোলক। এই গোলকের উপরেই তারা, গ্রহ, গ্যালাক্সি সব অবস্থিত। পৃথিবীর ঘূর্ণন অক্ষকে উভয়দিকে বর্ধিত করলে সেই বর্ধিত রেখাটি celestial sphere এর যে দুটি বিন্দুতে ছেদ করবে সে দুটি বিন্দুকে Celestial pole বলা হয়। পৃথিবীর উত্তরমেরুর দিকেরটিকে *North celestial pole (NCP)* এবং দক্ষিণ মেরুর দিকেরটিকে *South celestial pole (SCP)* বলা হয়। পৃথিবীর বিষুবরেখা বা Equator এর মতোই এখানে রয়েছে Celestial equator.

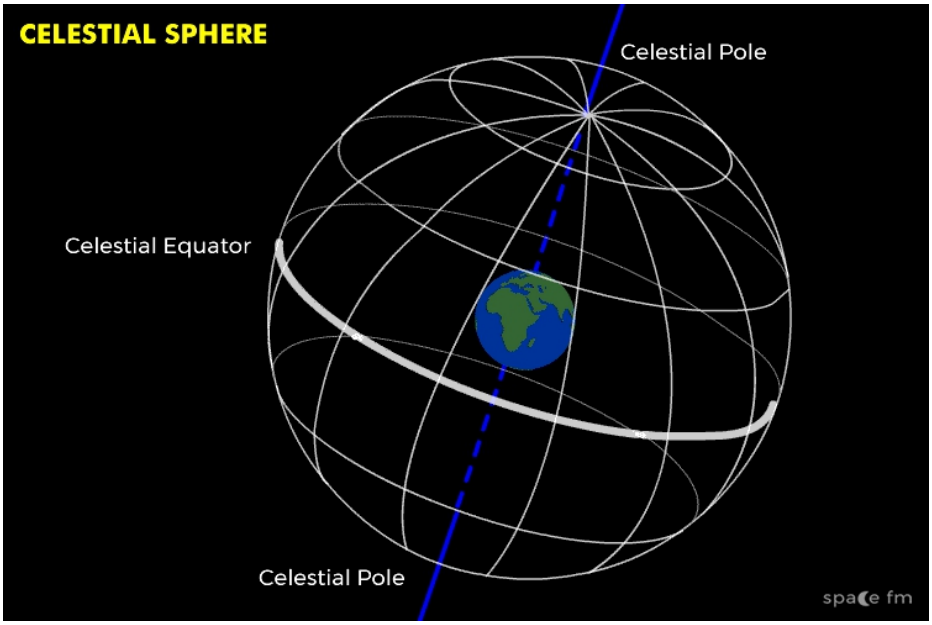

অর্থাৎ বলা যায় পৃথিবী নামক গোলকের একটি বড়ো সংস্করণই হলো Celestial sphere। পৃথিবীর মতোই আছে এর সদৃশ মেরু এবং বিষুবরেখা।

তাহলে এবার আমাদের সামগ্রিক চিত্রটা হলো এমন। Horizon, celestial sphere, NCP, SCP এগুলোই দেখানো হয়েছে চিত্রে।

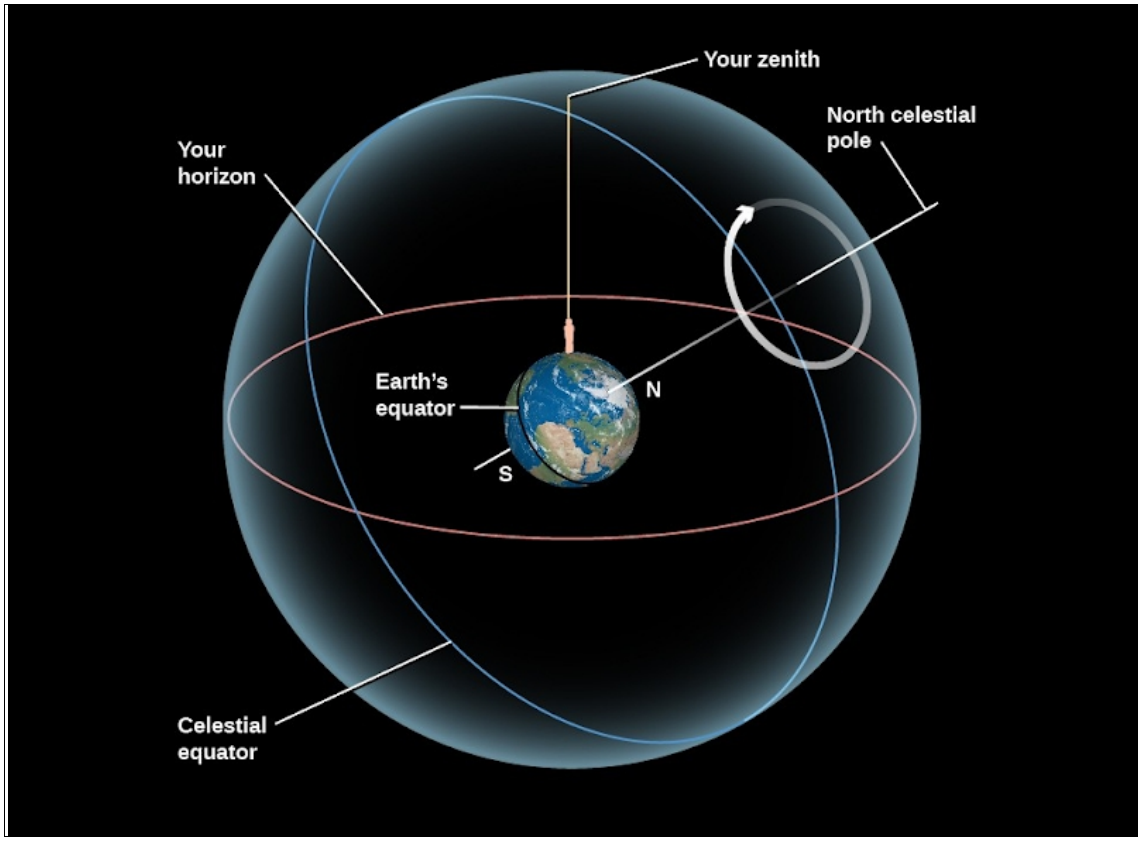

একটি ব্যাপার লক্ষ্যণীয়। আমরা কিন্তু দুইটি pole পেয়েছি। অর্থাৎ দুইটি স্থির বিন্দু। আমরা জানি পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ঘুরছে। ফলে আমাদের কাছে মনে হবে তারাগুলো পূর্ব দিকে ওঠে এবং পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। যেহেতু NCP,

SCP দুইটি স্থির বিন্দু তাই ঐ বরাবর যে তারাদুইটি থাকবে তারাও স্থির থাকবে। মনে হবে যেন ঐ তারা দুটি ঘুরছে না। অর্থাৎ স্থির মনে হবে। এ দুটি তারাই ধ্রুবতারা। আমরা সবচেয়ে বেশি পরিচিত NCP এর ধ্রুবতারাটির সাথে। আমরা জানি, celestial sphere পৃথু গোলকের মতোই একটি বিশাল গোলক তাই Celestial equator ও celestial sphere কে দুটি অর্ধগোলকে বিভক্ত করছে। NCP এর দিকের অর্ধগোলকের তারাগুলো NCP কে কেন্দ্র করে এবং SCP এর দিকের অর্ধগোলকের তারাগুলো SCP কে কেন্দ্র করে ঘুরছে এবং Celestial equator বরাবর তারাগুলো NCP, SCP কাউকেই কেন্দ্র করে ঘুরছে না বরং এই তারাগুলো পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে।

চিত্রঃ তারাগুলো ধ্রুবতারাকে কেন্দ্র করে ঘোরে। এই ধরনের চিত্রকে Star trail বলে

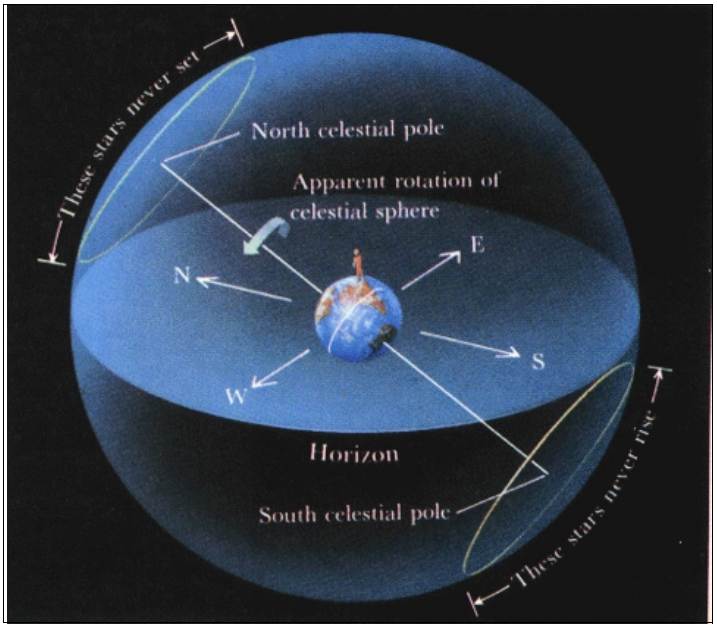

খেয়াল করলে দেখা যাবে কিছু কিছু তারা কখনও ডোবে না। ডোবে না অর্থ এরা কখনও দিগন্তের নিচে যায়না। এই তারাগুলোকে বলা হয় Circumpolar star। ঠিক অনুরূপভাবে কিছু কিছু তারা কখনও ওঠেনা। সেগুলো চিত্রটিতে তুলে ধরা হয়েছে।

আবার ও পৃথিবীর বার্ষিক গতির দিকে ফিরে আসি। পৃথিবী সূর্যের চারপাশে যে পথে পরিভ্রমণ করে সেই পথটি চিত্রে লাল রংয়ের তীর চিহ্ন দ্বারা দেখানো হয়েছে। কিন্তু আমরা একদম প্রথমে পৃথিবীকে স্থির ধরে নিয়েছিলাম। তাই পৃথিবীর সাপেক্ষে সূর্যের একটি পথও আমরা পাবো। এই আপাত পথটিকে বলা হয় Ecliptic.

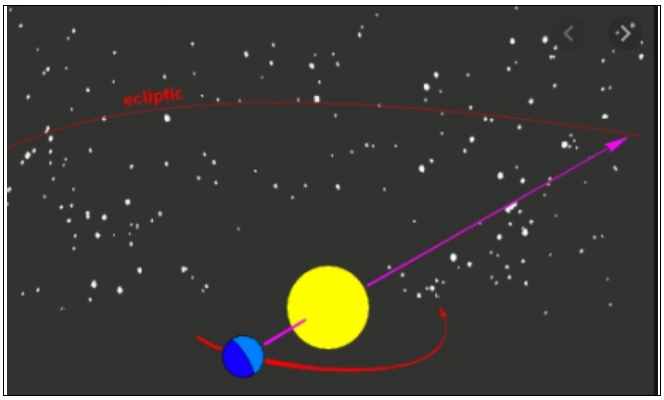

চিত্রঃ পৃথিবীর সাপেক্ষে সূর্যের গমনপথ

সহজ ভাষায় যদি বলি, Celestial sphere এর উপর সূর্য যে পথে পরিভ্রমন করে সেই পথটিকেই বলা হয় Ecliptic। Celestial equator এর সাথে Ecliptic প্রায় ২৩.৫° কোণ করে অবস্থান করে। সারাবছর ধরে সূর্য এই Ecliptic বরাবর ই চলাচল করে। সূর্য কিন্তু কখনও ecliptic এ স্থির নয়। এক এক দিনে Ecliptic এ সূর্যের অবস্থান এক এক রকম। সারাবছর ধরে সূর্য Ecliptic বরাবর বিচরন করে। এই Ecliptic বরাবর যে তারামন্ডল গুলো আছে সেগুলোই হলো রাশি। এই Ecliptic বরাবর রাশিগুলোর যে চক্র সেটাকেই বলা হয় রাশিচক্র।

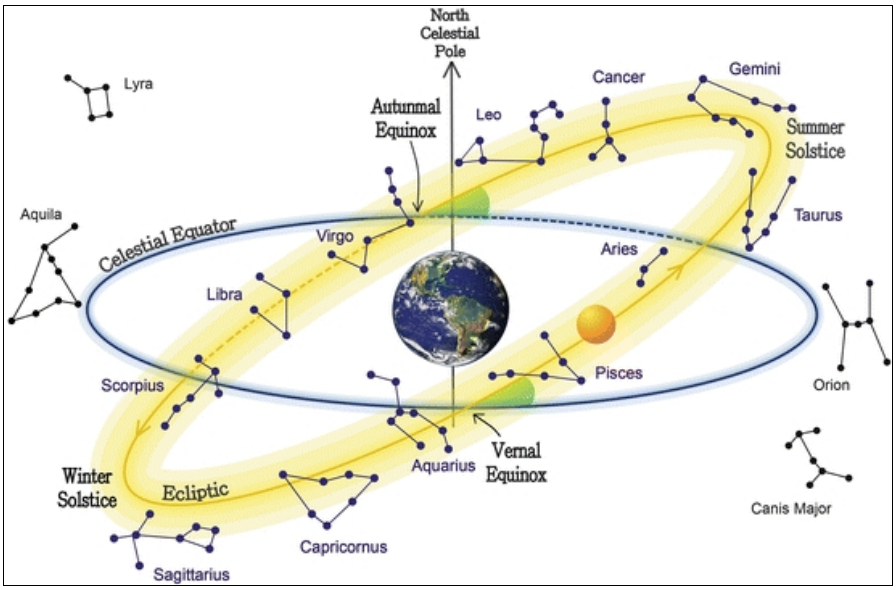

চিত্রঃরাশিচক্র

স্পষ্টত, সূর্য সারাবছর এই রাশিচক্রেই থাকে। Ecliptic এবং Celestial equator এর ছেদবিন্দুকে বলা হয় Vernal equinox এবং Autumnal equinox. এদের বাংলা যথাক্রমে মহাবিষুব এবং জলবিষুব। সূর্য যেদিন মহাবিষুব এবং জলবিষুব অবস্থানে থাকে, সে সময় দিন রাত্রি সমান হয় কারণ এ সময় সূর্য Celestial equator এর উপর থাকে আবার

সূর্য এর আরও দুইটি বিশেষ অবস্থান আছে। সেগুলো হলো Summer solstice এবং Winter solstice। চিত্রটিতে লাল রেখা দ্বারা Ecliptic দেখানো হয়েছে।

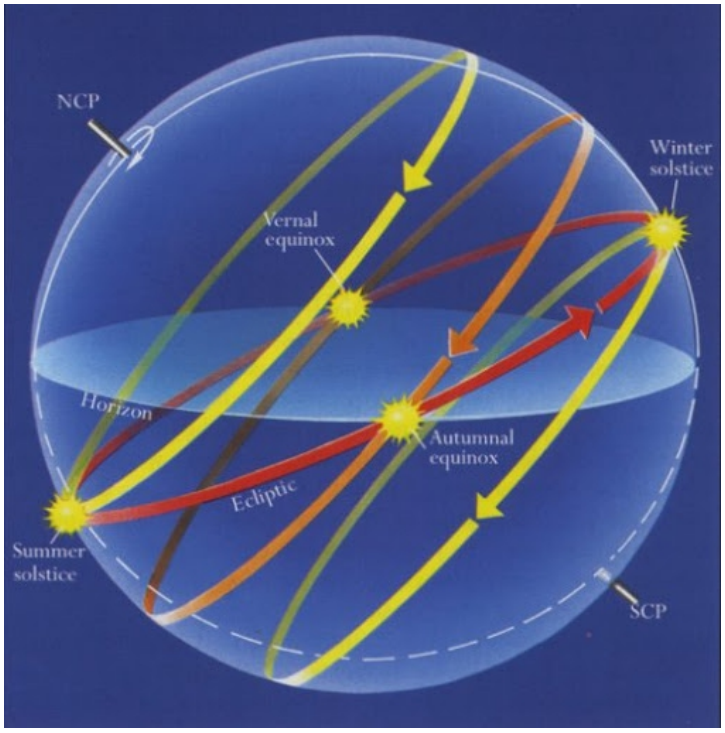

খেয়াল করে দেখুন, Winter solstice এ থাকাকালীন উত্তর গোলার্ধে সূর্য কম সময় দিগন্তের উপরে থাকছে। তাই এ সময়টিতে দিন ছোট এবং রাত সবচেয়ে বড়ো হবে। ঠিক উল্টো কারণে সূর্য Summer solstice এ থাকাকালীন উত্তর গোলার্ধে রাত ছোট এবং দিন বড়ো হবে।

এবার আসি কিভাবে Celestial sphere এর উপর একটি তারার অবস্থান নির্দিষ্ট করতে হয়। দ্বিমাত্রিক গ্রাফ পেপার বা ছক কাগজে একটি বিন্দু নির্দিষ্ট করতে দুইটি জিনিসের প্রয়োজন। x অক্ষের ভ্যালু বা ভুজ এবং y অক্ষের ভ্যালু বা কোটি। ঠিক তদ্রুপ Celestial Sphere এর উপর একটি তারা নির্দিষ্ট করতে দুটি জিনিসের সাহায্য নেওয়া হয়। একটি right ascension এবং অপরটি declination। Right ascension এর বাংলা হলো বিষুবাংশ এবং declination এর বাংলা হলো বিষুবলম্ব। এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার আপাতত দরকার নেই। চিত্র থেকে বোঝার চেষ্টা করি।

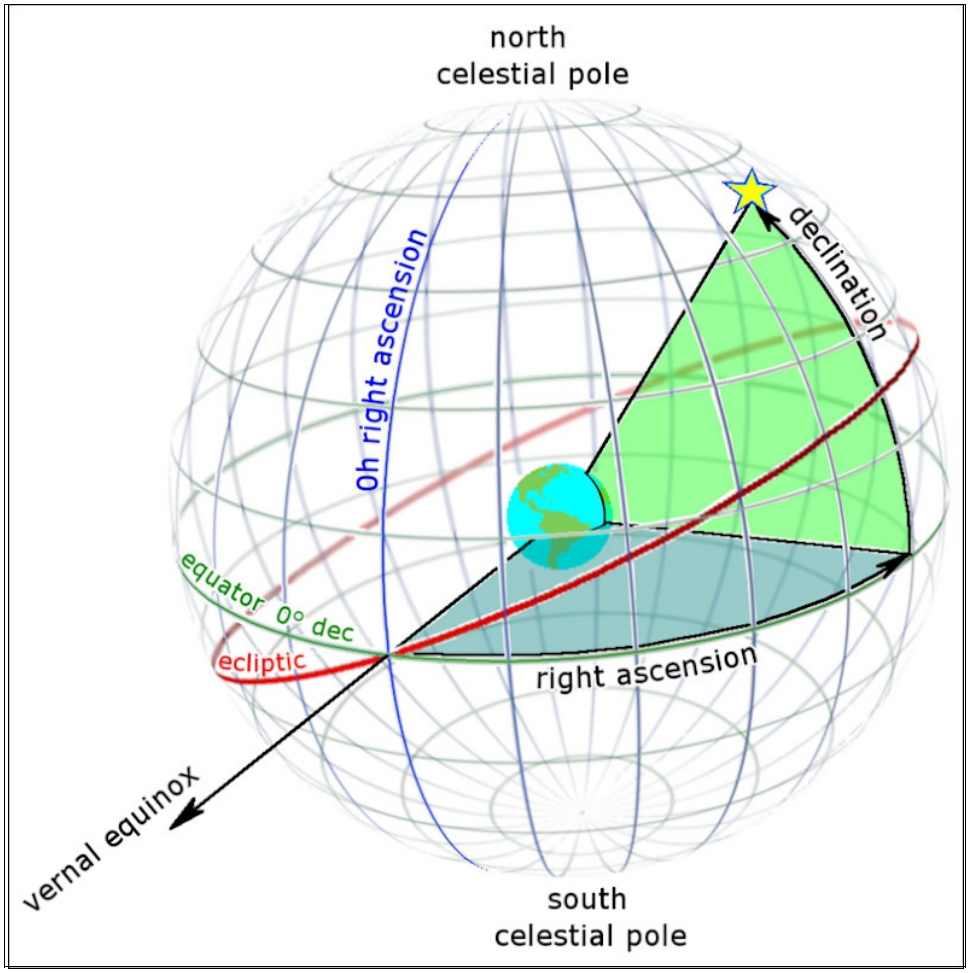

তাহলে শুধু এটুকু মাথায় রাখি যে বিষুবাংশ এবং বিষুবলম্ব দ্বারা Celestial sphere এর উপর তারা চিহ্নিত করা হয়।

এতদূর পড়ার পর আপনার নিশ্চয়ই আমার উপর রাগ হচ্ছে। ভাবছেন টপিকের নাম যা দিয়ে শুরু করেছি তার ছিটেফোঁটাও এখনও পেলামনা। শুধুই বকবকানি আর জ্যামিতি। আরেকটু ধৈর্য ধরুন। টপিকে ফিরে আসছি। তবে এখন একটু বিশ্রাম নিন। এতক্ষন যা জানলেন তার একটু রিভিশন দিন কোনটাকে কি বলে। আর চিত্রগুলো দেখুন মন দিয়ে।

আমরা আবারও উল্লেখ করতে চলেছি মহান জ্যোতির্বিদ হিপারকাসের নাম। হিপারকাসের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। হিপারকাস একটি অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করলেন। আমরা দেখে এসেছি সূর্য Ecliptic ধরে সারাবছর চলে। ধরুন বছরের কোন একদিন সূর্য মহাবিষুব বিন্দুতে আছে। তাহলে ঠিক এক বছর পরেও সূর্যের মহাবিষুব বিন্দুতে থাকার কথা। কিন্তু হিপারকাস দেখলেন সূর্যের মহাবিষুব বিন্দু থেকে আবার মহাবিষুব বিন্দুতে ফিরে আসার সময়কাল 1 বছরের সাথে মিলছে না। ত্রুটি থেকে যাচ্ছে। হিপারকাসের 150 বছর আগে জ্যোতির্বিদ Timocharis উজ্জ্বল তারা চিত্রার অবস্থান তার পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী লিখে গিয়েছিলেন। কিন্তু হিপারকাস এর পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী চিত্রা কিছুটা পূর্বদিকে সরে গেছে। কিন্তু আমরা তো জানি celestial sphere এর উপর তারাগুলো স্থির। তাহলে একটনে তারাটি সরে গেলো কেন?

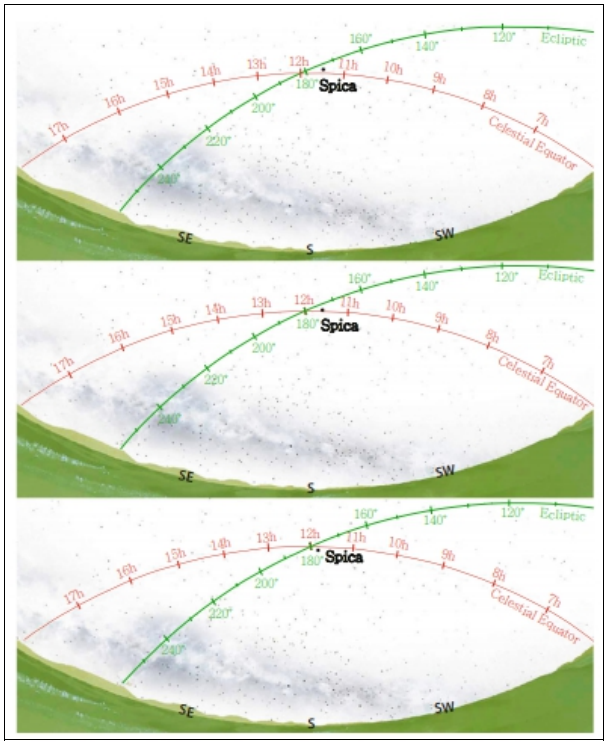

চিত্রঃ এখানে সবুজ রেখা দ্বারা Ecliptic এবং লাল রেখা দ্বারা celestial equator দেখানো হয়েছে । এদের ছেদবিন্দু Autumnal equinox। Spica বা চিত্রা তারাটির গতিপথ দেখানো হয়েছে । উপরের ছবিটি ২৭০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের, মাঝের ছবিটি ১২৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দের এবং নিচের ছবিটি ১৩৮ খ্রিষ্টাব্দের । দেখলেই বোঝা যাচ্ছে তারাটি তার অবস্থান পরিবর্তন করেছে ।

আমরা একটু আগে দেখে এসেছি তারার অবস্থান নির্ণয় করার জন্য মহাবিষুব বিন্দু থেকে পরিমাপ করতে হয় (ছক কাগজের মূলবিন্দুর মতো)। যেহেতু চিত্রা তারাটি সরে গেছে, তার অর্থ মহাবিষুব বিন্দুও সরে গেছে। কারণ ঐ বিন্দু থেকেই তো চিত্রা তারার অবস্থান নির্ণয় করতে হতো। আবার আমরা জানি মহাবিষুব বিন্দু হলো Celestial equator এবং Ecliptic এর ছেদবিন্দু। তাই হিপারকাস সিদ্ধান্ত নিলেন যে Ecliptic ও সরে গেছে। যে কারণেই Ecliptic. বরাবর সূর্য এক বছরে ঠিক আগের জায়গায় ফিরে আসছে না। কিন্তু আমরা তো জানি পৃথিবীর সদৃশ Celestial sphere একটি বিশাল গোলক। এই গোলকে পরিবর্তন হলে বুঝতে হবে পৃথিবীর-ই কোনো পরিবর্তন হয়েছে। কারণ Celestial sphere পৃথিবীর নিজ অক্ষের উপর ঘূর্ণনের উপর ভিত্তি করেই একটি কল্পিত গোলক। তাহলে নিশ্চই পৃথিবীর ঘূর্ণন এর দিক পরিবর্তন হওয়ার কারণে এমনটি হচ্ছে। হিপারকাস দেখান যে প্রতি 100 বছরে মহাবিষুব বিন্দুটি 1 ডিগ্রী করে সরে যাচ্ছে (কল্পনা করুন তো এত ক্ষুদ্র পরিবর্তন ও হিপারকাস খালি চোখের পর্যবেক্ষণে ধরে ফেলেছিলেন) কিন্তু হিপারকাস এর হিসাবে একটু ত্রুটি ছিল। বর্তমান হিসাব অনুযায়ী 72 বছরে 1 ডিগ্রি করে সরে যায় মহাবিষুব বিন্দুটি। যেহেতু মহাবিষুব বিন্দুটি সরে যাচ্ছে তার অর্থ পুরো celestial sphere এই একটি পরিবর্তন ঘটছে।

Precession বা অয়ন চলন এর কারণেই ঘটেছে উপরের ঘটনাগুলো। পৃথিবীর উপর রয়েছে চাঁদ সূর্য এর মহাকর্ষীয় আকর্ষণ। এই মহাকর্ষের ফলে পৃথিবী নিজ অক্ষের উপর ঘোরা একটু বিশেষভাবে হয়। নিচের চিত্রটি খেয়াল করুন।

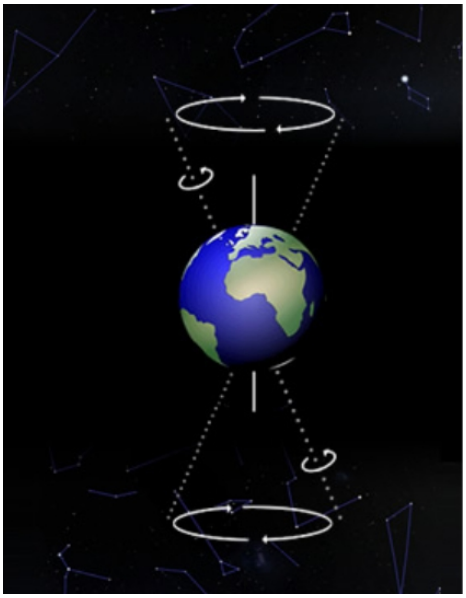

চিত্রঃ পৃথিবীর উত্তর মেরুর ঘূর্ণন

পৃথিবী নিজ অক্ষের চারপাশে যেমন ঘোরে তেমনই ঘোরে লাটিমের মতো। ফলে উত্তর মেরু, দক্ষিণ মেরু আকাশে একটি বৃত্তপথ রচনা করে। যেহেতু উত্তরমেরু, দক্ষিনমেরু চেঞ্জ হয় তাই NCP, SCP ও পরিবর্তিত হয় এবং বৃত্তপথে ঘুরতে থাকে। তাই ধ্রুবতারা আর ধ্রুব থাকে না।

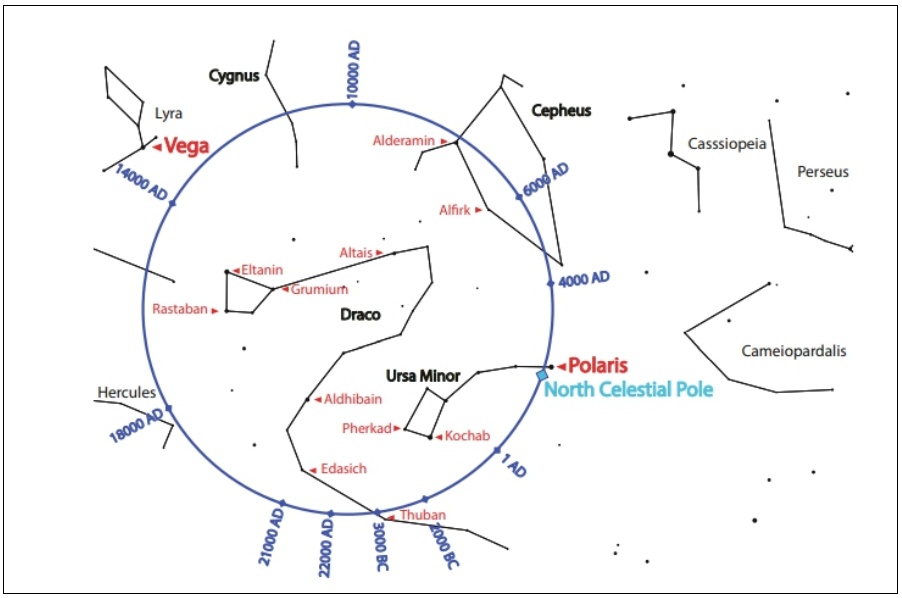

চিত্রঃ উত্তর মেরুর ঘূর্ণনের কারণে ধ্রুবতারাও স্থির না। চিত্রটিতে ৩০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে ২২০০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে ধ্রুবতারার অবস্থান দেখানো হয়েছে।

এখন ধ্রুবতারার স্থান পরিবর্তন হওয়া অর্থ তো পুরো Celestial sphere টিরই পরিবর্তন হওয়া। তাই এই অয়ন চলনের সময় তারাদেরও স্থান পরিবর্তন হয় যেটা হিপারকাস চিত্রা তারার জন্য দেখেছিলেন।

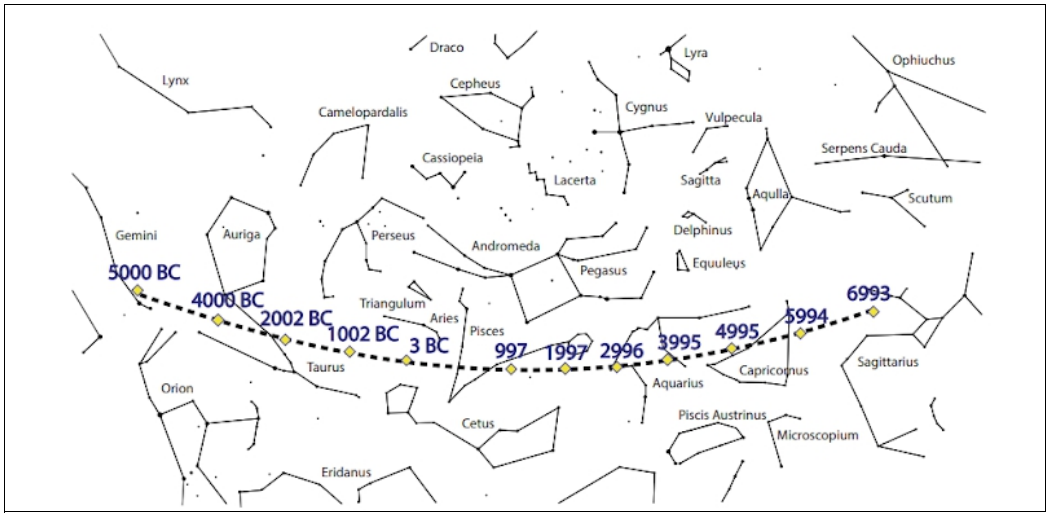

চিত্রঃ অয়ন চলনের কারনে মহাবিষুব বিন্দুর গতিপথ

ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি যে মহাবিষুব বিন্দুর 1° পরিবর্তন হতে 72 বছর সময় লাগে। তাহলে 360° পরিবর্তন হতে সময় লাগবে $360 \times 72 = 25920$ বছর (প্রায় 26000 বছর) অর্থাৎ ছবিটায় দেখানো বৃত্তপথ রচনা করতে 26000 বছর সময় লাগে আমাদের এই পৃথিবীর!

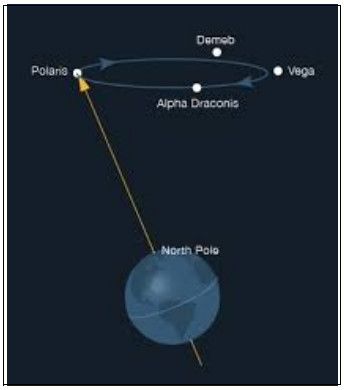

চিত্রঃ প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর ঘূর্ণন

ব্লু মুন

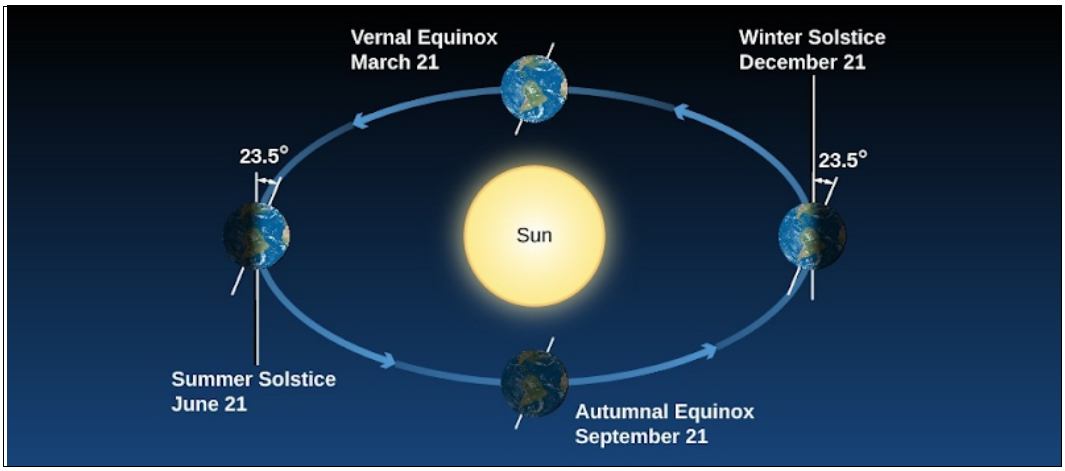

Vernal equinox থেকে Summer Solstice পর্যন্ত পৃথিবীর আসতে যে সময় লাগে সেই সময়টি, Summer Solstice থেকে Autumnal equinox পর্যন্ত আসতে পৃথিবীর সময় লাগে, Autumnal equinox থেকে Winter Solstice পর্যন্ত পৃথিবীর আসতে যে সময় লাগে এবং Winter Solstice থেকে Vernal equinox পর্যন্ত পৃথিবীর যেতে সময় লাগে এই চারটি সময়কে জ্যোতির্বিজ্ঞানের পরিভাষায় season (astronomical season) বা কাল বলা হয়। উপরের চিত্রটি খেয়াল করলে দেখা যাবে, ডিসেম্বর মাসের 21 তারিখ সময় পৃথিবীর উত্তর মেরু সূর্য থেকে বছরের অন্য যে কোনো সময়ের তুলনায় দূরে থাকে। এর ফলে উত্তর গোলার্ধও বছরের অন্য যে কোনো সময়ের তুলনায় সূর্য থেকে দূরে থাকে। এ সময়টিতে উত্তর গোলার্ধের দিন সবচেয়ে ছোট এবং রাত সবচেয়ে বড়ো হয়। আবার বিপরীতভাবে জুন মাসের 21 তারিখে উত্তর গোলার্ধ (প্রকৃতপক্ষে উত্তর মেরু) সূর্যের সবচেয়ে নিকটে থাকে বছরের অন্যান্য সময়ের তুলনায়। তাই উত্তর গোলার্ধের সবচেয়ে ছোটো রাত এবং দিন সবচেয়ে বড়ো হয়। পৃথিবী উপরের চিত্রে দেখানো Vernal equinox এবং Autumnal equinox এ থাকা অবস্থায় দিন রাত্রি সমান হয়। পৃথিবীর এই বিশেষ চারটি অবস্থানে কারণে চারটে সময় ব্যবধান পাওয়া যায়। এই চারটি সময় ব্যবধান কে একটি কাল বলা হয় যদি কোনো সিজন বা কালে চারটি পূর্ণিমা হয় তাহলে তৃতীয় পূর্ণিমার পূর্ণ চাঁদ কে ব্লু মুন বলা হয়।

কিন্তু ব্লু মুনের এই সংজ্ঞাটি অনেক পুরনো। বর্তমানে ইংরেজি মাসের কোন মাসে যদি দুটি পূর্ণ চাঁদ দেখা যায় তাহলে দ্বিতীয় পূর্ণ চাঁদ কে ব্লু মুন বলা হয় এই ধরনের ব্লু মুন কে Monthly blue moon। ব্লু মুন খুব একটা দুর্লভ নয়। 2-3 বছর অন্তর অন্তর ব্লু মুন দেখা যায় চাঁদের Synodic মাস এবং পৃথিবীর এক বছরের সময়ের পরিমাণ থেকে সহজেই বের করা যায় এ হিসাবটি। নিচে হিসাবটি দেখানো হলো-

আমরা দেখেছি যে চাঁদের সাইনোডিক মাস 29.5306 দিনের মতো। অর্থাৎ এক পূর্ণ চাঁদ থেকে আরেক পূর্ণ চাঁদ কিংবা একটি নতুন চাঁদ থেকে আরেক নতুন চাঁদের মধ্যবর্তী সময় ব্যবধান প্রায় 29.5306 দিন। আবার আমরা জানি 1 বছর =365.2425 দিন। এখন যেহেতু 29.5306 দিন =1 সাইনোডিক মাস তাই 365.2425 দিন =365.2425/29.5306= 12.368 সাইনোডিক মাস প্রায়। কিন্তু আমরা জানি 1 সৌরবর্ষ =12 মাস। তাই বলা যায় চান্দ্র মাস প্রতিবছর 0.368 সাইনোডিক মাস করে পিছিয়ে যায়। তাহলে উলটোভাবে বলা যায়, 0.368 সাইনোডিক মাস পিছিয়ে যায় 1 বছরে। অতএব 1 সাইনোডিক মাস পিছিয়ে যায় 1/0.368 =2.716 বছরে। সুতরাং 2.716 বছর পরপর অতিরিক্ত একটি পূর্ণিমা হবে।

তবে আমাদের মনে রাখতে হবে ব্লু মুন এর সাথে নীল রঙের কোনো সম্পর্ক নেই সাধারণ পূর্ণিমা যেভাবে হয় ব্লু মুন ঠিক সেইভাবেই হয়। তবে চাঁদ সত্যি সত্যিই নীল দেখা যাবে কিনা এই প্রশ্ন যদি করা হয় তাহলে তার উত্তর হবে হয়ত নীল দেখা যাবে কিন্তু এটা তখনই সম্ভব যখন আগ্নেয়গিরি বিস্ফোরণের মতো কোনো ঘটনা ঘটবে। আগ্নেয়গিরি বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে বহু সূক্ষ্ম ধূলিকণা বায়ুর সাথে মিশে যাবে। এর ফলে হয়তো রিলের বিচ্ছুরণ সূত্র অনুযায়ী চাঁদের রং নীল দেখালেও দেখাতে পারে।

গ্রহণের প্রকারভেদ

সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ যাই হোক না কেনো তার সাথে ছায়া ব্যাপারটি জড়িত। এই ছায়ারও রয়েছে হরেক রকম ধরন। ছায়ার উপর নির্ভর করে গ্রহণেরও রয়েছে শ্রেণিবিন্যাস। ভূমিকা না করে শুরু করা যাক।

Umbra: এটির বাংলা হলো প্রচ্ছায়া। আলোক উৎসের সামনে কোন বস্তু রাখলে বস্তুটির ছায়া পড়ে। যে অংশটির ছায়া অধিক গাঢ় বা ছায়ার যে অংশটি অধিক অন্ধকার সে অংশটিই প্রচ্ছায়া অঞ্চল। আমাদের সূর্যকে একটি বিশালাকার গোলকরূপে বিবেচনা করি। ধরুন আমরা চাঁদের Umbra কোনটা সেটা দেখতে চাই। এখানে একটু জ্যামিতিক কৌশল কাজে লাগানো যাক। ধরুন সূর্যকে S এবং চাঁদকে M দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। এখন সূর্য ও চাঁদের সাধারণ স্পর্শক আকাতে চাই (সাধারণ স্পর্শক বলতে এমন একটি সরলরেখা যেটি সূর্য এবং চাঁদ দুটিকেই স্পর্শ করবে) সাধারন স্পর্শক আকালে দেখা যাবে দুইটি সাধারন স্পর্শক পাওয়া যাবে। এবার আলোকবিজ্ঞানের রশ্মিচিত্রের কথা ভাবুন তো। একটি বস্তু অসংখ্য বিন্দুর সমন্বয়ে গঠিত। তো বস্তুর প্রতিবিম্ব আঁকতে হলে আমরা কি প্রতিটি বিন্দুর জন্য রশ্মি চিত্র অঙ্কন করি? না। আমরা শুধু মাত্র বস্তুটির দুইটি বিন্দু নিই। ঐ দুইটি বিন্দুর প্রতিবিম্ব আকালেই বস্তুটির প্রতিবিম্ব সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। তেমনি সূর্য ও চাঁদের সাধারন স্পর্শক আঁকার জন্য সূর্যের উপর $A,\ B$ বিন্দু এমনভাবে নির্ণয় করা হলো যেন $A,\ B$ বিন্দু থেকে চাঁদের উপরও স্পর্শক হয়, এবং সূর্যের উপরেও হয়। ধরুন সাধারণ স্পর্শক AC এবং BD চাঁদকে E বিন্দুতে ছেদ করে। তাহলে CED যে অংশটি পাওয়া গেলো সেই অংশের কোথাও আপনি চোখ রাখলে S গোলকটি কিন্তু দেখতে পাবেননা। অর্থাৎ S গোলক থেকে আলো আসলেও দেখা যাবে না। CED এই অংশটিই হলো প্রচ্ছায়া অঞ্চল।

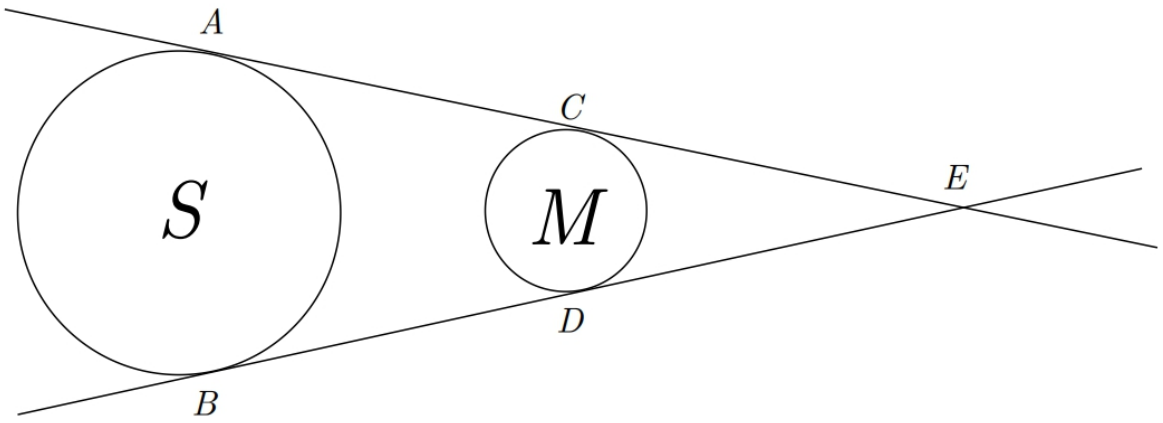

এবার বাকি দুইটি সাধারণ স্পর্শকের দিকে তাকালে দেখা যাবে স্পর্শক দুইটি S ও M গোলকের মাঝে E বিন্দুতে পরস্পরকে ছেদ করেছে। E তে ছেদ করার পর স্পর্শক দুটি চাঁদকে স্পর্শ করে ছড়িয়ে গেছে। আর মিলিত হয়নি। এই দুই সাধারণ স্পর্শকের মাঝের অঞ্চলটিই হলো Penumbra (umbra র অংশটুকু বাদ দিয়ে) । Penumbra কে বাংলায় উপচ্ছায়া বলা হয়। খেয়াল করে দেখুন, আপনি Penumbra র ভিতরে কোন স্থানে চোখ রেখে যদি S গোলকটি দেখতে চান তাহলে কিন্তু দেখতে পাবেন। দেখতে পাওয়া অর্থ S গোলক থেকে আলো আপনার চোখে আসা। তাই এ অংশকে ছায়া বলা হলেও এই অংশে ঠিকই সূর্যালোক দেখা যাবে। কিন্তু উজ্জ্বলতা একটু কম থাকবে, এই আর কি। নিচের চিত্রটিতে umbra এবং Penumbra দেখানো হয়েছে। (সূর্য ও পৃথিবীর জন্য)

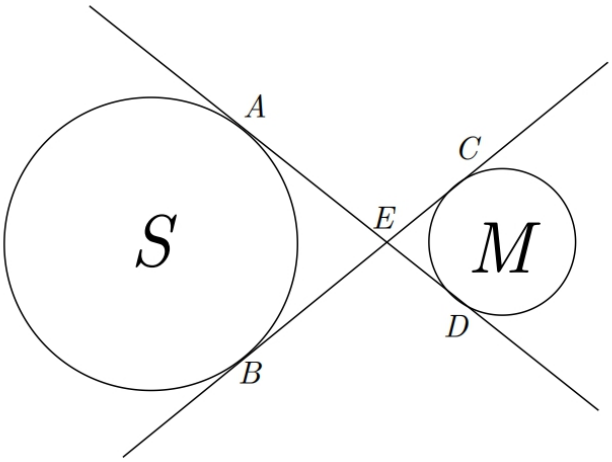

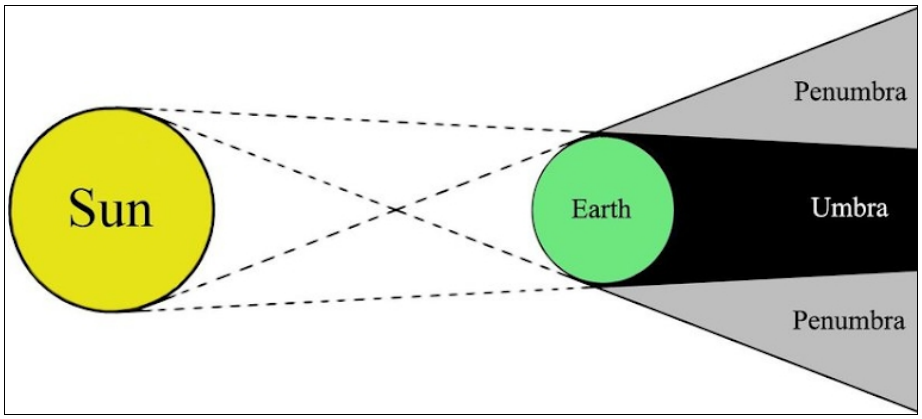

পৃথিবী এবং চাঁদের Umbra কত বড়ো? পৃথিবীর umbra কত বড়ো তা সাধারণ জ্যামিতি দিয়েই বের করা যায়। সদৃশকোণী ত্রিভুজের সুত্র ব্যবহার করে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে পৃথিবীর Umbra এর দৈর্ঘ্য বের করা যায়। (একই নিয়ম চাঁদের জন্যও প্রযোজ্য)

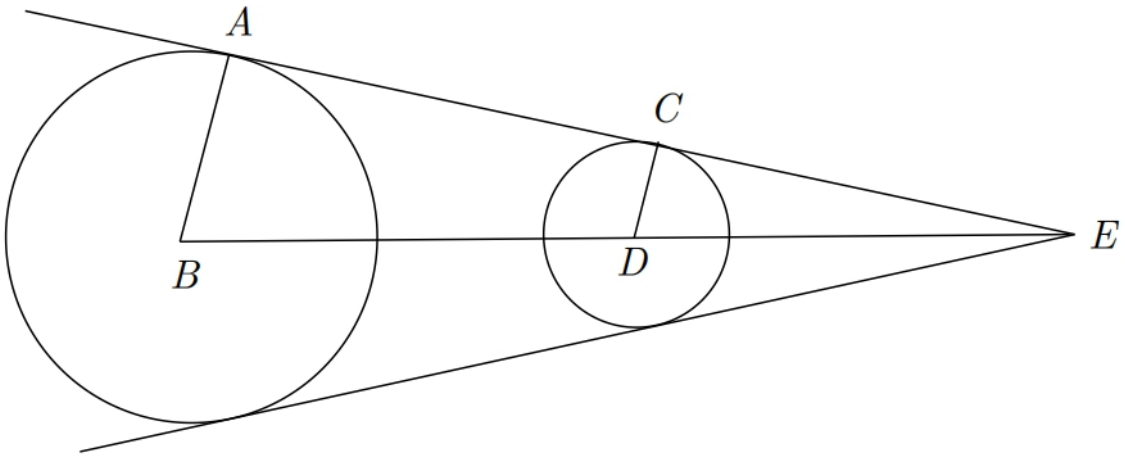

এখানে ত্রিভুজ ABE এবং ত্রিভুজ CDE সদৃশ।

তাই লেখা যায়,

$$\frac{AB}{CD} = \frac{BE}{DE}$$

বা, $\frac{AB}{CD} = \frac{BD+DE}{DE}$

বা,$DE = \frac{BD}{\left(\frac{AB}{CD}\right)-1}$

কিন্তু AB =সূর্যের ব্যাসার্ধ =696000 km. (প্রায় গড় মান)

এবং CD=পৃথিবীর ব্যাসার্ধ =6400 km (প্রায় গড় মান)

এবং BD=সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব = 149600000 km (প্রায়)

এবং DE = পৃথিবীর umbra র দৈর্ঘ্য যেটা বের করতে হবে।

উপরের সমীকরণে মান গুলো বসিয়ে পাই,

DE = 1388399.072 km

আবার পৃথিবী থেকে চাদের দূরত্ব প্রায় 384400 km. ধরি এটা d

তাহলে DE =3.611 d

আবার যেহেতু BD, d পরিবর্তনশীল তাই বলা যায় DE ও পরিবর্তনশীল। তাই মোটামুটি বলা যায়,পৃথিবীর Umbra র দৈর্ঘ্য পৃথিবী থেকে চাদের দূরত্বের 3.6-3.7 গুন দূরে অবস্থিত।

আরেক ধরনের ছায়া আছে। সেটার বাংলা হলো বিপরীত প্রচ্ছায়া বা Antumbra। এটা যথাসময়ে আলোচিত হবে। আমরা প্রথমে চন্দ্রগ্রহণ বিষয়ে জানবো। পরে সূর্যগ্রহণ। তবে তার আগে একটি কথা না বললেই নয়। সূর্য চাঁদের তুলনায় এত বড়ো হওয়া সত্ত্বেও সূর্যগ্রহনের সময় চাঁদ সূর্যকে ঢেকে ফেলে কীভাবে? নিচের চিত্রটি লক্ষ্য করুন। এখানে দেখা যাচ্ছে সূর্য চাঁদের চেয়ে 400 গুন বড়ো কিন্তু পৃথিবী থেকে সূর্য চাঁদের চেয়ে 400 গুন কাছে অবস্তিত হওয়ার কারণে আমাদের কাছে মনে হয় যেন চাঁদ এবং সূর্যের কৌণিক আকার একই। এই কৌণিক আকারের সমতার কারণে চাঁদ সূর্যকে পুরোপুরি ঢেকে ফেলতে পারে। অর্থাৎ সূর্যগ্রহণ হয়।

Total lunar eclipse: যখন চাঁদ পুরোপুরি পৃথিবী এবং সূর্য এর সরলরেখায় অবস্থান করে তখনই Total lunar eclipse দেখা যায়। এসময় চাঁদ পুরোপুরি Umbra অঞ্চলের ভিতরে অবস্থান করে। যেহেতু Umbra অঞ্চলটি গাঢ় ছায়া যুক্ত অঞ্চল এবং এই অঞ্চলে চাঁদ আসলে পুরোপুরি চাঁদের উপর পৃথিবীর ছায়া পড়ার সম্ভাবনা আছে। যখন পুরো চাঁদই পৃথিবীর ছায়া দ্বারা ঢেকে যায় তখনই পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণ হয়।

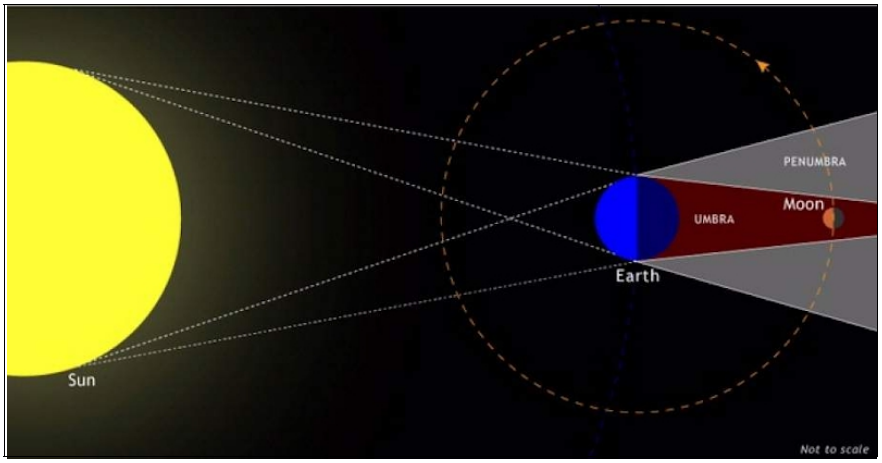

চিত্রঃ পূর্ণ চন্দ্রগ্রহনের প্রক্রিয়া

Total lunar eclipse এর সাতটি পর্যায় বা ধাপ রয়েছে।

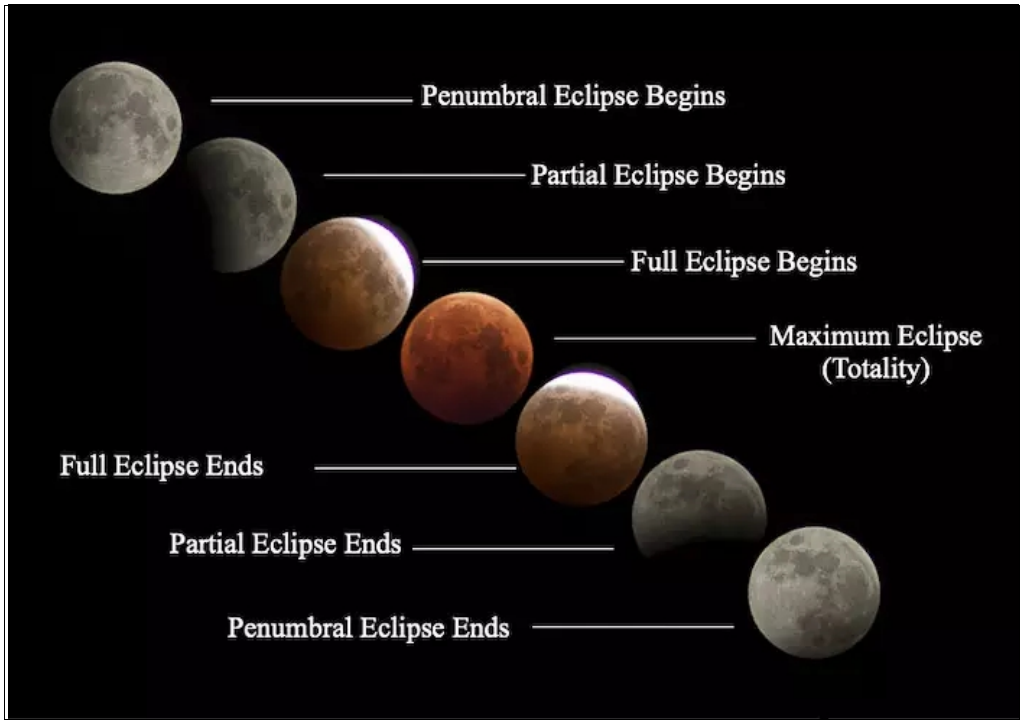

চিত্রঃ পূর্ণ চন্দ্রগ্রহনের ধাপসমূহ

পূর্ণ চন্দ্রগ্রহনের স্থায়ীত্বকাল অনেকক্ষণ। ২৬ জুলাই ১৯৫৩ সালে সর্বোচ্চ ১০০ মিনিট ৪৩ সেকেন্ডের পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণের সময় রেকর্ড করা হয়েছিলো। ১৮৫৯ সালের ১৩ আগস্ট ১০৬ মিনিট ২৮ সেকেন্ড সময় ধরে গ্রহণ হয়েছিলো। পরবর্তীতে ৪৭৫৩ সালের ১৯ আগস্ট যে গ্রহণটি হবে সেটির স্থায়িত্বকাল হবে ১০৬ মিনিট ৩৫ সেকেন্ড। এখানে একটি কথা বলে রাখি। পূর্ণগ্রহণের স্থায়ীত্বকাল বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে কতক্ষণ সময় ধরে চাঁদ Umbra অঞ্চলে থাকবে। কিন্তু আমরা উপরে গ্রহণের ৭ টি ধাপ থেকে দেখে এসেছি যে চাঁদ Umbra অঞ্চলে আসার আগে Penumbra অঞ্চল অতিক্রম করে আসে। তাই টোটাল সাতটি পর্যায় অতিক্রম করতে যে সময়, লাগে বলা যেতে পারে সেটাই গ্রহণের মোট সময়। উপরে বর্নিত সময়গুলো শুধুমাত্র Umbra অঞ্চলে কতক্ষণ থাকবে সেটা। ১০০০ থেকে ৩০০০ সালের মাঝে

২০০০ সালের ১৬ জুলাই তারিখে সর্বোচ্চ ২৩৫.৯৯ মিনিট স্থায়ী চন্দ্রগ্রহণ হয়েছিলো। তাহলে আশা করি বোঝা গেলো Total lunar eclipse কি।

Partial lunar eclipse: যখন চাঁদ পুরোপুরি পৃথিবী ও সূর্যের সরলরেখায় আসেনা বরং আংশিকভাবে চাঁদ পৃথিবীর ছায়া দিয়ে গমন করে তখনই আংশিক চন্দ্রগ্রহণ দেখা যায়। অর্থাৎ এখানে চাঁদের এক অংশ Umbra এবং অপর অংশ Penumbra এর মাঝে থাকে। নিচের চিত্র হতে Partial lunar eclipse এ চাঁদের গতিপথ বোঝা যাবে।

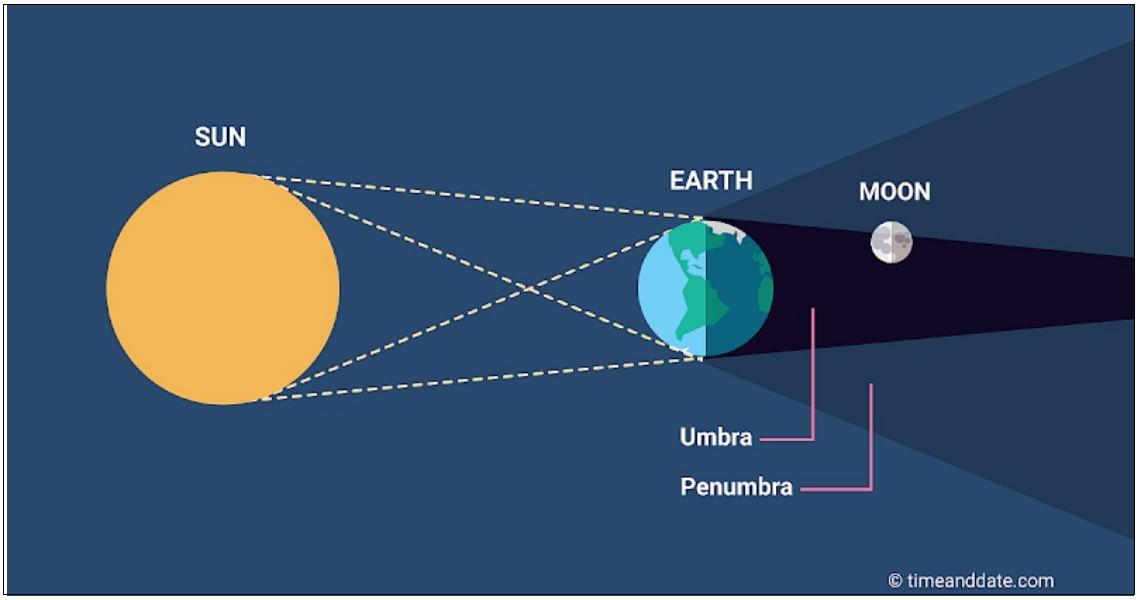

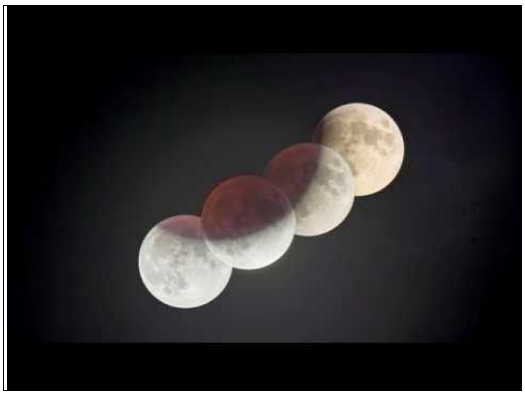

এই ধরনের চন্দ্রগ্রহনের ধাপ 5 টি।

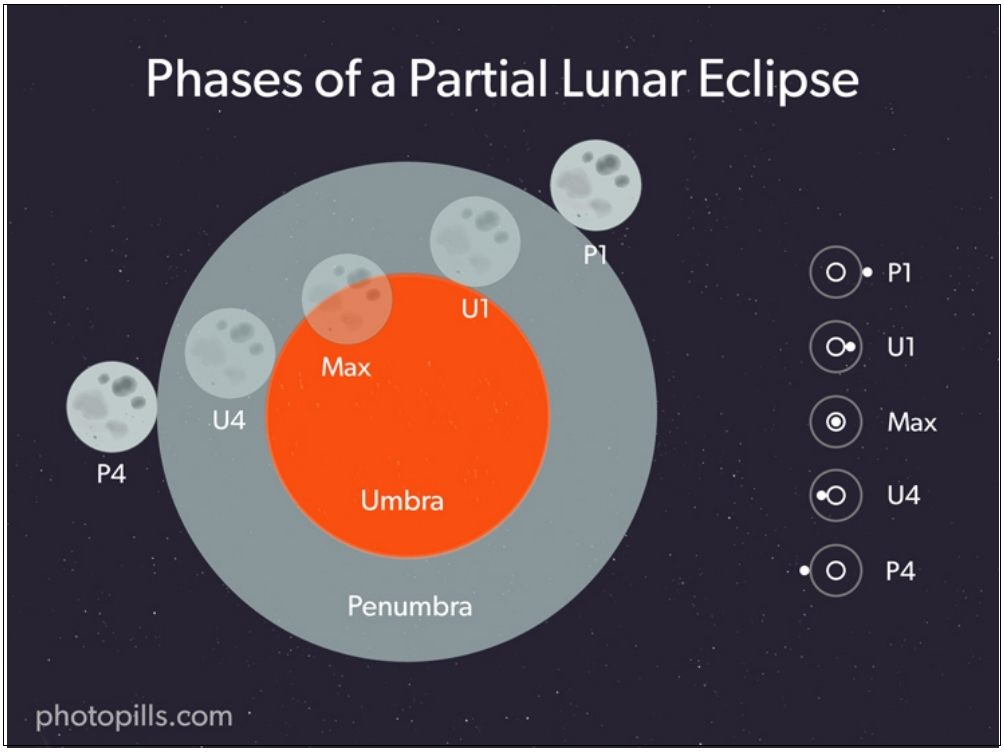

Penumbral lunar eclipse: Penumbral lunar eclipse আংশিক কিংবা পূর্ণ হতে পারে (partial or total)।

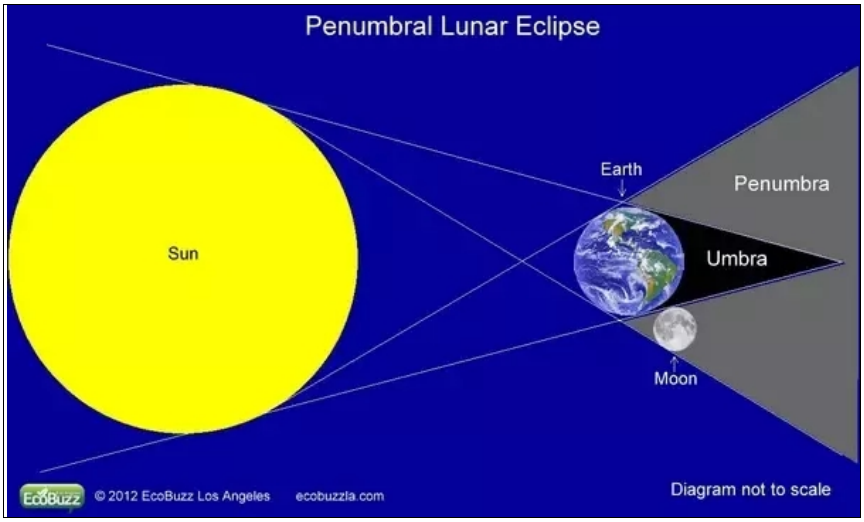

Penumbral lunar eclipse এর সময় চাঁদের আলো কিন্তু তেমন একটা হ্রাস পায় না। কারণ আগেই বলেছিলাম Penumbra হলো তুলনামূলক কম গাঢ় ছায়া যুক্ত অঞ্চল। এখানে চাঁদের উজ্জ্বলতা খুব সামান্যই কমে। খালি চোখে অনেকসময় বোঝাও যায়না যে গ্রহণ হচ্ছে।

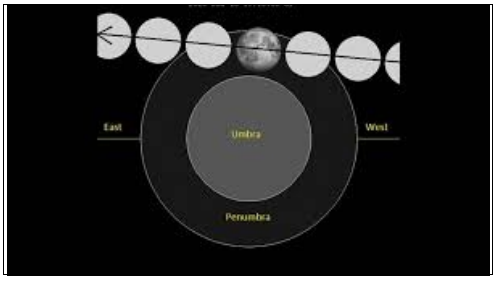

চিত্রঃ penumbral lunar eclipse এর সময় চাঁদের উজ্জ্বলতার পার্থক্য খালি চোখে ভালো বোঝা যায় না

Central lunar eclipse: এটি একধরনের Total lunar eclipse কিন্তু Total lunar eclipse এর সাথে এর সামান্য পার্থক্য আছে। চাঁদ যখন পৃথিবীর ছায়ার (Umbra) কেন্দ্র দিয়ে গমন করে তখন সেই গ্রহণকে central lunar eclipse বলে। নিচের চিত্রে কমলা বর্ণের অংশটিতে Central lunar eclipse ঘটেছে কিন্তু সবুজ এবং লাল অংশটিতে total lunar eclipse ঘটেছে।

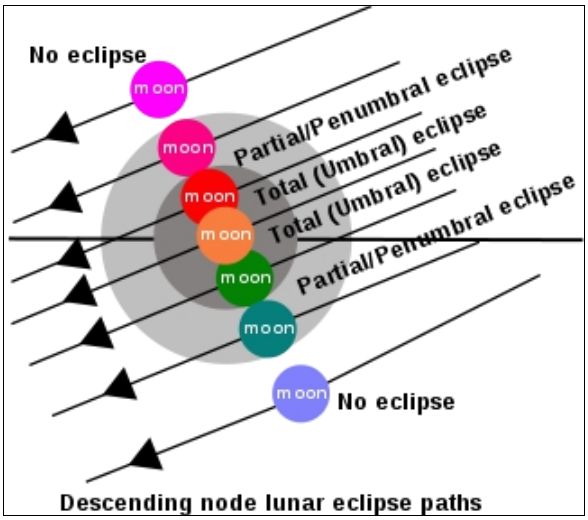

তাহলে একাডেমিক বইয়ের ভাষায় একটা কথা বলা যায়! Central মানেই Total কিন্তু Total মানেই Central নয়। স্বাভাবিকভাবেই central lunar eclipse এর স্থায়ীত্বকাল বেশি হবে কারণ খেয়াল করলে বোঝা যাবে এই ধরনের চন্দ্রগ্রহণের সময়ই চাঁদ পৃথিবীর ছায়ার ভিতর দিয়ে সবচেয়ে বেশি পথ অতিক্রম করে।

আরেক ধরনের ছায়া আছে। সেটা হলো Antumbra। Antumbra নিয়ে আলাদাভাবে তেমন কিছু বলার নেই। এটিও আপনি যদি Penumbra এবং Umbra বুঝে তা কেন তাহলে নিচের চিত্র থেকে Antumbra (বিপরীত প্রচ্ছায়া) কি ধরনের ছায়া সেটা বোঝা যাবে।

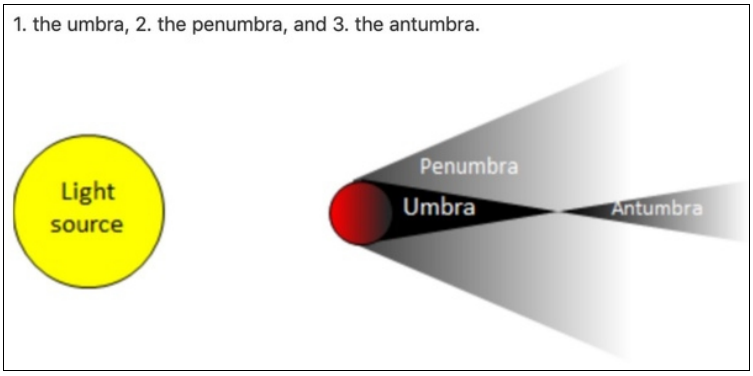

তাহলে বলুন তো চাঁদ যদি Antumbra এর মাঝ দিয়ে গমন করে তাহলে সেই গ্রহনকে কি গ্রহন বলবো? নিশ্চই Antumbral lunar eclipse।

দাড়ান। একটু ভুল হলো।

আমরা পৃথিবীর Umbra এর দৈর্ঘ্য হিসাব করে দেখেছিলাম, পৃথিবীর umbra র দৈর্ঘ্য পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্বের 3.7 গুন! তাহলে চাঁদ তো কখনই পৃথিবীর Antumbra র ভিতর দিয়ে যেতে পারবে না। এ কারণে Antumbral lunar eclipse হয় না কিন্তু Solar eclipse হয়।

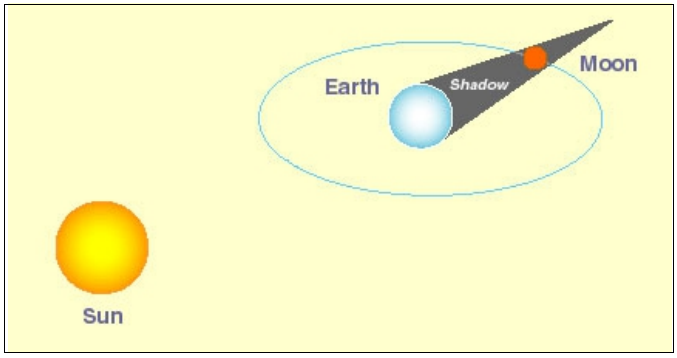

চিত্রঃ পৃথিবীর Umbra র দৈর্ঘ্য এতই বড়ো যে তা চাঁদের কক্ষপথকে ও ছাড়িয়ে যায়। তাই কখনই Antumbral lunar eclipse হয়না।

এবার চোখ বোলানো যাক সূর্যগ্রহণের দিকে। যেহেতু চন্দ্রগ্রহণের আলোচনায় আমরা ছায়া সম্পর্কে মোটামুটি জেনে এসেছি তাই এখানে পুনরায় ছায়ার প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করব না। সূর্যগ্রহণের সময় চাঁদের ছায়াই মুখ্য (Saros দ্রষ্টব্য)। কয়েক ধরনের সূর্যগ্রহণ হতে পারে।

Total and partial solar eclipse: পুরো সৌরচাকতিটি যখন চাঁদের আড়ালে ঢাকা পড়ে যায় তখন হয় পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ বা Total solar eclipse। নিচের চিত্রটি মন দিয়ে খেয়াল করুন।

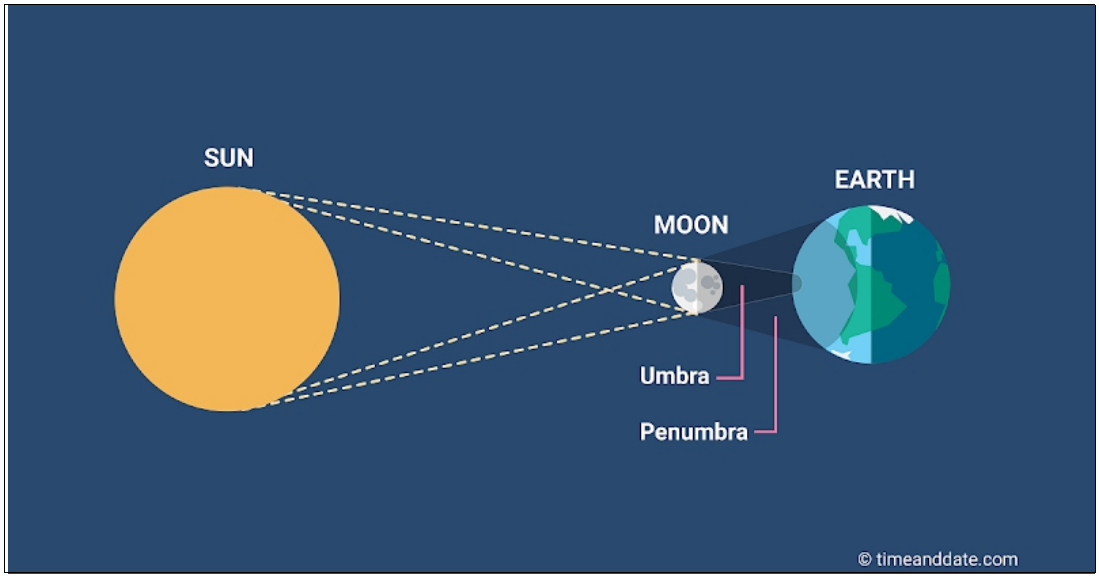

চিত্রে চাঁদের Umbra এবং Penumbra দেখানো হয়েছে। দেখা যাচ্ছে যে পৃথিবীর কিছু অংশ চাঁদের Umbra র ভিতরে পড়েছে এবং কিছু অংশ পড়েছে Penumbra এর ভিতর। Penumbra এর ভিতরে বেশি অংশ এবং Umbra র ভিতরে কম অংশ। Umbra অন্ঞ্চ কোন পর্যবেক্ষকের চোখে সূর্যের আলো পৌঁছাবে না। (চন্দ্রগ্রহণের সময় বলা হয়েছিলো)। ফলে তার কাছে মনে হবে সূর্য পুরোপুরি ঢেকে গেছে। অর্থাৎ পৃথিবীর যে অংশ চাঁদের Umbra র ভিতরে পড়বে সে অংশের লোকজন সূর্যকে পুরোপুরি ঢেকে যেতে দেখবে। তাদের কাছে মনে হবে যেন পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ হলো। তারাই এই ঘটনার সাক্ষী হবে। কিন্তু বাকি অংশের লোকেরা কি দেখবে যে অংশটি চাঁদের Penumbra র ভিতরে পড়েছে? তারা যেটা দেখবে সেটা হলো আংশিক সূর্যগ্রহণ। নিচের চিত্রটি দেখুন।

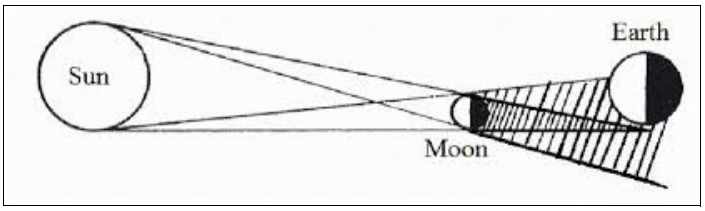

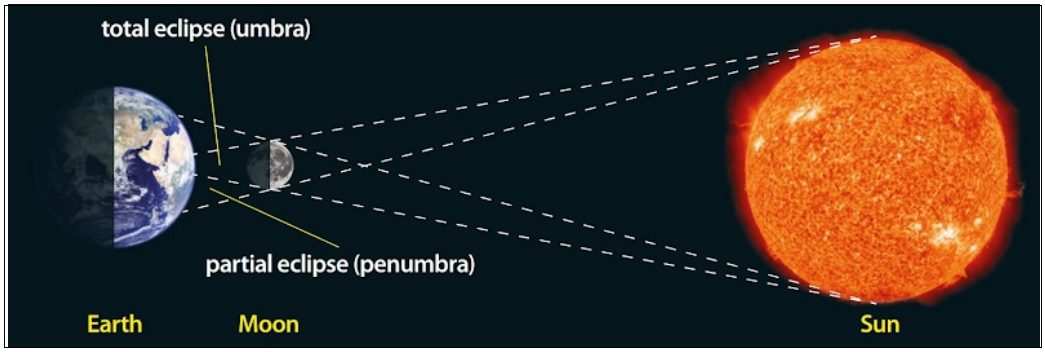

এখানে পৃথিবীর যে অংশটি চাঁদের Penumbra র আওতাভুক্ত সে অংশটিতে সূর্যের আলো কিন্তু পুরোপুরি আসতে পারছেনা। সূর্যের একাংশ থেকে আলো আসলেও আরেক অংশ চাঁদের আড়ালে থেকে যাচ্ছে। তাই Penumbra র আওতাভুক্ত লোকজন দেখবে সূর্য আংশিকভাবে আলো দিচ্ছে, আংশিকভাবে অন্ধকার। এটাই Partial solar eclipse (আংশিক সূর্যগ্রহণ)। আপনি যদি আবারও চিত্রের দিকে লক্ষ্য, করেন তাহলে দেখবেন Umbra র শেষের অতি চিকন একটি অংশ পৃথিবীর উপর পড়েছে। ফলে Umbra দ্বারা পৃথিবীর উপর কম অংশে ছায়া পড়ছে। তাই umbra দ্বারা ছায়া

পড়া অন্ঞ্চলের লোকজন খুবই ভাগ্যবান কারণ তারাই একমাত্র পূর্ণগ্রাসের সাক্ষী হতে পারবে। দেখাই যাচ্ছে পৃথিবীর যত অংশে গ্রহণ দেখা যাবে তার অধিকাংশ জায়গায় আংশিক সূর্য গ্রহণ দেখা যাবে (যেহেতু অধিকাংশ জায়গা Penumbra দ্বারা ঢাকা) । কিন্তু পূর্ণ সূর্যগ্রহণ দেখা যাবে খুব কম এলাকায়। তাই কোন নির্দিষ্ট এলাকার জন্য পূর্ণ সূর্যগ্রহণ খুব দুর্লভ।

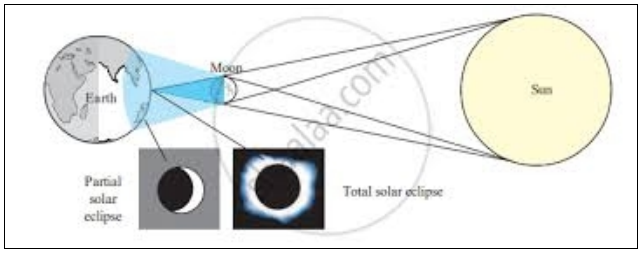

চিত্রঃ ২০১৭ সালের ২১ আগস্ট এর সূর্যগ্রহণ কোথায় কেমন দেখা যাবে তার চিত্র এটি। পূর্ণগ্রাস শুধুমাত্র মাঝের গাঢ় অংশটিতেই দেখা যাবে । এ থেকেই বোঝা যায় কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলে পূর্ণগ্রাস দুর্লভ কেন।

Annular solar eclipse: বাংলায় বলা হয় বলয়গ্রাস সূর্যগ্রহণ। Antumbra বা বিপরীত প্রচ্ছায়ার কারণে ঘটে এটি। চন্দ্রগ্রহণ কেন বিপরীত প্রচ্ছায়া দ্বারা হতে পারে না তা দেখেছি আমরা। কিন্তু চাঁদের Umbra মাত্র ৩৮০০০০ কিলোমিটার লম্বা। অন্যদিকে পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব ৩৬৩১০৪ কিলোমিটার থেকে ৩৮৪৪০০ কিলোমিটার পর্যন্ত পরিবর্তিত হতে পারে। পৃথিবী সূর্যগ্রহনের সময় চাঁদ থেকে ৩৬৩১০৪-৩৮০০০০ কিলোমিটার এর মধ্যে থাকলে বুঝতে হবে পৃথিবী চাঁদের Umbra র ভিতরে আছে। এসময়ই একমাত্র পূর্নগ্রাস হওয়া সম্ভব। কিন্তু পৃথিবী যদি গ্রহণের সময় চাঁদের থেকে ৩৮০০০০ -৩৮৪৪০০ কিলোমিটার দূরে থাকে তাহলে তাহলে আমরা বলতে পারি পৃথিবী চাঁদের Umbra র ভিতরে নেই।

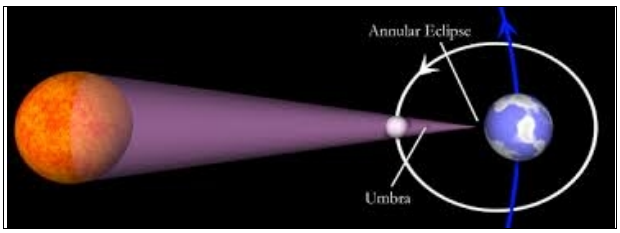

চিত্রঃ পৃথিবী চাঁদের প্রচ্ছায়ার বাইরে চলে গেছে ।

আবার আমরা দেখেছি যে Antumbra, Umbra র ঠিক পর থেকেই শুরু হয়। তাহলে কি দাড়ালো? পৃথিবী যদি চাঁদের Umbra এর ভিতর না থাকে তাহলে বলতে পারি পৃথিবী চাঁদের Antumbra এর ভিতরে আছে। তখন পৃথিবীর কোন এলাকা যদি Antumbra র ভিতরে পড়ে তখন ঐ এলাকা/অঞ্চলে যে গ্রহনটি হয় সেটিই বলয়গ্রাস সূর্যগ্রহণ।

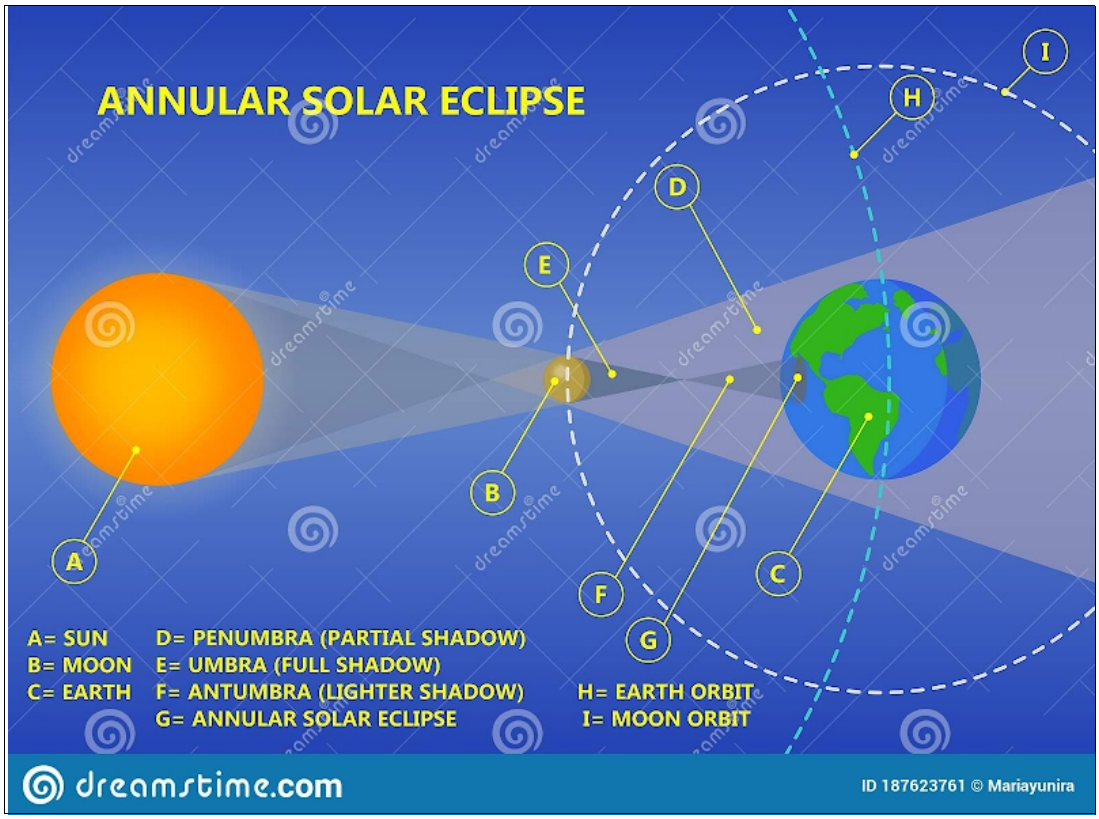

চিত্রঃ পূর্ণগ্রাস, আংশিক, বলয়গ্রাস

এরপর আছে Hybrid solar eclipse। একে Annular-total solar eclipse ও বলা হয়। এটি একটি বিশেষ ধরনের সূর্যগ্রহণ এবং ধরতে পারেন খুবই দুর্লভ। এই সূর্যগ্রহণের সময় পৃথিবীর মানুষেরা একই সাথে পূর্ণ সূর্যগ্রহণ, বলয়গ্রাস সূর্যগ্রহণ এবং আংশিক গ্রহণ পর্যবেক্ষণ করতে পারে। মনে হতে পারে, পূর্ণ এবং আংশিক তো একই সাথে দেখাই যায়

কিন্তু তার সাথে বলয় গ্রাস কিভাবে সম্ভব? এখানে একটি কথা বলে রাখা ভালো যে, একই সাথে কিন্তু পৃথিবীবাসী আংশিক+পূর্ণ+বলয় দেখতে পাবে না। এক অংশে আংশিক+পূর্ণ এবং আরেক অংশে বলয়+আংশিক এমনভাবে সূর্যগ্রহণ দেখা যাবে। তার আগে চলুন দেখা যাক কীভাবে একটি বলয়গ্রাস সূর্যগ্রহণকে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ আকারে দেখা যায়। আমরা আগেই দেখেছি, বলয় গ্রাস সূর্যগ্রহণের সময় পৃথিবী চাঁদের Umbra এর বাইরে চলে যায়। কিন্তু পূর্ণগ্রাসের সময় পৃথিবী চাঁদের Umbra এর ভিতরেই থাকে। এবার ধরুন কোন একদিন বলয়গ্রাস সূর্যগ্রহণ হলো (আপনার স্থানে). তাহলে আপনি যদি উপরের দিকে উঠতে থাকেন তাহলে আপনি আসলে চাঁদের Umbra র প্রান্তভাগের দিকে যাচ্ছেন, অন্য কথায় আপনি উপরের দিকে উঠতে থাকলে Antumbra ছেড়ে যাচ্ছেন। যেহেতু আপনি Antumbra ছেড়ে যাচ্ছেন এবং Umbra এর কাছাকাছি যাচ্ছেন তাই আপনি যত উপরে উঠবেন ততই দেখবেন গ্রহনটি বলয়গ্রাস হতে ধীরে ধীরে পূর্ণগ্রাসে রূপ নিচ্ছে। উপরের অংশটুকু আবারও পড়ুন এবং নিচের চিত্রটি থেকে বোঝার চেষ্টা করুন।

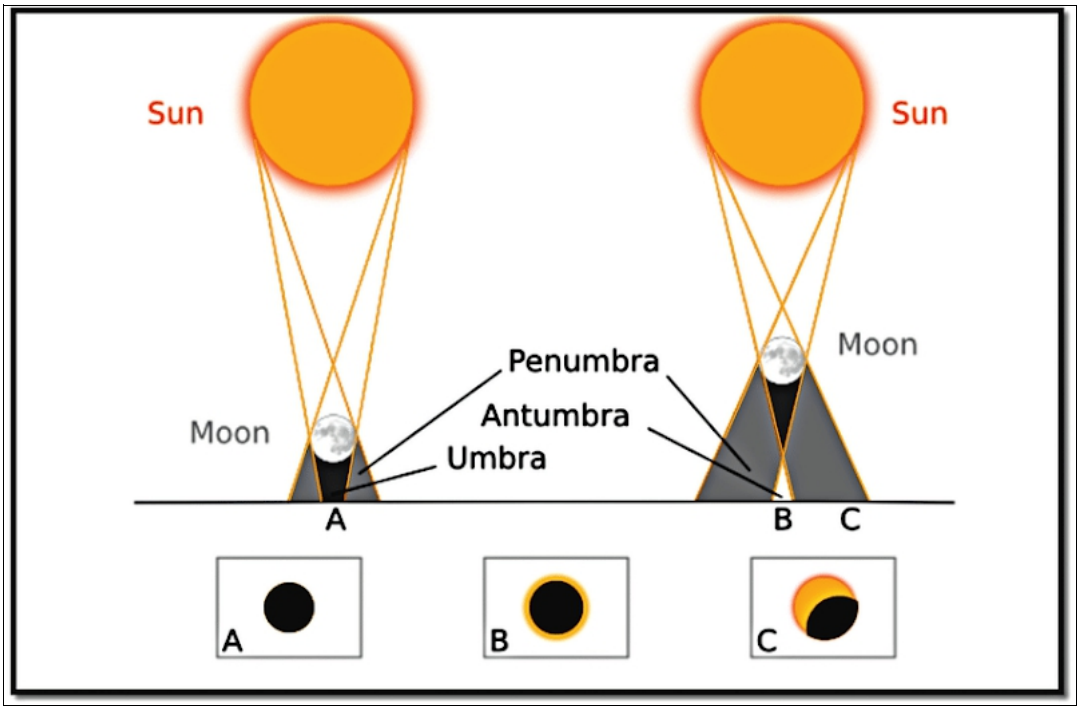

চিত্রঃ B অংশটি Antumbra র ভিতরে ।তাই এখানে বলয়গ্রাস হবে । কিন্তু আপনি যদি B থেকে উপরের দিকে যেতে থেকেন তাহলে আপনি আসলে Umbra র দিকে যাচ্ছেন ।

তাহলে মোটামুটি একটি ব্যাপার পরিষ্কার। সেটা হলো চাঁদ হতে একটু বেশি দূরে চলে গেলে (একটু বেশি দূরে বলতে umbra র বাইরে) বলয়গ্রাস্রাস দেখা যাবে কিন্তু চাঁদের কাছাকাছি থাকা অবস্থায় দেখা যাবে পূর্ণগ্রাস। এখানে একটি কথা মনে করিয়ে দিই। বলয় এবং পূর্ন যাই হোক না কেন সাথে আংশিক কিন্তু হবে। তবে সেটা আপাতত বলছিনা। তো ফিরে যাই হাইব্রিড গ্রহনে। হাইব্রিড সূর্যগ্রহণ চাঁদের ছায়ার পরিবর্তন+পৃথিবীর বক্রতা এর উপর ভিত্তি করে হয়।গ্রহনের সময় চাদ, পৃথিবী তো আর তাদের গতি কমাবে না। গতিশীল থাকবে।

চাঁদ যখন গ্রহণের সময় গতিশীল থাকে তখন স্বাভাবিকভাবে চাঁদের ছায়াও পৃথিবী পৃষ্ঠ বরাবর গতিশীল থাকবে। চাঁদের ছায়ার এই গতিপথে যদি পৃথিবীর কোন কোন অংশ চাঁদের Umbra র ভিতরে পড়ে এবং কোন কোন অংশ Antumbra র ভিতরে পড়ে তাহলে umbral অংশটুকুতে পূর্ণগ্রাস এবং Antumbra অংশটুকুতে বলয়গ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখা যাবে। পৃথিবীর একটি নিজস্ব বক্রতা আছে **(আপনি সমতল পৃথিবীতে বিশ্বাসী হলে কেটে পড়ুন)** এই বক্রতার কারণে পৃথিবীর

সব অংশ চাঁদ থেকে সমান দূরত্বে থাকে না। কোন কোন অংশ চাঁদের কাছে থাকে এবং কোন কোন অংশ চাঁদের থেকে দূরে চলে যায়। এমতাবস্থায় চাঁদের কাছের অংশটিতে যদি চাঁদের umbra র প্রায় শেষ প্রান্ত স্পর্শ করে তাহলে তো বলাই যায় যে সেখানে পূর্ণগ্রাস দেখা যাবে কিন্তু ছায়া যদি সরে আসে তাহলে তো আর Umbra র প্রান্তভাগ পৃথিবীতে পড়বে না। বরং তখন Antumbra র অংশটি পৃথিবীতে পড়বে। তখন সেই সব অন্ঞ্চলে দেখা যাবে বলয়গ্রাস সূর্যগ্রহণ।

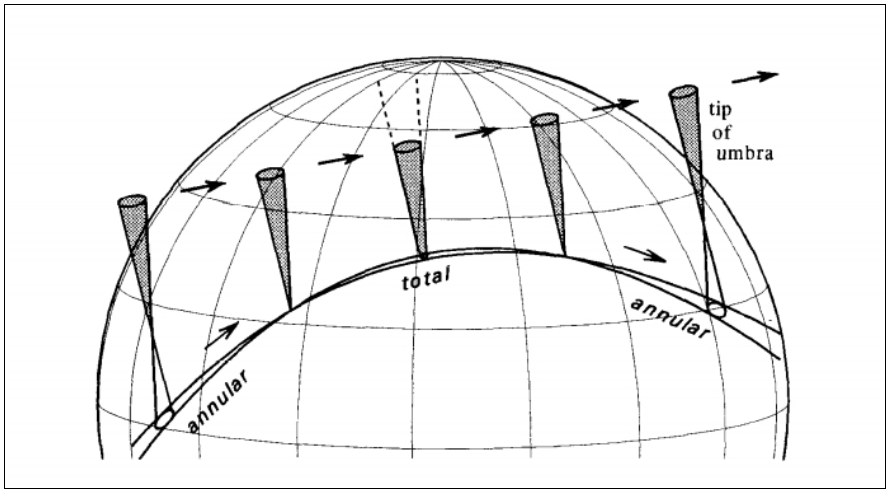

চিত্রঃ চাঁদের ছায়ার গতিপথ

অর্থাৎ সেই আগের উদাহরনটির মতো। চাঁদের কাছাকাছি = পূর্ণ কিন্তু চাঁদ থেকে দূরে =বলয়গ্রাস।

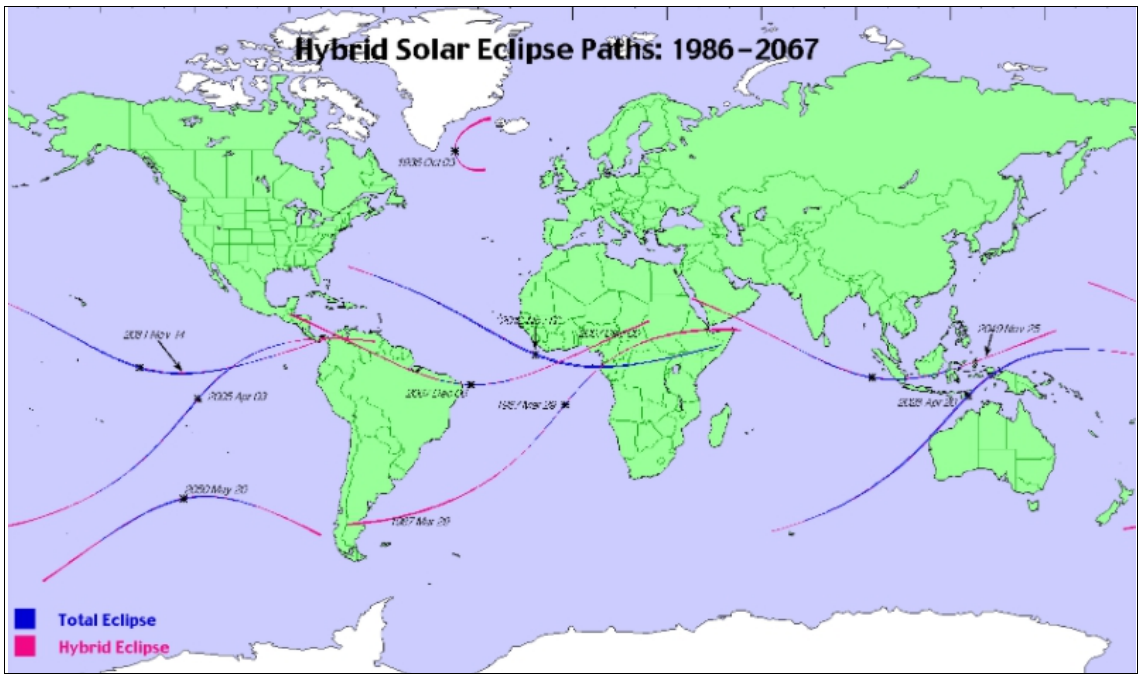

চিত্রঃ শুধুমাত্র গোলাপি রঙে নির্দেশিত অংশেই হাইব্রিড গ্রহন দেখা যাবে। (১৯৮৬-২০৬৭)। **বাংলাদেশ নেই!**

গ্রহণ কতক্ষণ স্থায়ী হয় সেটা সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের জন্য আলাদাভাবে ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। সূর্যগ্রহণের সময় পৃথিবীর উপর চাঁদের ছায়া পড়ে। এদিকে চাঁদের Umbra র গতিবেগ ঘন্টায় ১৭০০ কিমি (প্রায়) এত বেশি গতিবেগ হওয়ার কারণে চাঁদের ছায়া পৃথিবীর উপর দিয়ে খুব দ্রুত গমন করে। চাঁদের Umbra অতিক্ষুদ্র শীর্ষ এ কারণে দ্রুতই গমন করে (কারণ

চাঁদের Umbra র দৈর্ঘ্য বেশি নয়) তাই গ্রহণ তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায় (৭ মিনিটের মতো) কিন্তু চন্দ্রগ্রহণের সময় চাঁদের গতিবেগ বেশি হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবীর Umbra অনেক বড়ো এবং চওড়াও বটে। ফলে চাঁদ ঐ 1700km/h গতিবেগে চলা সত্ত্বেও পৃথিবীর Umbra এর ভিতর দিয়ে অতিক্রম করতে সময় দরকার হয় একটু বেশি। তাই চন্দ্রগ্রহণ একটু বেশি স্থায়ী হয়।

কোনো একটি স্থানে চন্দ্রগ্রহণের পরিমাণ বেশি কিন্তু সূর্যগ্রহণের পরিমাণ কম কেনো? কোনো স্থানের জন্য পূর্ণসূর্যগ্রহণ কেন দূর্লভ সেটা ইতোমধ্যে বলা হয়েছে। ঠিক ঐ কারণে কোন স্থানে পূর্নসূর্যগ্রহণের পরিমাণও কম। কিন্তু চন্দ্রগ্রহণের সময় চাঁদের দিকে পৃথিবীর যে অংশটি রয়েছে সে অংশের প্রায় সব মানুষের কাছেই মনে হবে যেন পূর্ন চন্দ্রগ্রহণ (অন্য কোন ধরনের হতে পারে) হচ্ছে।

এই টপিকের আলোচনা আপাতত এখানেই শেষ। কিন্তু গ্রহণের আলোচনা কিন্তু এখনও শেষ হয়নি! বাকি আলোচনার জন্য আমাদের জানতে হবে অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ এবং সময় সম্পর্কে। ততক্ষন সাথেই থাকুন।

আমাদের পৃথিবী এবং কিছু পরিমাপ

কোন একটি তারকা পৃথিবীর সবজায়গা থেকে একই স্থানে দেখা যায় না। যেমন কালপুরুষ নক্ষত্রমন্ডল হয়ত আপনার স্থানে মাথার উপরে দেখা যায় কিন্তু পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে সেটা মাথার উপর দেখা নাও যেতে পারে। আপনার ঘড়িতে এখন বিকাল ৪ টা বাজে। কিন্তু পৃথিবীর সবার ঘড়িতে তো আর বিকাল ৪ টা বেজে নেই। পৃথিবীর এক এক স্থানের ঘড়ির পাঠ এক এক রকম। বাংলাদেশে সূর্যগ্রহণ হলো কিন্তু রাশিয়ার লোকজন দেখতে পারলো না। এরকমভাবে এক এক জায়গায় তারার অবস্থান, সময় কিংবা মহাজাগতিক ঘটনাগুলোর বিভিন্নতা রয়েছে। আর সেটা বোঝার জন্য পৃথিবীর অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ সম্পর্কে ধারণা থাকা জরুরি।

precession নামক অধ্যায়ে পৃথিবীর বিষুব রেখা কোনটা, পৃথিবীর উত্তর মেরু এবং দক্ষিণ মেরু কোনটা, কেন এসব নিয়ে বলা হয়েছিল। তো এবার আর এসব নিয়ে আলোচনা না করে সরাসরি পৃথিবী নামক গোলকের জ্যামিতিক চিত্র শুরু করা যাক।

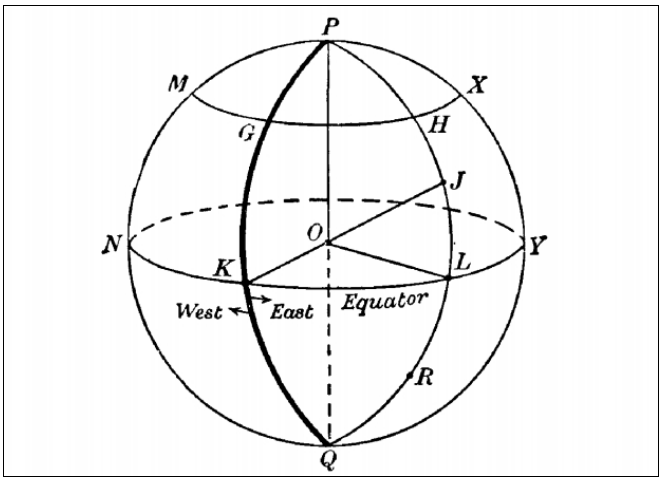

চিত্রে PQ পৃথিবীর ঘূর্ণন অক্ষ। ঘূর্ণন অক্ষের সাথে লম্ব ভাবে রয়েছে পৃথিবীর বিষুবরেখা। চিত্রে বিষুবরেখা (equator) $NKLY$ দ্বারা দেখানো হয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে $NKLY$ হলো পৃথিবীকে সমান দুই ভাগে ভাগ করা একটি বৃহদাকারের বৃত্ত। উত্তর মেরু P এবং দক্ষিণ মেরু Q। এই P এবং Q বিন্দুগামী যেকোন বৃহৎ বৃত্তকে মধ্যরেখা বলা হয়। যেমন চিত্রটিতে $PGKQ$ একটি মধ্যরেখা। $PHJLRQ$ একটি মধ্যরেখা। এগুলো মধ্যরেখা কারণ এগুলো P এবং Q বিন্দুগামী। $MGHX$ কোন মধ্যরেখা নয় কারণ $MGHX$ বৃত্তটি $P,\ Q$ বিন্দুগামী নয়। পৃথিবীর কোন স্থান নির্দিষ্ট করতে এই মধ্যরেখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীর কোন একটি স্থান নির্দিষ্ট করার জন্য একটি প্রমাণ মধ্যরেখা ধরতে হয় যার সাপেক্ষে অন্যান্য মধ্যরেখাগুলো চিহ্নিত করা যাবে। ধরি $PGKQ$ মধ্যরেখাটি প্রমান মধ্যরেখা (Standard meridian)। [এটি সেই মধ্যরেখা যেটি গ্রিনিচ মানমন্দির দিয়ে গেছে] ধরি $PHJLRQ$ আরেকটি মধ্যরেখা (প্রমান মধ্যরেখা নয়)। O হলো পৃথিবীর কেন্দ্র। তাহলে কোণ KOL কে বলা হবে $PHJLRQ$ মধ্যরেখাটির Longitude(দ্রাঘিমাংশ)। যদি কোন মধ্যরেখা প্রমান মধ্যরেখার পূর্বদিকে অবস্থিত থাকে তখন Longitude এর মানের পর East/E এবং যদি মধ্যরেখাটি প্রমান মধ্যরেখার পশ্চিম দিকে অবস্থান করে তাহলে Longitude এর মানের পর West/W যোগ করতে হয়।

East এবং West এর দিক চিত্রে দেখানো হয়েছে। যেমন, ঢাকা শহরের কোন এক স্থানের Longitude এর মান 90.4125° East। এর অর্থ ঢাকা শহরের ঐ স্থানটি প্রমান মধ্যরেখা (গ্রিনিচ) থেকে পূর্বদিকে 90.4125° দূরে অবস্থিত।একটি ব্যাপার লক্ষ্যনীয় যে $H,\ J,\ L,\ R$ প্রতিটি বিন্দুরই দ্রাঘিমাংশের মান একই। এবং তা হলো কোণ KOL। এবার ধরুন, পৃথিবীর উপর কোন একটি স্থান J দ্বারা চিহ্নিত। তাহলে কোণ LOJ কে latitude বা অক্ষাংশ বলা হয়। যদি J বিন্দুটি উত্তরদিকে থাকে(সঠিকভাবে বলতে গেলে উত্তর গোলার্ধে) তাহলে Latitude এর মানের পরে North বা N লিখতে হয়। দক্ষিণদিকে থাকলে South বা S লিখতে হয়। যেমন চিত্রে J বিন্দুটি উত্তর গোলার্ধে এবং R বিন্দুটি দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থিত। আমি যে স্থানে আছি সে স্থানের Latitude 22.845° N. এর অর্থ আমি উত্তর গোলার্ধে আছি এবং বিষুবরেখা থেকে 22.845° কৌণিক দূরত্বে আছি। অন্যকথায় আমার জন্য কোণ LOJ এর মান 22.845°। অক্ষাংশ ছাড়াও আরেকটি টার্ম আছে। সেটি হলো অক্ষকোটি। চিত্রে J বিন্দুর অক্ষাংশ LOJ কিন্তু অক্ষকোটি হলো কোণ POJ। অক্ষকোটির ইংরেজি নাম Colatitude। চিত্র হতে, কোন স্থানের (J) অক্ষাংশ(LOJ) +কোন স্থানের অক্ষকোটি (POJ) = 90°(POL)

পৃথিবীর ঘূর্ননের ব্যাপারটি তারা দেখেই বোঝা যায়। তারাগুলো পূর্বদিকে ওঠে এবং পশ্চিমে অস্ত যায়। তাই পৃথিবী আসলে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকেই ঘুরছে। এ গতিকে বলা হয় আহ্নিক গতি। পৃথিবী নিজ অক্ষের চারপাশে ঘুরে আসতে সময় নেয় প্রায় ২৪ ঘন্টা (প্রায় বলেছি) বা ১৪৪০ মিনিট। এখন, আমরা জানি পুরো বিষুবরেখাটি পৃথিবীর কেন্দ্রে ৩৬০° কোণ তৈরি করে। তাই 1° এর জন্য সময় ব্যবধান হয় 1440/360=4 মিনিট। আবার যেহেতু পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ঘোরে তাই পূর্বদিকের অংশটি আগে সূর্য ওঠা, চাঁদ ওঠা দেখতে পারে। অন্য কথায় পূর্ব দিকের স্থানীয় সময় এগিয়ে যায়। সেই কারণে পশ্চিম দিকের স্থানীয় সময় পিছিয়ে যায়। আমরা দেখেছিলাম ঢাকার শহরটির দ্রাঘিমাংশ 90.4125°E। যেহেতু 1° এর জন্য সময়ের পার্থক্য 4 মিনিট, তাই 90.4125° এর জন্য গ্রিনউইচের সাথে সময়ের পার্থক্য 90.4125×4=361.65 মিনিট বা 6 ঘন্টা 1 মিনিট 39 সেকেন্ড। আবার যেহেতু শহরটি East এ অবস্থিত তাই ঢাকার সময় এগিয়ে থাকবে। (প্রায় ৬ ঘন্টা) অর্থাৎ ঢাকায় যদি রাত ৮ টা হয় তাহলে গ্রিনউইচে সময় হবে দুপুর ২ টা। এবার ধরুন অন্য কোন একটি স্থানের দ্রাঘিমাংশ 31.25°W। তাহলে 31.25° এর জন্য গ্রিনউইচের সাথে সময়ের পার্থক্য হবে 31.25×4=125 মিনিট বা 2 ঘন্টা 5 মিনিট। আবার যেহেতু স্থানটি গ্রিনউইচের West বা পশ্চিমে অবস্থিত তাই এক্ষেত্রে সময় গ্রিনউইচের চেয়ে পিছিয়ে থাকবে। অর্থাৎ গ্রিনউইচের সময় দুপুর ২ টা হলে ঐ স্থানটির সময় দুপুর ২ টা - ২ ঘন্টা ৫ মিনিট = সকাল ১১ টা ৫৫ মিনিট। তাই ঢাকায় রাত হলেও 31.25°W স্থানে তখন সকাল। এভাবেই কোনো স্থানের সময় নির্ধারণ করা হয়।

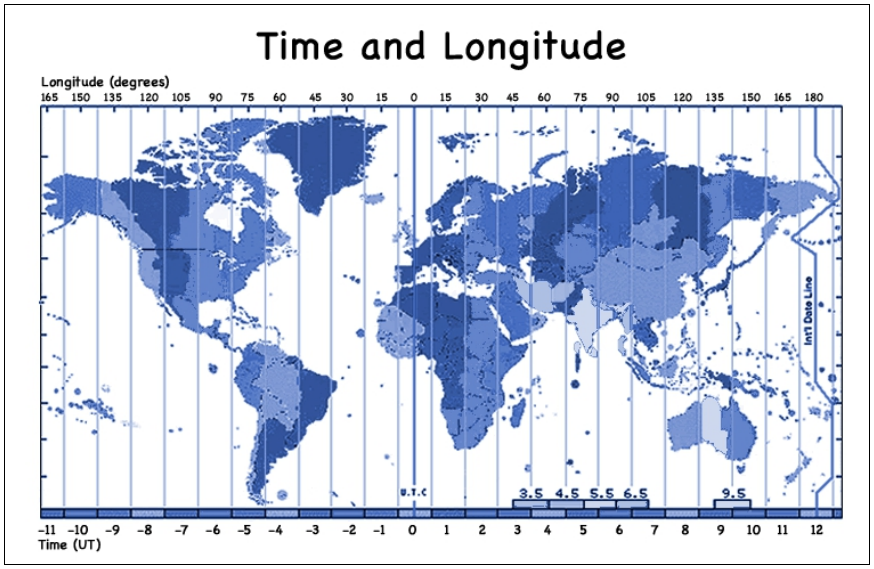

কিন্তু এই সময় নির্ধারন করতে যে সমস্যাটি হয় তা হলো: গ্রিনিচ থেকে ১৮০° পূর্বদিকে গেলে সময় এগিয়ে যাবে ১৮০×৪=৭২০ মিনিট বা ১২ ঘন্টা। আবার গ্রিনিচ থেকে ১৮০° পশ্চিমদিকে গেলে সময় পিছিয়ে যাবে ১৮০×৪=১২ ঘন্টা। কিন্তু 180° পূর্ব এবং 180° পশ্চিম আসলে একই জায়গা। একই জায়গায় তো একই সাথে সময় ১২ ঘন্টা এগিয়ে বা পিছিয়ে যেতে পারেনা। তাহলে এটা কিন্তু একটি সমস্যা হয়ে গেলো। চলুন একটু গভীরভাবে দেখা যাক কি সমস্যা হলো। ধরুন এখন গ্রিনউইচে সময় সকাল ১১ টা এবং সোমবার তাহলে ১৮০° পূর্ব দ্রাঘিমাংশে সময় হবে রাত ১১ টা (যেহেতু সময় এগিয়ে যাচ্ছে) এবং সোমবার (যেহেতু রাত ১২ টা এখনও বাজেনি)। আবার ১৮০° পশ্চিম দ্রাঘিমায় সময় রাত ১১ টা কিন্তু বার হবে রবিবার (কারণ এক্ষেত্রে সময় পিছিয়েছে) অর্থাৎ একই স্থানে রবিবার এবং সোমবার হয়ে গেলো। এটা নিশ্চয়ই যুক্তিসঙ্গত না। এবার ধরুন কোন জাহাজ 180° পশ্চিম /পূর্ব রেখাটি অতিক্রম করতে চায়। যদি জাহাজটি গ্রিনিচ থেকে পশ্চিমে রওনা শুরু করে তাহলে তার সময় পিছিয়ে যাচ্ছে। রেখাটির কাছাকাছি আসলে ১২ ঘন্টা পিছোলো। জাহাজটি যদি রবিবার রাত ১১ টায় 180° রেখায় পৌঁছায় তাহলে তখন গ্রিনউইচে কিন্তু সোমবার। এখন জাহাজটি 180° রেখা অতিক্রম করার পরও যদি রবিবার ধরে হিসাব করে তাহলে তা হবে ত্রুটিপূর্ণ। তাই 180° রেখাটি অতিক্রম করা হয়ে গেলে জাহাজটিতে একটি বারের সংখ্যা বাড়াতে হবে। অর্থাৎ সোমবার করতে হবে। অর্থাৎ সময় ২৪ ঘন্টা বাড়াতে হবে। তেমনিভাবে জাহাজ পূর্ব থেকে পশ্চিমে যাওয়ার সময় যদি 180° রেখাটি পার হতে চায় তাহলে ২৪ ঘন্টা সময় কমাতে হবে। এভাবেই তাহলে তারিখের হিসাব ঠিক রাখা সম্ভব। 180° পূর্ব/পশ্চিম এর এই রেখাটি হলো আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা। চিত্রে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা দেখানো হয়েছে।

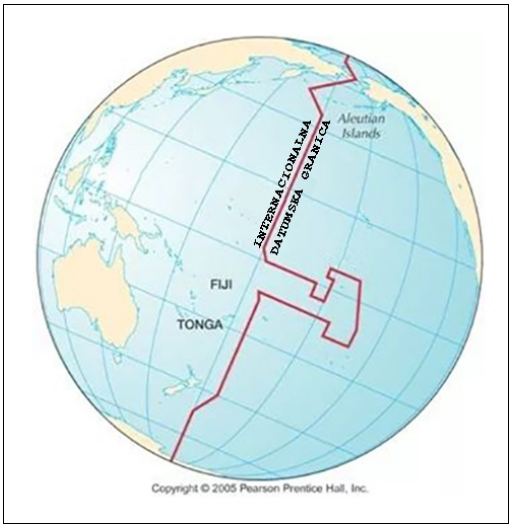

উপরের চিত্রটি দেখে মনে হতে পারে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা সোজা হলে কি হতো! এমন আঁকাবাঁকা কেনো হলো? এর কারণ হলো যখন আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা প্রস্তাবিত হয়েছিল তখন এই রেখাটি যেন কোন দেশের উপর বা ভূমির উপর দিয়ে না যায় সে কারণে রেখাটি সমুদ্রের মাঝ দিয়ে কল্পনা করা হয়েছিল । এ কারণেই বর্তমানে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা এরকম আঁকাবাঁকা আকারের।

ধ্রুবতারার কথা মনে আছে আশা করি। আমরা পৃথিবীর ঘূর্ণন গতির জন্য দুইটি ধ্রুবতারা পেয়েছিলাম। ধ্রুবতারা আসলে পৃথিবীর ঘূর্ণন অক্ষ বরাবর দুইটি তারা ছিলো। তার মধ্যে উত্তর ধ্রুবতারাটির সাথেই আমরা বেশি পরিচিত (মনে না থাকলে Precession এ দেখুন) নিচে পৃথিবী গোলকটি দেখানো হয়েছে।

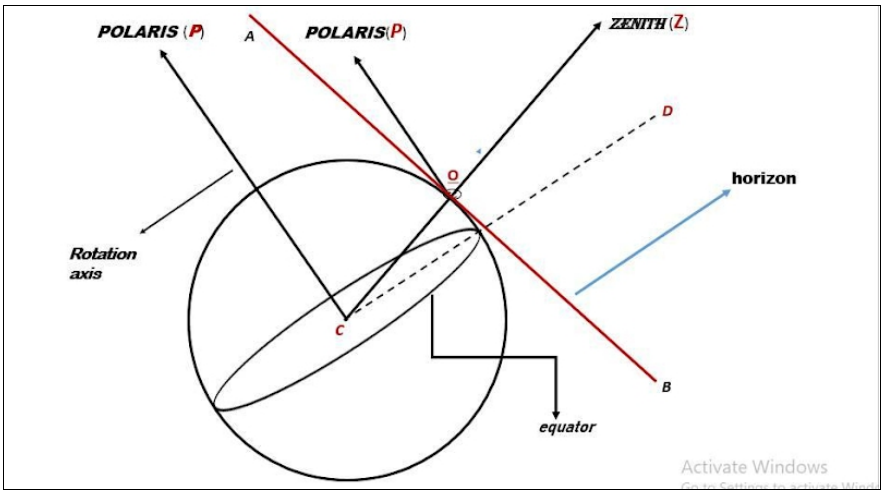

পৃথিবীর কেন্দ্র C। পৃথিবীর ঘূর্ণন অক্ষ (Rotation axis), বিষুবরেখা (Equator) দেখানো হয়েছে। O বিন্দুতে আপনি আছেন। $C,\ O$ যোগ করে বর্ধিত করলে আপনি আপনার স্থানের সুবিন্দু (Zenith) পাবেন। এই বিন্দুটি ঠিক আপনার মাথার উপরে। যেহেতু বর্তমান Polaris বা ধ্রুবতারা অনেকদূরে অবস্থিত তাই C থেকে পোলারিসের দিকে টানা রেখাটির এবং O থেকে পোলারিসের দিকে টানা রেখাটি সমান্তরাল ধরা যায়। লাল রেখা AB দ্বারা আপনার দিগন্ত বোঝানো হয়েছে। আপনি কিন্তু এই রেখাটির নিচের কিছু দেখতে পাবেন না। তাহলে আপনি পোলারিসের দিকে তাকালে দেখবেন

পোলারিস দিগন্ত থেকে কোণ AOP পরিমাণ উপরে। বা পোলারিসের উন্নতি কোণ $\measuredangle AOP$। খেয়াল করে দেখুন, আপনি যেখানে আছেন, সে স্থানের অক্ষাংশ $\measuredangle OCD$। এবার কিছু হিসাব নিকাশ করা যাক:

$$\measuredangle POZ + \measuredangle OCD = 90° \quad (1)$$

$$\measuredangle AOP + \measuredangle POZ = 90° \quad (2)$$

(1) থেকে (2) বিয়োগ করে পাই

$$\measuredangle OCD = \measuredangle AOP$$

বা, আপনার অক্ষাংশ =ধ্রুবতারার উন্নতি কোণ

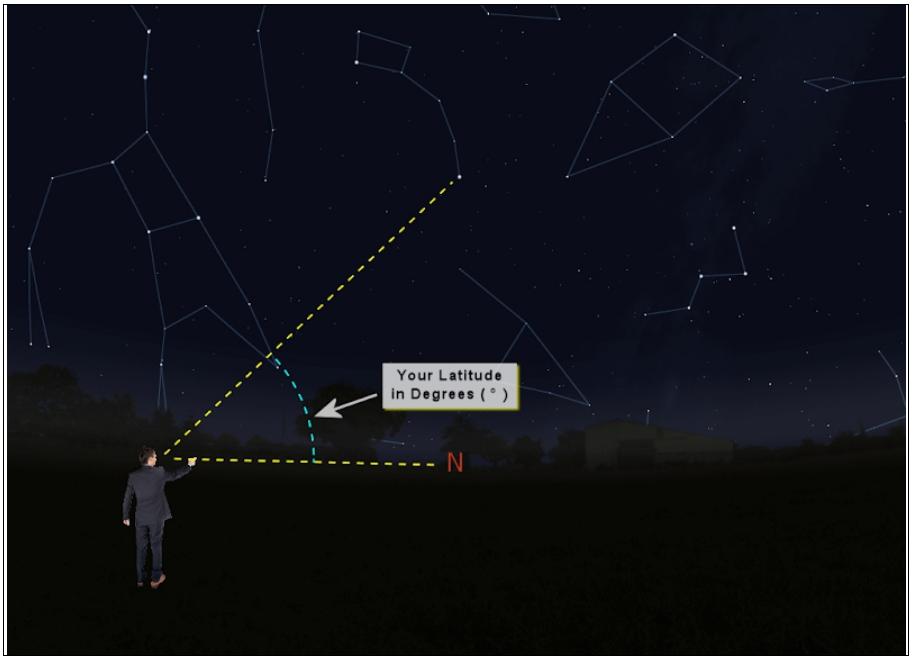

সুতরাং কোন স্থানের অক্ষাংশ যত ধ্রুবতারাটি দিগন্ত থেকে ঠিক ততটাই উপরে থাকবে। 24.56° N অক্ষাংশে ধ্রুবতারাটি উত্তরদিকে 24.56° উপরে দেখা যাবে। এভাবে ধ্রুবতারার উন্নতি কোণ থেকে অক্ষাংশও নির্ণয় করা যায়। অর্থাৎ একেক জায়গায় ধ্রুবতারা এক এক উন্নতিতে দেখা যায়। আবার ধ্রুনতারার উন্নতি কোণ চেঞ্জ হওয়ার অর্থ পুরো celestial sphere টি চেঞ্জ হওয়া। তাই অক্ষাংশ পরিবর্তন এর সাথে সাথে তারাগুলোর অবস্থানও চেঞ্জ হয়। আর তারার উন্নতি কোণ নির্ণয়ে ব্যবহৃত যন্ত্রের নাম সেক্সট্যান্ট।

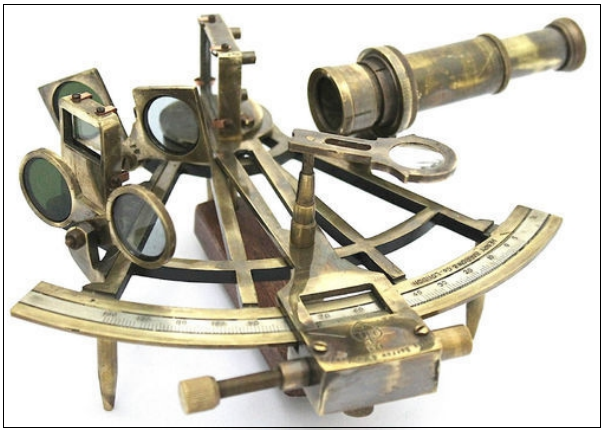

চিত্রঃ সেক্সট্যান্ট

Celestial sphere এর উপর সূর্য Ecliptic বরাবর থাকে সারা বছর জুড়ে। Ecliptic টি celestial equator এর সাথে ২৩.৪৫° কোণ তৈরি করে (~২৩.৫°)। Summer solstice (চিত্র) এর সময় সূর্য Celestial equator এর সাথে 23.5° কোণ করে থাকায় 23.5° N অক্ষাংশে যারা বসবাস করে তাদের কাছে মনে হবে সূর্য ঠিক তাদের মাথার উপর। 23.5°N অক্ষাংশ ধরে যে বৃত্তটি কল্পনা করা হয় সেটিকে বলা হয় কর্কটক্রান্তি রেখা (Tropic of cancer)। Summer solstice এর দিন কর্কটক্রান্তি রেখার উপর যারা বাস করে তারা একটি খাড়া লাঠি মাটিতে স্থাপন করলে ঠিক দুপুরে কোন ছায়া পড়বেনা (যেহেতু এসব অঞ্চলে সূর্য লম্বভাবে কিরণ দিচ্ছে)। ঠিক তেমনি Winter solstice এর সময় 23.5° S এ যারা আছে তাদের কাছে একই ঘটনা ঘটবে। 23.5°S কে অক্ষাংশ ধরে যে বৃত্ত সেটি হলো মকরক্রান্তি রেখা। Winter solstice এর সময় দক্ষিণ গোলার্ধে সবচেয়ে বড়োদিন হয়। চিত্রে কর্কটক্রান্তি এবং মকরক্রান্তি রেখা দেখানো হয়েছে।

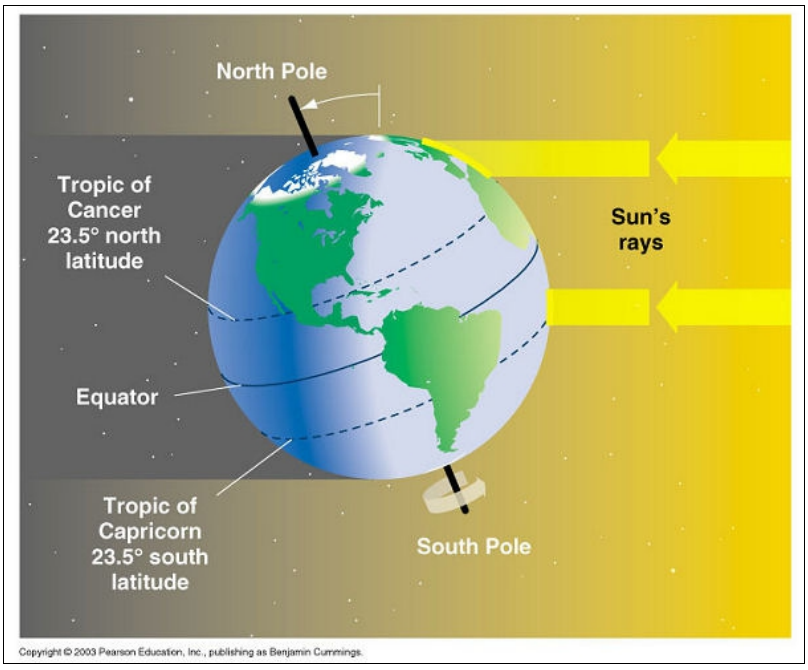

প্রশ্ন জাগতে পারে কর্কটক্রান্তি এবং মকরক্রান্তি কেনো নাম দেয়া হলো? Summer solstice এর সময় সূর্য কর্কট রাশিতে থাকার কারণে কর্কটক্রান্তি নাম দেয়া হয়েছে। তবে বর্তমানে সূর্য কর্কট রাশিতে থাকেনা। থাকে মিথুন রাশিতে। ধীরে ধীরে এই অবস্থানও চেঞ্জ হবে (কেন বলুন তো?) তদ্রুপ, Winter solstice এর সময় মকর রশিতে থাকার কারণে মকরক্রান্তি। দারুন ব্যাপার হলো কর্কটক্রান্তি রেখা আমাদের বাংলাদেশের উপর দিয়েই গেছে।

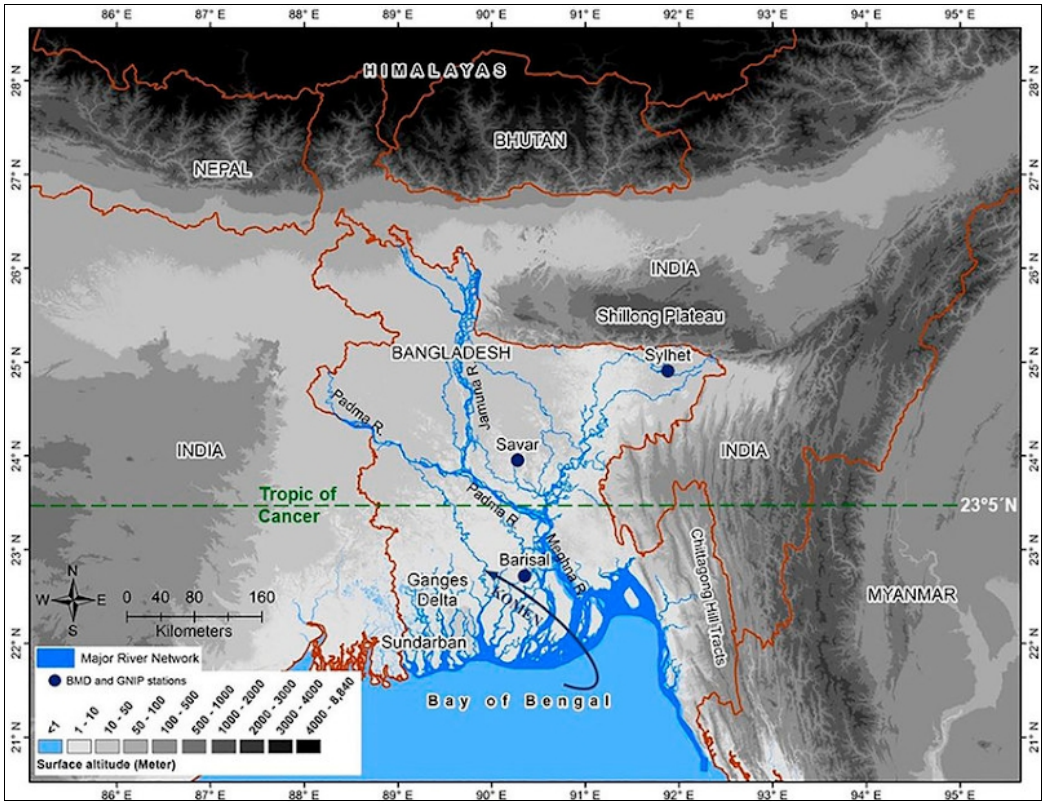

কর্কটক্রান্তি রেখা কিন্তু পুরাতন গ্রিক শহর সিয়েন (Syene) এর উপর দিয়েও অতিক্রম করেছে। আর এর কারণেই সৃষ্টি হয়েছিলো ইতিহাস! কীভাবে? চলুন দেখা যাক।

Syene শহরটি একটি কুয়া ছিলো। Summer solstice এর দিন কুয়ার কোন ছায়া মাটিতে পরতো না। (কেননা শহরটি কর্কটক্রান্তি রেখার উপরে ছিলো)। সময়টা ২৪০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ। আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরির প্রধান লাইব্রেরিয়ান জানতে পারলেন এ খবর। তিনি ২১ জুন (Summer solstice এর দিন) তারিখে মধ্যদুপুরে লাঠি পুঁতলেন খাড়াভাবে। দেখলেন ছায়া পড়েছে।

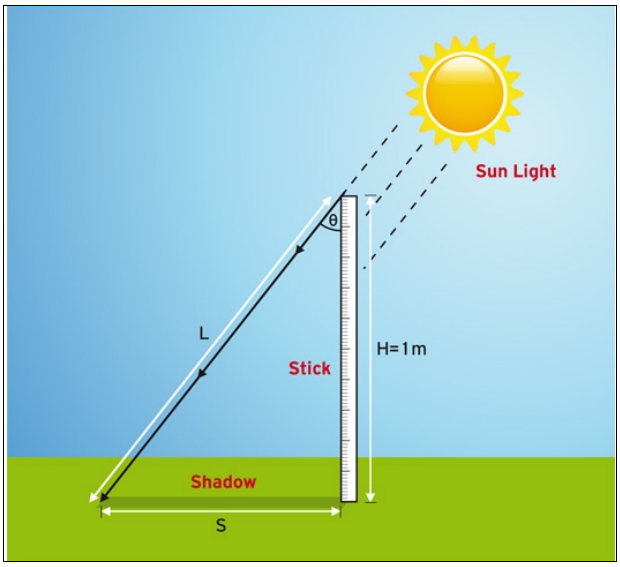

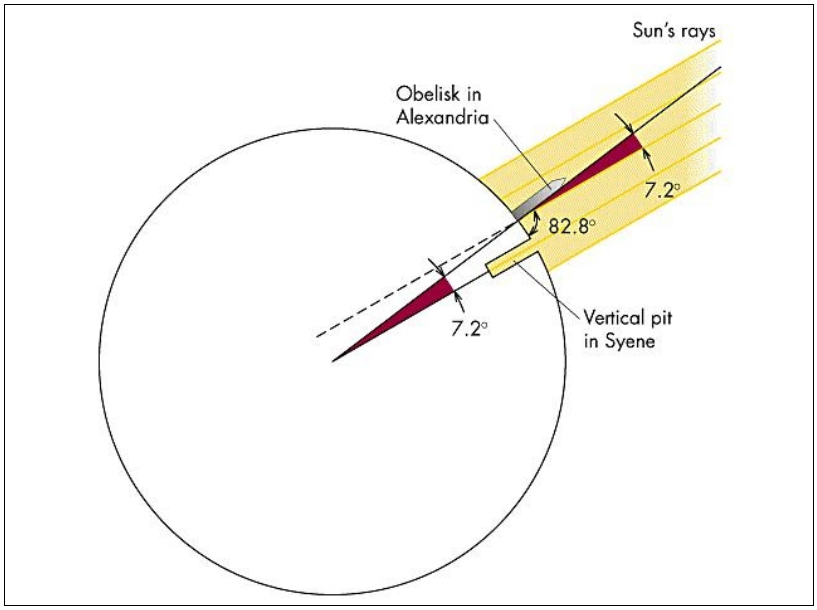

ছায়ার দৈর্ঘ্য এবং লাঠির দৈর্ঘ্য থেকে মেপে দেখলেন থিটা কোণটির মান (বাম চিত্রে) প্রায় 7.2°। তাই অন্যকথায় পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে আলেকজান্দ্রিয়া ও Syene শহরটিও 7.2° কোণ তৈরি করে। তখনকার যুগে পায়ে হেটে হেটে শহর দূরত্ব বের করা হতো। এর জন্য আলাদা পেশাধারী লোক ছিলো। তাদের হিসাব অনুযায়ী আলোকজান্দ্রিয়া থেকে Syene এর দূরত্ব ছিলো 5000 stadia। বর্তমান হিসাবে 1 stadia=0.185 km। সুতরাং 5000 Stadia=925 km। তাই বলা যায়,

7.2° পার্থক্যের জন্য দূরত্ব 925 km

সুতরাং 360° পার্থক্যের জন্য (925×360)/7.2=46250 km

যেহেতু পুরো বৃত্ত কেন্দ্রে 360° কোণ তৈরি করে তাই 46250km হলো পৃথিবীর পরিধি। বর্তমান হিসেবে এ মান 40075 km। পুরোপুরি নিখুত না হলে ও সেসময় এটি কিন্তু ছিলো যুগান্তকারী। আর এই হিসাব যিনি করেছিলেন তিনি Eratosthenes। আর মূল মানের কাছাকাছি মান একমাত্র পাওয়া সম্ভব হয়েছিলো কারণ Syene শহরটি প্রায় কর্কটক্রান্তি রেখায় অবস্থিত ছিলো।

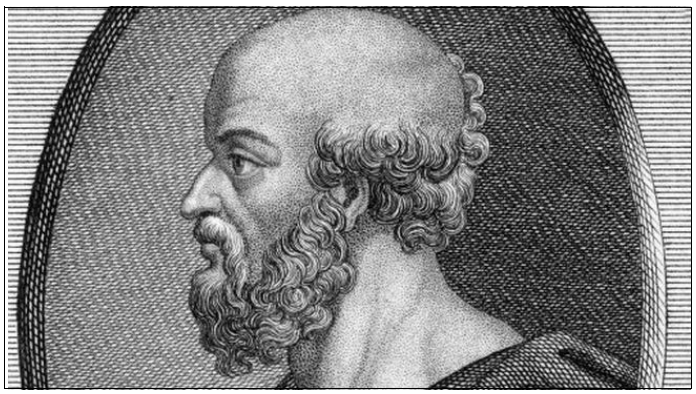

এবার বলুন তো, তৎকালীন হিসাব অনুযায়ী আলেকজান্দ্রিয়া শহরের অক্ষাংশ কত ছিলো?

আপনার হয়ত Circumpolar star এর কথা মনে থেকে থাকবে। এসব তারারা কখনও ডুবতনা। তেমনি কিছু তারা ছিলো যেগুলো কখনও উঠতোনা। তেমনি পৃথিবীর কিছু কিছু অঞ্চলে কয়েকদিন থেকে মাস অব্দি সূর্য ওঠেনা, ডোবেও না। Arctic circle (সুমেরুবৃত্ত) দ্বারা পৃথিবীর উপর এমন একটি বৃত্ত বোঝানো হয় যেটির অক্ষাংশ 66.5° N। Ecliptic, celestial equator এর সাথে 23.5° কোণ তৈরি করার কারণে Summer solstice এর দিন 90-23.5 = 66.5°N অক্ষাংশে সূর্য কখনও ডোবে না। (মূলত এটা হলো সীমা।) 66.5°N অক্ষাংশের বেশি হয়ে গেলে Summer solstice এ সূর্য ডোবে না। আবার 66.5°S এর থেকে বেশি হয়ে গেলে সেসব অঞ্চলে Summer solstice এর সময় সূর্য ওঠেনা। 66.5° S অক্ষাংশের বৃত্তটি কুমেরুবৃত্ত (Antarctic circle) নামে পরিচিত।

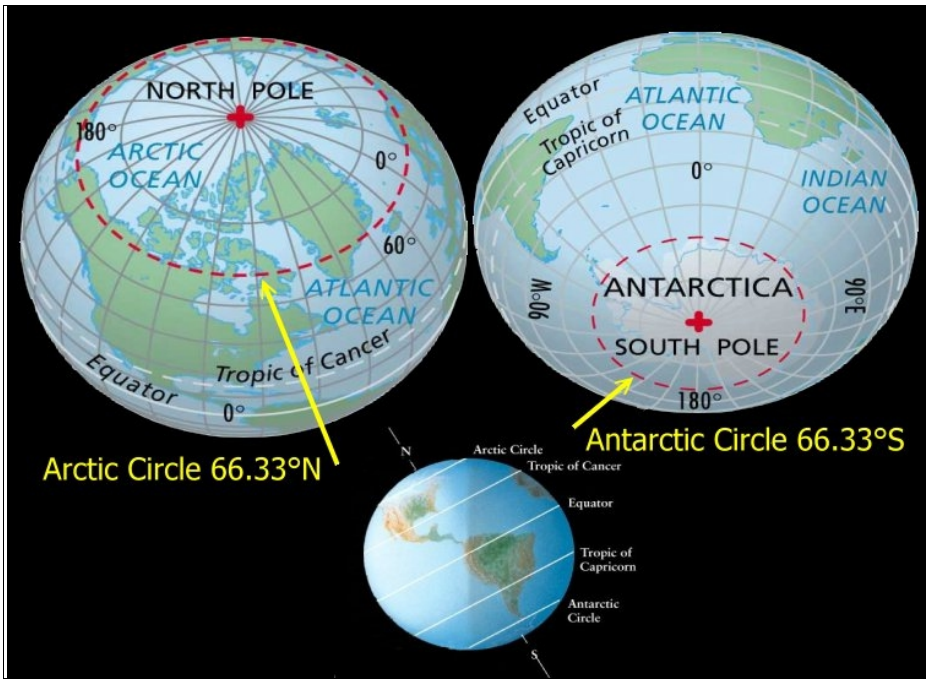

তদ্রুপ, Winter solstice এর সময় সুমেরুবৃত্তে সূর্য ওঠেনা এবং কুমেরুবৃত্তে সূর্য ডোবে না। এসব জটিল কথাবার্তা মনে হলে সহজ ভাষায় এভাবে বলা যায়। পৃথিবীর যে অংশে বছরে কমপক্ষে একদিন সূর্য ওঠেনা এবং কমপক্ষে একদিন সূর্য ডোবে না সেই অংশটি যেখান থেকে শুরু হয়েছে সেটাই মেরুবৃত্ত। উত্তরদিকের মেরুবৃত্তটি সুমেরুবৃত্ত এবং দক্ষিণ দিকের মেরুবৃত্তটি কুমেরুবৃত্ত।

এবার বলি Altitude এবং Azimuth সম্পর্কে। সহজ ভাষায় Altitude হলো কোন কিছুর উন্নতি/উচ্চতা।

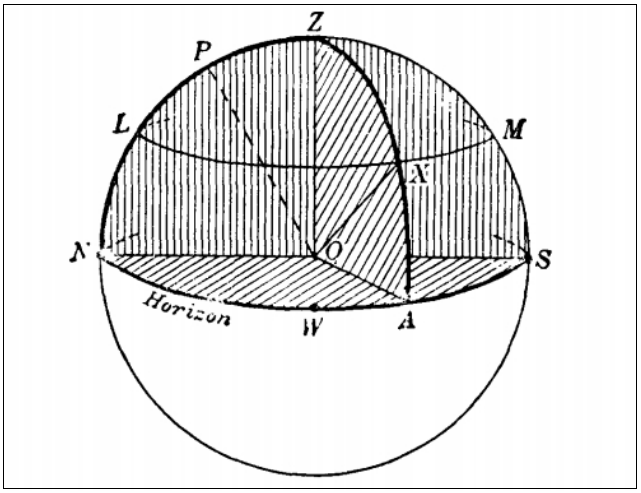

O বিন্দুতে পর্যবেক্ষকের কাছে সুবিন্দু Z এবং ধ্রুবতারা P। ধরুন, X একটি তারা Celestial sphere এর উপর চিহ্নিত। $NWAS$ বৃত্ত দ্বারা দিগন্ত বোঝানো হয়েছে। N হলো উত্তরদিক, S দক্ষিণ দিক এবং W হলো পশ্চিম দিক। $\measuredangle AOX$ কে X তারা টির উন্নতি কোণ (Altitude) বলা হয়। অর্থাৎ দিগন্ত থেকে তারাটি কত ডিগ্রি উপরে অবস্থিত সেটাই Altitude। এবার N বিন্দু থেকে (উত্তরদিক) A পর্যন্ত কৌণিক দূরত্ব বা $\measuredangle NOA$ কে বলা হয় Azimuth। খেয়াল করুন, এখানে N থেকে W এর দিকে আসা হয়েছে, অর্থাৎ উত্তর থেকে পশ্চিমে বা ঘড়ির কাটার বিপরীতদিকে। তাই ঘড়ির কাটার বিপরীত দিক দিয়ে হিসাব করলে W বিন্দুর Azimuth 90°, S বিন্দুর Azimuth 180°, E বিন্দুর Azimuth 270° (E বিন্দুটি W এর ঠিক বিপরীতদিকে অবস্থিত)। তদ্রুপ Azimuth কে N থেকে ঘড়ির কাটার দিকে হিসাব করলে E, S, W বিন্দুর Azimuth যথাক্রমে 90°, 180°, 270°। তবে পরবর্তীতে আমরা ঘড়ির কাটার বিপরীতে ধরে Azimuth কে হিসাব করবো।

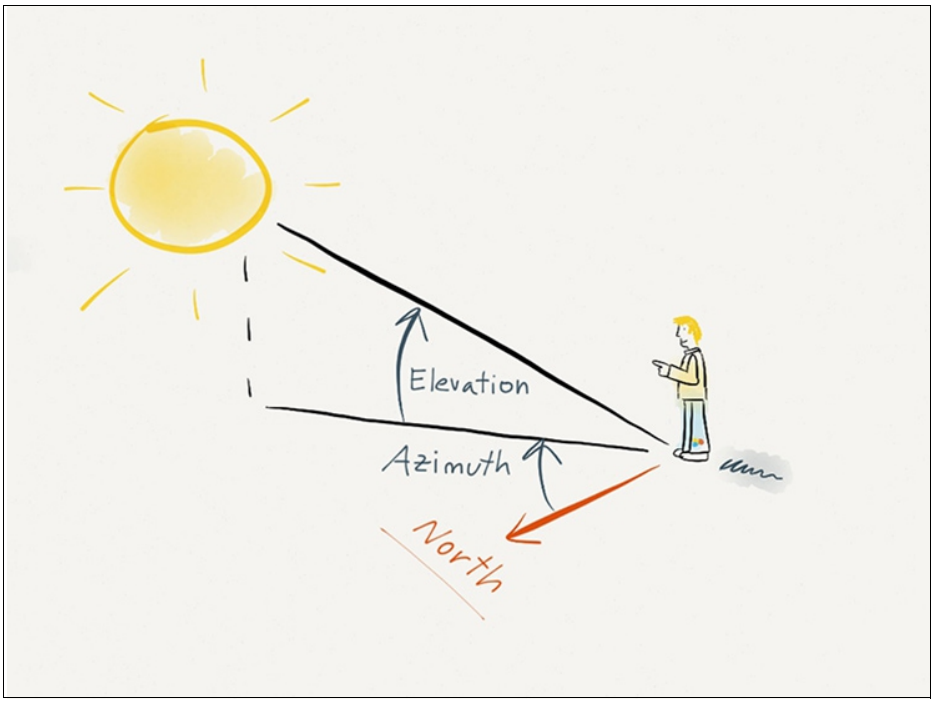

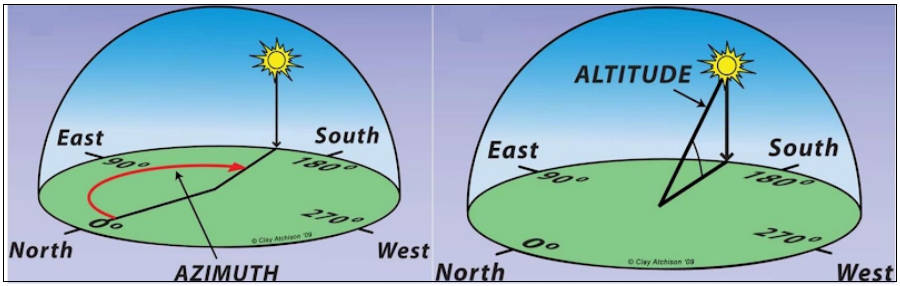

পৃথিবীর নিজ অক্ষের উপর একবার ঘুরে আসা অর্থ অক্ষের চারদিকে 360° কোণে ঘুরে আসা। এ সময়টি কিন্তু ২৪ ঘন্টা নয়! এ সময়টি ২৩ ঘন্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেন্ড। তাহলে ২৪ ঘন্টা কিসের পরিমাপ? আর ২৩ ঘন্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেন্ডই বা কীসের পরিমাপ? এর উত্তর জানার জন্য আমাদের দুইটি দিন সম্পর্কে জানতে হবে। একটি হলো সৌরদিন (Solar day) এবং আরেকটি Sideral day বা নাক্ষত্রিক দিন। Sideral কথাটির সাথে আমরা কিন্তু পরিচিত। যাই হোক, পৃথিবী নিজ অক্ষে 360° ঘুরে আসতে যে সময় নেয় সেটা হলো নাক্ষত্রিক দিন। এর মান ২৪ ঘন্টা থেকে ছোট। আবার ধরুন, আজ দুপুরবেলা সূর্য মাথার উপরে আছে। আবারও সূর্য একই জায়গায় মাথার উপরে আসতে পৃথিবী যে সময় নেবে সেটাই হলো সৌরদিন। এর মান ২৪ ঘন্টা। মনে হতে পারে, এই দুইটি সময় ভিন্ন হলো কেন? এর কারণ হলো পৃথিবীর সূর্যের চারদিকে ঘূর্ণন।

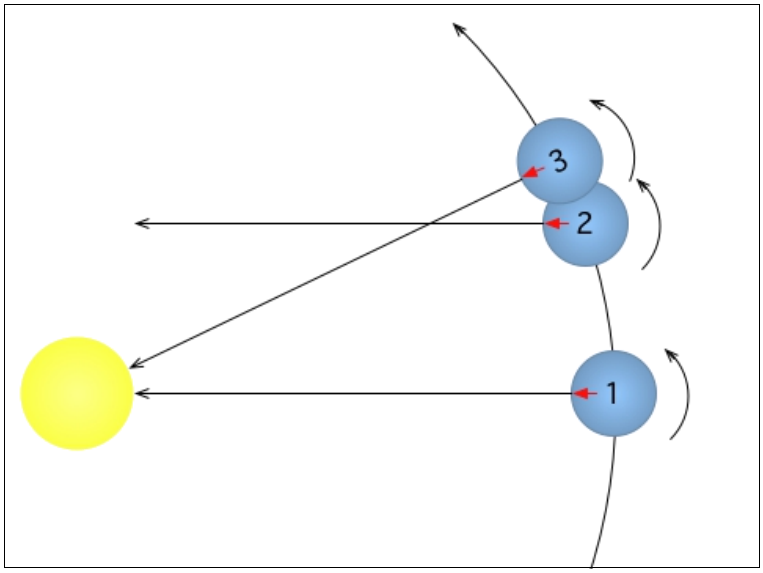

1 নং অবস্থান থেকে ধরুন পরিমাপ শুরু করা হলো। লাল রঙের ছোট্ট তীরের অবস্থানে সূর্য সরাসরি মাথার উপরে আছে। এবার সূর্য 360° ঘুরে গেলো এবং বার্ষিক গতির দরুন 2 নং অবস্থানে পৌছালো। এবার দেখুন, লাল রঙের তীরের স্থানে মাথার উপরে কিন্তু সূর্য নেই! ঐ স্থানে মাথার উপরে সূর্য থাকতে হলে পৃথিবীকে আরেকটু ঘুরতে হবে। যখন পৃথিবী 3 নং অবস্থানে গেলো, তখন আবার মাথার উপরে সূর্য আসলো। দেখুন, 1 থেকে 2 তে যেতে পৃথিবী 360° ঘুরলেও সূর্য কিন্তু মাথার উপরে নেই (অর্থাৎ 1 নং এ যে পজিশনে সূর্য দেখা গেছিলো সেই পজিশনে নেই)। এই সময়টি নাক্ষত্রিক দিন (২৩ ঘন্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেন্ড)। কিন্তু 1 থেকে 3 এ যেতে যে সময় লাগবে সেটা হলো সৌরদিন। (২৪ ঘন্টা) ।

তাহলে এক কথায়, পৃথীবি ৩৬০° ঘুরতে সময়কাল হলো নাক্ষত্রিক দিন কিন্তু সূর্যকে আজ যেখানে দেখলাম আগামীকাল একই জায়গায় দেখতে যে সময় দরকার সেটা হলো সৌরদিন। একটি প্রশ্ন জাগতে পারে। 1 থেকে 2 পর্যন্ত

সময়কে নাক্ষত্রিক দিন কেন বলা হলো? কারণ, নক্ষত্রগুলো আমাদের থেকে বহু দূরে অবস্থিত। ওখানে যদি সূর্য না থেকে কোন দূরের নক্ষত্র থাকতো তাহলে 1 নং এ লাল তীরের স্থানে যদি নক্ষত্র মাথার উপরে দেখা যেত, 2 এ ও লাল তীরের স্থানে মাথার উপরে দেখা যেত। তাই ২৩ ঘন্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেন্ডকে নাক্ষত্রিক দিন বলা হয়। একটু সহজে বলি। বাংলাদেশের আকাশে কৃত্তিকা তারকাগোষ্ঠী প্রায় মাথার উপরে দেখা যায়। আজ সন্ধ্যা ৭ টার সময় কৃত্তিকাকে মাথার উপরে দেখলেন। কিন্তু আগামীকাল সন্ধ্যা ৭ টা নয় বরং ৬ টা বেজে ৫৬ মিনিট ৪ সেকেন্ডে মাথার উপরে দেখবেন। একই কথা অন্য যেকোন নক্ষত্রের জন্যও প্রযোজ্য (ধ্রুবতারাদ্বয় ব্যতীত)। কালপুরুষ ধরুন জানুয়ারির ১৫ তারিখ রাত ৯ টায় আকাশে দেখলেন। তাহলে ঐ একই স্থানে,

১৬ তারিখে দেখবেন রাত ৯ টা+২৩ ঘন্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেন্ড =রাত ৮ টা ৫৬ বেজে ৪ সেকেন্ডে

১৭ তারিখে দেখবেন রাত ৮ টা বেজে ৫৬ মিনিট ৪ সেকেন্ড +২৩ ঘন্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেন্ড =৮ টা বেজে ৫৩ মিনিট ৮ সেকেন্ডে

⋮

এভাবে কালপুরুষ একদিন দিনের বেলায় আকাশের ঐ স্থানটিতে আসতে পারবে। এ বিষয়টি সব তারামন্ডলের জন্যই।

এতদূর আলোচনার পর আমরা মোটামুটি বুঝলাম যে পৃথিবীর কোনো স্থানে কোনো পর্যবেক্ষক এর অবস্থান নির্দিষ্ট করতে হলে দুইটি জিনিসের প্রয়োজন। একটি হলো অক্ষাংশ এবং অপরটি দ্রাঘিমাংশ। তেমনি পর্যবেক্ষকদের সমুদ্র অবস্থিত হয় তবুও এই অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ দিয়ে সেই পর্যবেক্ষক কোথায় আছে সেটা নির্দিষ্ট করা যাবে। আজ থেকে অনেক আগে যখন কোন স্মার্ট ফোন ছিল না কিংবা গুগল ম্যাপ ছিলনা অথবা ছিলনা কোন জিপিএস তখন নাবিকরা তাদের অবস্থান নির্দিষ্ট করার জন্য সাহায্য নিতেন আকাশে তারাদের। আকাশের তারাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে তারা তাদের অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ বের করতেন। অক্ষাংশ বের করা তুলনামূলক সহজ কারণ আমরা জানি ধ্রুবতারা টি কোন স্থানে দিগন্ত থেকে যত ডিগ্রি উপরে আছে বা ধ্রুবতারার উন্নতি কোণ সেটি ওই স্থানের অক্ষাংশের মান। তাই শুধুমাত্র ধ্রুবতারা দিয়ে পরিমাপ করা যেত জাহাজটি কত অক্ষাংশে আছে কিন্তু দ্রাঘিমাংশ বের করা তুলনামূলক কঠিন কাজ ছিল। দ্রাঘিমাংশ বের করার অনেকগুলো পদ্ধতি আছে। তবে দ্রাঘিমাংশ বের করার জন্য সূর্যের সাহায্য নেওয়া হয়। অক্ষাংশে যেমন ধ্রুবতারা তেমনি দ্রাঘিমাংশ বের করার জন্য সূর্য। তবে কিভাবে বের করা হয় সেটাই জানার জন্য আমাদের জানতে হবে সময় পদ্ধতি সম্পর্কে। এবিষয়টি অনেক বিস্তারিত এবং যথাসময়ে আলোচনা করা হবে।

তবে আপনাদের মাথায় প্রশ্ন আসতে পারে এইযে ধ্রুবতারা বিষয় নিয়ে কিছু আলোচনা করা হলো কিন্তু ধ্রুবতারা কোথায় দেখতে পাওয়া যাবে? উত্তর আকাশেতে অসংখ্য তারা আছে তারমধ্য ধ্রুবতারা চিনব কীভাবে? ধ্রুবতারা কে চিনতে হলে আমাদের কিছু নক্ষত্রমন্ডল চিনতে হবে। তার মধ্যে সপ্তর্ষিমণ্ডল অন্যতম। তার আগে বলা দরকার Asterism সম্পর্কে। Asterism এর বাংলা হলো ক্ষুদ্র তারকাগুচ্ছ। বিশাল কোন তারামন্ডলের মাঝে কয়েকটি তারা নিয়ে যদি আলাদাভাবে আপনি কোন আকার কল্পনা করেন, তাহলে সেটা হবে Asterism। যেমন Ursa Major কে বাংলায় আমরা সপ্তর্ষিমন্ডল নামে চিনি। আরেকটি নাম আছে, ঋক্ষমন্ডল। নিচে সপ্তর্ষিমন্ডলের চিত্র দেওয়া হলো।

সপ্তর্ষিমন্ডল মোটামুটি এপ্রিল মাসে রাত ৯ টার দিকে উত্তর আকাশে বেশ স্পষ্টভাবে দেখা যায় (অর্থাৎ সর্বোচ্চ উন্নতিতে থাকে)। এসময় সপ্তর্ষিমন্ডলের সাতটি তারা দিয়ে গঠিত Asterism টি বেশ স্পষ্ট ভাবেই বোঝা যায়। তখন চিত্রের মতো করে কাল্পনিক রেখা টেনে ধ্রুবতারা চেনা যায়।

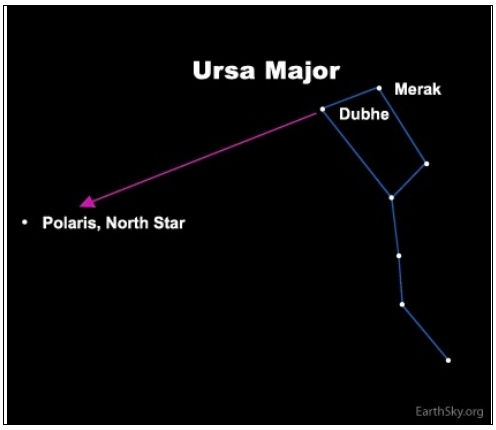

তেমনিভাবে ক্যাসিওপিয়া নক্ষত্রমন্ডল দিয়েও ধ্রুবতারা চেনা যায়। ক্যাসিওপিয়া নক্ষত্রমন্ডলটি "W" আকৃতির। সহজেই উত্তরাকাশে দেখা যায়। মোটামুটি ডিসেম্বর মাসে রাত ৮-৯ টার দিকে "W" আকারের কারণে সহজেই খুঁজে পাওয়া যায় এই মন্ডলকে। তখন চিত্রের মতো করে কাল্পনিক রেখা টেনে খুঁজে পাওয়া যায় ধ্রুবতারাকে।

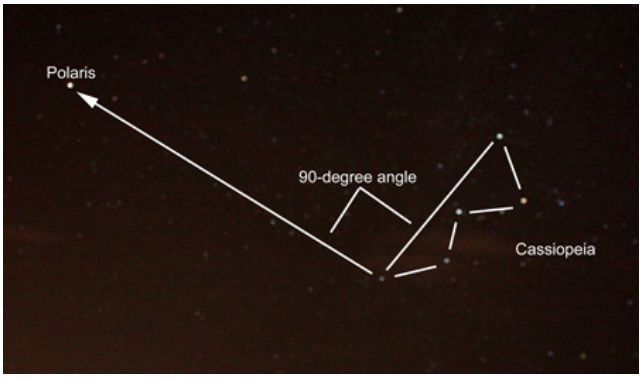

আর ধ্রুবতারা মোটামুটি উজ্জ্বল (খালি চোখে দেখা ৫০ তম)। বেশি না হলেও চোখে পড়ে আরকি। এভাবে সহজেই ধ্রুবতারাকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

পৃথিবীর পরিধি নির্ণয়ে Eratosthenes এর অবদান যেমন ছিলো তেমনই আরেকজনের কথা বলব যিনি তারা দেখে পৃথিবীর পরিধি নির্ণয় করেছিলেন। নাম তার Posidonius। (135-51 BCE) বর্তমান সিরিয়ায় তার জন্ম।

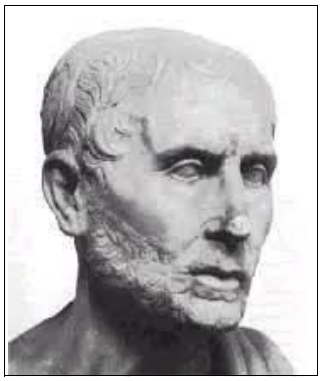

Eratosthenes এর মতো তার পদ্ধতিতেও তিনি দুইটি শহরের মধ্যবর্তী কোণ বের করেছিলেন। কিন্তু সেটি অগস্ত্য নামক তারকাকে লক্ষ্য করে। আলেকজান্দ্রিয়া শহর থেকে Posidonius অগস্ত্য (Canopus) তারকাটিকে দিগন্তের বেশ উপরেই দেখেছিলেন। প্রায় ৭ ডিগ্রি ৩০ মিনিট উপরে । কিন্তু Rhodes শহরে এই তারাটিকে দিগন্তের উপরে দেখা যায়না। সেই হিসেবে তিনি বুঝতে পারেন যে আলেকজান্দ্রিয়া এবং Rhodes শহরটিও পৃথিবীর কেন্দ্রে ৭ ডিগ্রি ৩০ মিনিট কোণ তৈরি করে। এবার তিনি Rhodes থেকে আলেকজান্দ্রিয়ার দূরত্ব 5000 স্ট্যাডিয়া ব্যবহার করেন। এটি অনুসারে পৃথিবীর পরিধি আসে ২৪০০০০ stadia. আবার কেউ কেউ এটাও বলেন যে পসিডনিয়াস Rhodes থেকে আলেকজান্দ্রিয়ার দূরত্ব 3750 স্ট্যাডিয়া ব্যবহার করেছিলেন। সে হিসেবে পৃথিবীর পরিধি পাওয়া যায় 180000 স্ট্যাডিয়া। যাই হোক, প্রথম হিসাবটি বিবেচনা করলে পাওয়া যায় পৃথিবীর পরিধি 240000 stadia বা 44400 km। প্রকৃত মানের সাথে ত্রুটি থাকলেও খালি চোখের পর্যবেক্ষণে এই পরিমাপ নিঃসন্দেহে অবিশ্বাস্য।

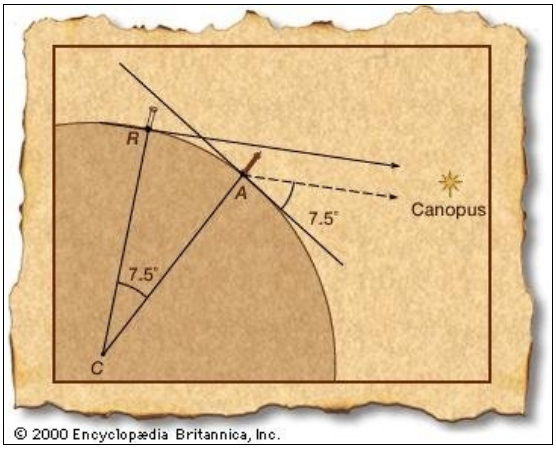

আল বিরুনির পদ্ধতিতে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ

ভূমিকা না করে তিনি যেভাবে পৃথিবীর পরিধি নির্ণয় করেছিলেন সেটা বলি। তার পদ্ধতি পুরোপুরি ত্রিকোনমিতির উপর নির্ভরশীল। অ্যাস্ট্রোল্যাব ব্যবহার করে কোন বস্তুর উন্নতি কোণ নির্ণয় করা যায়। এভাবে ধরুন কোন একটি পাহাড়ের পাদদেশ হতে কিছুটা দূরে পাহাড়ের উন্নতি কোণ পাওয়া গেলো θ_1 এবং পাহাড়ের দিকে d দূরত্ব দূরে উন্নতি কোণ পাওয়া গেলো θ_2। পাহাড়ের উচ্চতা h। তাহলে ত্রিকোনমিতি ব্যবহার করে সহজেই পাওয়া যায়

$$h = \frac{dtan\theta_1\, tan\theta_2}{tan\theta_2 - tan\theta_1}$$

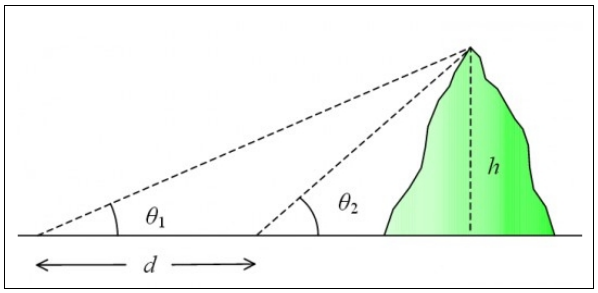

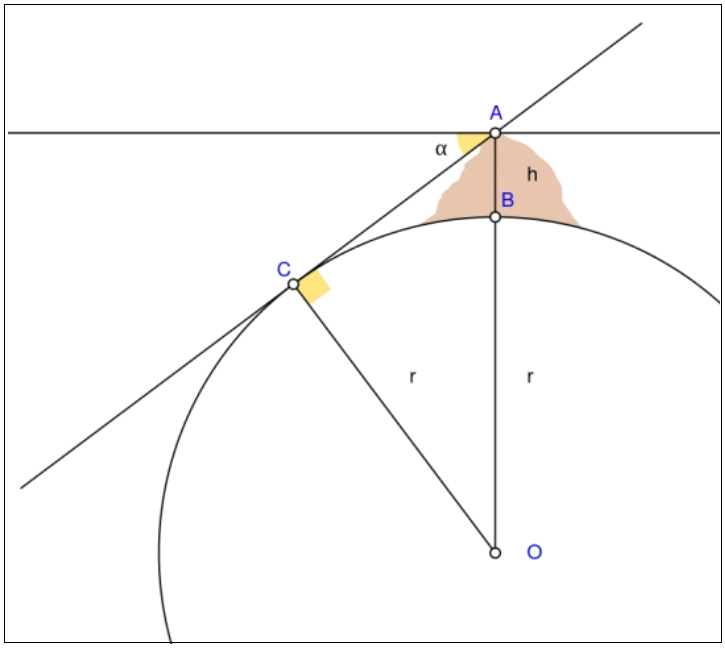

এবার পাহাড়ের শীর্ষে উঠে কোণ α নির্ণয় করতে হয়। কোণ α কে বলা হয় বিনতি কোণ। এটিও Astrolabe দিয়ে নির্ণয় করতে হয়। এই বিনতি কোণ α এবং B ও C পৃথিবীতে যে কোণ তৈরি করে তা সমান। এবার ACO সমকোণী ত্রিভুজ থেকে সহজেই R এর মান বের করা যায়। সমকোণী ত্রিভুজ ACO তে

$$OC = R \text{ (পৃথিবীর ব্যাসার্ধ) এবং } AO = R + h$$

$$\text{তাহলে, } \cos \measuredangle AOC = \frac{OC}{AO}$$

$$\text{বা, } \cos \alpha = \frac{R}{R+h}$$

এবার এই সমীকরনে h এবং α এর মান বসিয়ে সমাধান করলেই R এর মান বা পৃথিবীর ব্যাসার্ধ পাওয়া যাবে।

আল বিরুনি তার এই পদ্ধতি আর পর্যবেক্ষনের উপর ভিত্তি করে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ পেয়েছিলেন 3928.77 মাইল (প্রায়)। আর বর্তমান হিসাব অনুযায়ী এই মান 3847.80 মাইল প্রায়। বোঝাই যাচ্ছে কতটা কাছাকাছি ছিলো তার এই পরিমাপ।

তবে যে ত্রুটিটা এসেছিলো তার কারণ হলো পৃথিবীকে গোলক রূপে কল্পনা করা। পৃথিবী পুরোপুরি গোলক না। আবার অ্যাস্ট্রোল্যাবের সাহায্যে পরিমাপ করতে গেলে খালি চোখের পরিমাপে সামান্য পরিমাণ ভুল আসতে পারে যেটা পৃথিবীর মতো এত বড়ো ব্যাসার্ধের জন্য বেশ ভালোই প্রভাব ফেলে। বলে রাখা ভালো বিরুনি অ্যাস্ট্রোল্যাব দিয়ে বিনতি কোণ মেপেছিলেন প্রায় ০ ডিগ্রি ৩৪ মিনিট। বোঝাই যাচ্ছে কতটা ক্ষুদ্র। তাই এক্ষেত্রে ত্রুটি হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। আর বিরুনি কিন্তু মাইল বা কিলোমিটার এককে এই পরিমাপটি করেননি। তিনি করেছিলেন কিউবিট এককে। এক কিউবিট =০.৪৫৭২ মিটার।

আলোকীয় ঘটনাবলি

মাঝে মাঝে রাতের বেলায় চাঁদের দিকে তাকালে দেখা যায় চাঁদের পাশে বিশাল আকৃতির একটি বলয়। এই ব্যাপারটি আপনি হয়ত মাঝে মাঝে দিনের বেলায়ও সূর্যের চারপাশে লক্ষ্য করে থাকবেন। আপনি হয়ত মাঝে মাঝে আকাশে মাথার উপরে রংধনু আকৃতির কিছু একটা দেখেছেন কিন্তু রংধনুর মতো রং থাকলেও সেখানে হয়ত সামান্য একটি বৃত্তচাপের মতো দেখা যাচ্ছে। আপনি যদি প্রকৃতি প্রেমি হন, প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে যদি মন শান্ত করবার নেশা আপনার থাকে তাহলে হয়ত এসব ঘটনা আপনার চোখ এড়িয়ে যায়নি। চলুন, এসব আলোকীয় ঘটনার দিকে একটু চোখ বোলানো যাক। তার আগে আমাদের মনে রাখতে হবে খোলা আকাশে দিনের বেলায় আলোক উৎস হিসেবে সূর্য ছাড়া কিন্তু কিছুই নেই। সূর্যের আলোর কারণে দেখা যায় হরেকরকম আলোকীয় ঘটনা।

প্রকৃতিতে ঘটা অধিকাংশ আলোকীয় ঘটনা ঘটার কারণ হলো বরফ স্ফটিক (ice crystal) । Ice crystal একই সাথে প্রতিফলক এবং প্রতিসরক হিসেবে কাজ করতে পারে। Ice crystal এ আলোর প্রতিফলনের কারণে যেমন আলোকীয় ঘটনা রয়েছে তেমনি রয়েছে প্রতিসরনের কারনে। Ice crystal অনেক উচু স্তরের মেঘ থেকে সৃষ্টি হতে পারে। আবার সৃষ্টি হতে পারে মাঝারি কিংবা নিম্ন স্তরের মেঘ থেকে। যেমন ভাবেই তৈরি হোক না কেন সেটা এখন আলোচনার বিষয় না। Ice crystal বিভিন্ন আকারের হতে পারে। আলোকীয় ঘটনাগুলোর জন্য দায়ী যেসব আকার তার মধ্যে ষড়ভুজাকৃতির বরফ স্ফটিক অন্যতম। ষড়ভুজাকৃতির বরফ স্ফটিক প্রিজম আকারের হয়। প্রিজম আকারের বরফ স্ফটিকের মধ্যে রয়েছে কলাম আকৃতির স্ফটিক এবং প্লেট আকৃতির স্ফটিক। এইসব প্লেট এবং কলাম আকৃতির স্ফটিকগুলো যদি ৩০ মাইক্রোমিটার এর চেয়ে বড়ো হয় তাহলে স্ফটিকগুলো ধীরে ধীরে নিচের দিকে আসতে থাকে। নিচের দিকে আসার সময় কলাম স্ফটিকগুলো এবং প্লেট আকৃতির স্ফটিকগুলো প্লেট আকৃতির স্ফটিকগুলো চিত্রের মত অবস্থান করে । এই বিন্যাসের ফলে আলোকীয় ঘটনাবলি সহজেই ঘটতে পারে। নিচের দিকে আসার সময় এসব স্ফটিক অক্ষ বরাবর ঘুরতে পারে, কোন কোনটি আবার লাটিমের মতো ঘুরতে ঘুরতে নিচের দিকে পড়তে থাকে। একটি বরফ স্ফটিকের কোন অংশকে কি বলে তা চিত্রে দেখানো হয়েছে। 1, 2 নং তল দ্বারা Basal face এবং 3-8 দ্বারা Prism face বোঝায়।

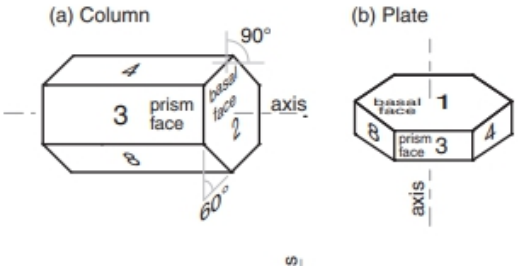

Light pillar: এটি এমন এক আলোকীয় ঘটনা যেখানে আলোর পিলার দেখা দেখা যায় আকাশে। Light pillar আলোর প্রতিফলনের উদাহরন। উপরের স্তরের ষড়ভুজাকৃতির প্লেট আকৃতির বরফ স্ফটিক থেকে যখন আলো প্রতিফলিত হয়ে দর্শকের চোখে আসে তখন বেশিরভাগ আলোকরশ্মিই অপসারী হয়। এগুলো তখন পিছনের দিকে বাড়ালে অবাস্তব চিত্র পাওয়া যায় যা পিলার হিসেবে দেখা যায়। আলোকউৎস হিসেবে সূর্য থাকলে আলোকীয় পিলারগুলোকে Sun pillar বলা হয়। সূর্য যখন দিগন্তের খুব কাছাকাছি থাকে কিংবা দিগন্তের সামান্য নিচে থাকে তখন

Sun pillar দেখা যায়। Sun pillar এর রং লাল/কমলা হয়ে থাকে। অন্যান্য তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো বিচ্ছুরিত হয়ে ছড়িয়ে পড়লেও লাল তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো অতটা ছড়ায় না। ঐ আলোই দর্শকের চোখে ধরা দেয়। Light pillar চাঁদের আলো দিয়েও হতে পারে। আবার কৃত্রিম আলো (Streetlight) হতেও Light pillar সৃষ্টি হয়।

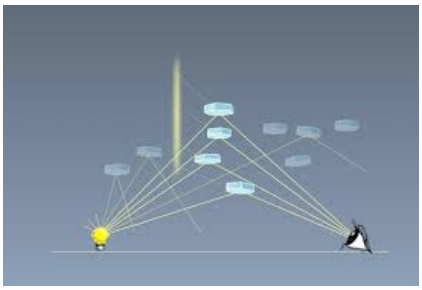

Parhelic circle: সূর্যের মাঝ দিয়ে গমনকারী বামে ডানে প্রসারিত সাদা আলোর একটি ব্যান্ড হলো Parhelic circle। এটি হওয়ার কারণও আলোর প্রতিফলন। আলোকরশ্মি ষড়ভুজাকৃতি প্লেটগুলোর প্রিজম ফেস এ এসে আপতিত হয়ে একদম তল ঘেষে প্রতিফলিত হয়। কিছু আলোকরশ্মি স্ফটিকের মধ্যে ঢুকে পূর্ণ অভ্যন্তরীন প্রতিফলনের মাধ্যমে বাইরে বেরিয়ে আসে। যেহেতু বরফ স্ফটিকগুলো ঘুরতে থাকে বিভিন্নভাবে তাই আলোও চোখে বিভিন্নভাবে আসতে পারে।বিভিন্নভাবে আলো বিভিন্ন দিক থেকে আসলে প্রতিটি বরফ স্ফটিক এক একটি আয়না রূপে কাজ করে। ফলে সূর্যের বামে -ডানে একটি সাদা ব্যান্ড দেখা যায়। কিভাবে Parhelic circle গঠিত হয় তা দেখানো হলো।

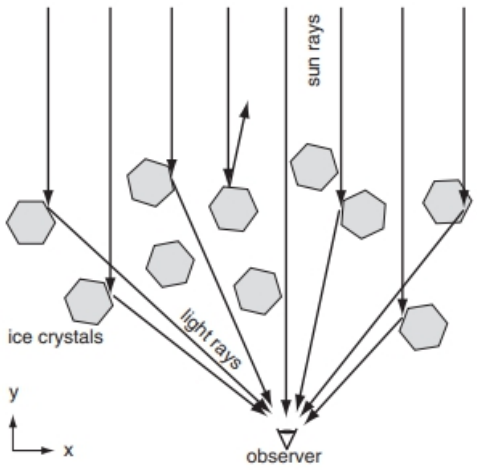

Subsun: Subsun কে বলা যেতে পারে অতিরিক্ত আরেকটি সূর্য। Subsun ও আলোর প্রতিফলনের একটি উদাহরণ। কিন্তু এখানে প্রতিফলন হয় ষড়ভুজাকৃতি প্লেটের Basal face এর উপর। আপনি যদি কোন উচু স্থান (পাহাড়, বড়ো দালান, প্লেন) এ ওঠেন তাহলে Subsun দেখার সৌভাগ্য হতে পারে। সূর্যের আলো প্লেট আকৃতির স্ফটিকগুলোর উপরে পড়ে এবং পর্যবেক্ষক এর চোখে গিয়ে পৌঁছায়। এগুলো বিপরীত দিকে বর্ধিত করলে পর্যবেক্ষকের কাছে একটি অবাস্তব আলোক উৎস সৃষ্টি হবে। এটাই Sub sun.

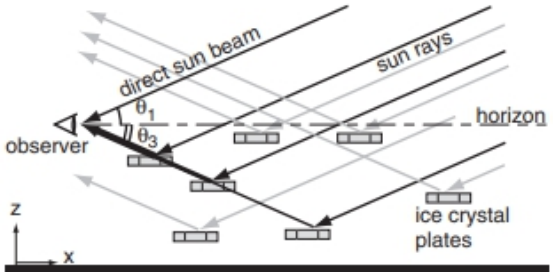

Halo: Halo এর বাংলা অর্থ বর্ণবলয়। বাংলা নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে, Halo দ্বারা রংধনুর মতো একটি বলয় বোঝায়। সূর্য, চাঁদের চারপাশে বৃহৎ বৃত্তাকার যে রংধনুর মতো বলয় দেখা যায় তাকে halo বলা হয়।

Halo বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন: 9° halo, 18° halo, 22° halo, 44° halo, 46° halo ইত্যাদি। এর মধ্যে আমরা বেশিরভাগ সময় 22° Halo দেখতে পাই। 44° Halo ও মাঝে মাঝে দেখা যায়। কিন্তু বাকি Halo type গুলো সচারাচর দেখা যায়না। 22° এবং 44° Halo এর মূল কারণ হলো ষড়ভুজাকার কলাম আকারের বরফ ক্রিস্টাল।

22° Halo: কলাম আকৃতির বরফ স্ফটিকগুলো ঘূর্ণন অক্ষের সাপেক্ষে বিভিন্ন দিকে বিভিন্নভাবে ঘুরতে পারে। এর ফলে আলোকরশ্মি আপতিত হওয়ার একটি বিস্তৃত ক্ষেত্র (wide range) তৈরি হয়। আলোকরশ্মির কিছু অংশ সরাসরি পর্যবেক্ষকের চোখে প্রবেশ করে এবং কিছু অংশ কলাম আকৃতির স্ফটিকের Prism face এ আপতিত হয়ে আবার প্রতিসরনের মাধ্যমে Prism face দিয়েই বেরিয়ে আসে। ফলে আপতিত দিকের সাথে আলোর একটি বিচ্যুতি কোণ তৈরি হয়। এই কোণের মান প্রায় ২২°। ২২° হওয়ার ফলে মনে হয় যেন আকাশে সূর্য হতে ২২° কৌণিক দূরত্বে একটি বৃত্তাকার রিং বা বলয় দেখা গেছে। এটাই 22° Halo. এই ধরনের ক্ষেত্রে কোণের মান পুরোপুরি 22° হয়না। কিন্তু প্রায় 22° ধরা যায়! 22° Halo এর জন্য কেন্দ্রের দিকের আলোর রং লাল দেখা যায়।

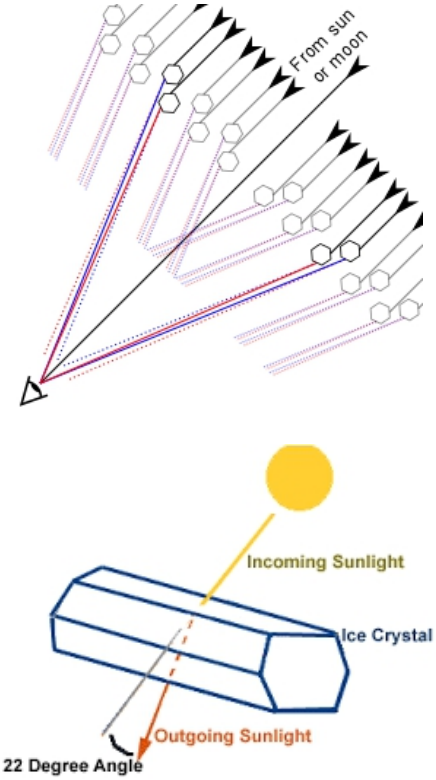

46° Halo: 22° Halo তে আমরা দেখেছিলাম আলো prism face দিয়ে ঢুকে Prism face দিয়েই বেরিয়ে যায় কিন্তু 46° Halo তে আলো Prism face দিয়ে ঢোকে ঠিকই কিন্তু বেরোয় Basal face দিয়ে। 46° Halo 22° Halo এর মতো সহজে দেখা যায়না। (কেন ভাবুন তো) আবার 46° halo 22° Halo এর তুলনায় খুবই অনুজ্জ্বল হয়।

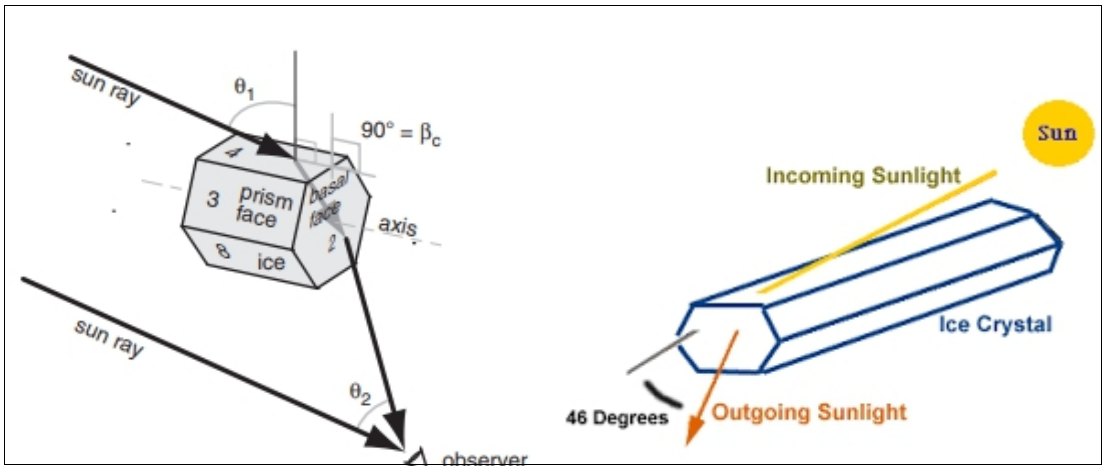

22° Halo বোঝার পদ্ধতি: ধরুন কোন একদিন সূর্যের চারপাশে আপনি Halo দেখতে পেলেন। ওটা 22° Halo কিনা তা বোঝার জন্য কোন বস্তু দ্বারা সূর্যকে আড়াল করুন। এরপর ঐ বস্তুটির উপর বৃদ্ধাঙ্গুলি রেখে হাত যথাসম্ভব প্রসারিত করুন। অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রে হাতের তালু এভাবে প্রসারিত করলে তা প্রায় 22° হয়। এভাবে 22° Halo আলাদাভাবে চেনা যায়।

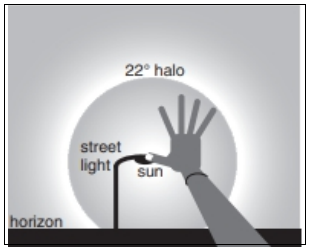

আরও বিভিন্ন ধরনের Halo হতে পারে।সেগুলোর কারণ হলো পিরামিড আকৃতির বরফ স্ফটিক। সেগুলোর আকৃতি একটু জটিল ধরনের এবং এ ধরনের বরফ স্ফটিক দিয়ে Halo তৈরি হওয়া খুবই দুর্লভ।

Circumzenith arc: এটাকে বলা যেতে পারে একটি রঙিন বৃত্তচাপ। আমরা জানি Zenith মানে আপনার মাথার উপরের বিন্দু বা সুবিন্দু। Circulzenith arc ও আপনার মাথার উপরে একটু পাশে দেখা যায়।

সূর্য যখন দিগন্ত থেকে 10° উপরে থাকে তখন সুবিন্দু থেকে সূর্যের দিকে 30° কোণ পরে Circumzenith arc দেখা যায়। অথবা সূর্য যখন দিগন্ত থেকে 30° উপরে থাকে তখন zenith থেকে প্রায় 10° দূরেও এটা দেখা যায়। উপরে যে কোণ গুলো উল্লেখ করা হলো সেগুলো যে ফিক্সড তা কিন্তু না। কিন্তু কোণগুলো ঐ মানের প্রায় কাছাকাছি। সূর্য দিগন্ত থেকে মোটামুটি 32° এর ভিতরে থাকলে arc টি দেখা যায়। Circumzenith arc তখনই তৈরি যখন আলোকরশ্মি Basal face দিয়ে প্রবেশ করে Prism face দিয়ে বেরিয়ে যায়।

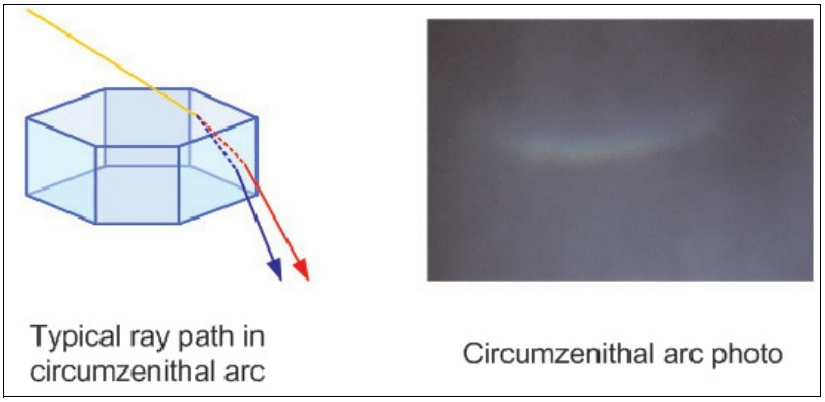

Circumzenith Arc এ ও হ্যালোর মতো সূর্যের দিকে লাল রঙ থাকে। Circumzenithal arc কে উল্টো রংধনু, Bravais arc ও বলা হয়।

Circumhorizontal arc: Circumhorizontal arc দিগন্তের কাছাকাছি অঞ্চলে সূর্যের নিচে দেখা যায়। অনুভূমিকভাবে বরফ স্ফটিকের প্লেটগুলো থাকা অবস্থায় আলোকরশ্মি যখন কোন একটি Prism face দিয়ে প্রবেশ করে এবং নিচের Basal face টি দিয়ে বেরিয়ে আসে তখনই Circumhorizontal arc দেখা যায়।

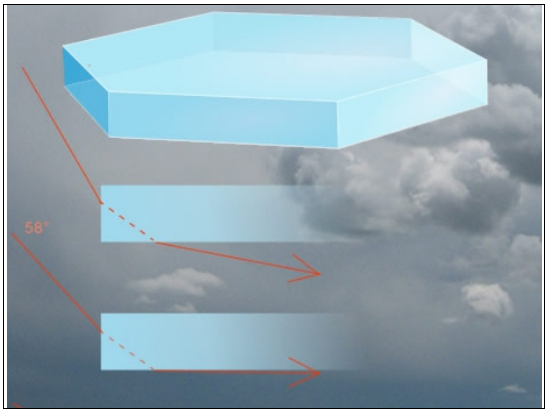

চাঁদের আলোর জন্য Circumzenith arc এবং Circumhorizontal arc দেখতে খুব কমই পাওয়া যায় কারণ চাঁদের আলোর উজ্জ্বলতা অনেক কম। চাঁদের আলোর দ্বারা এই ধরনের আলোকীয় ঘটনা পূর্ণিমার সময়ই শুধু দেখা যেতে পারে। তা ও যদি আকাশে বরফ স্ফটিকগুলোর বিন্যাস ঠিকঠাক থাকে তাহলেই।

Sun Dog: সূর্যের বাম -ডান দুইপাশেই সাধারণত 22° ব্যবধানে উজ্জ্বল আলোকবিন্দু দেখা যায়। একেই Sun dog বলা হয়। আলোকরশ্মি যখন প্রায় আনুভূমিকভাবে থাকা ষড়ভুজাকৃতি প্লেটের উপর পড়ে তখন যদি আলো Prism face। দিয়ে ঢুকে Prism face দিয়েই বেরিয়ে যায় তখন দেখা যায় Sun dog। একে Sun dog (সূর্য কুকুর) কেন বলা হয় তার কারণ স্পষ্ট নয়। Sun dog কে Mock sun, Parhelia ও বলা হয়। Sun dog বেশিরভাগসময় 22° Halo এর দুইপাশে দেখা যায় কিন্তু যখন সূর্য অনেকটা উপরে থাকে তখন Sun dog কে 22° থেকে সরে যেতে দেখা যায়।এসময় Sun dog যথেষ্ট উজ্জ্বল থাকেনা। Sun dog এ ও Halo এর মতো লাল রংটি সূর্যের দিকে থাকে।

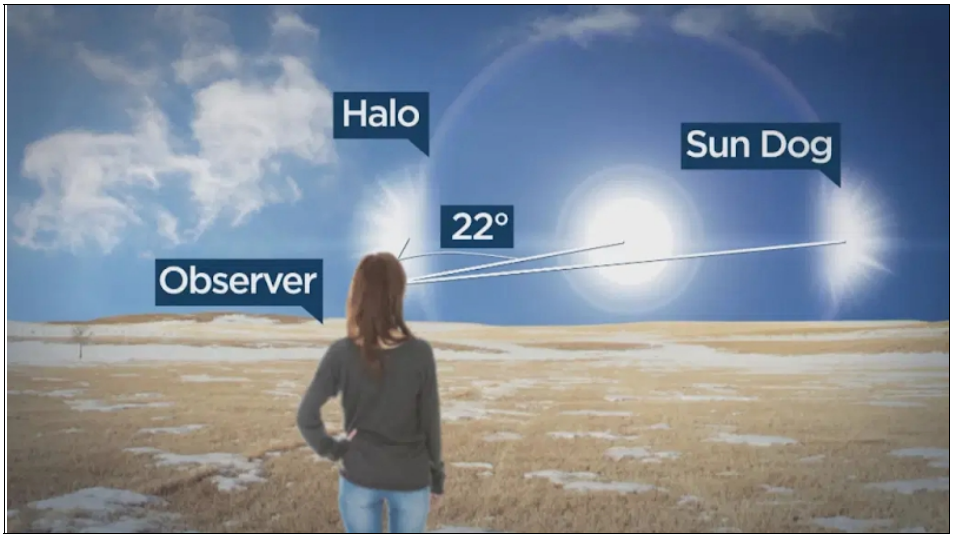

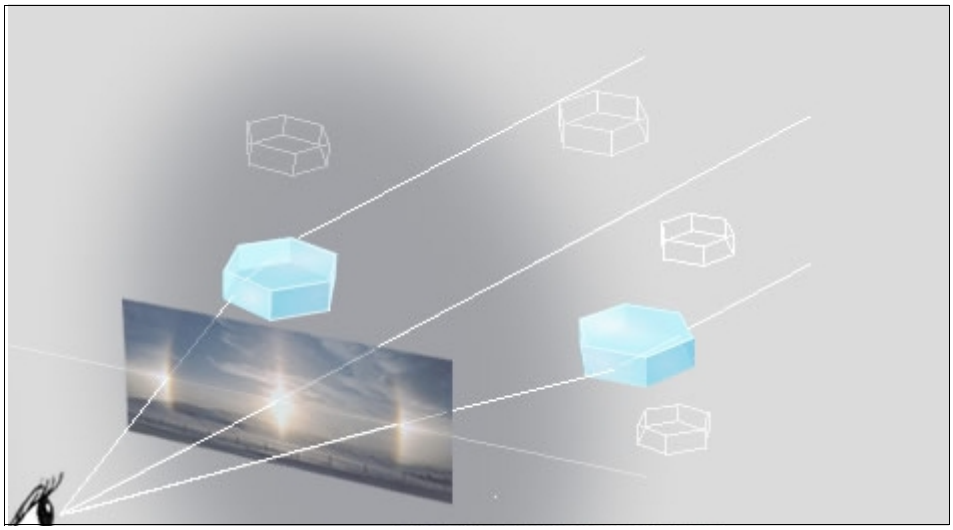

Upper Tangent arc (উর্ধ্ব স্পর্শীয় বৃত্তচাপ) and Lower tangent arc (নিম্ন স্পর্শীয় বৃত্তচাপ): Upper tangent arc কে 22° Halo এর উপর দিকে একটি স্পর্শকের মতো মনে হয়। এই স্পর্শকটির আকার বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। এটা

নির্ভর করে সূর্য দিগন্ত থেকে কতটা উপরে আছে তার উপর। Upper tangent arc কে দুইপাশে ছড়িয়ে দেওয়া পাখির ডানার মতো মনে হয়।

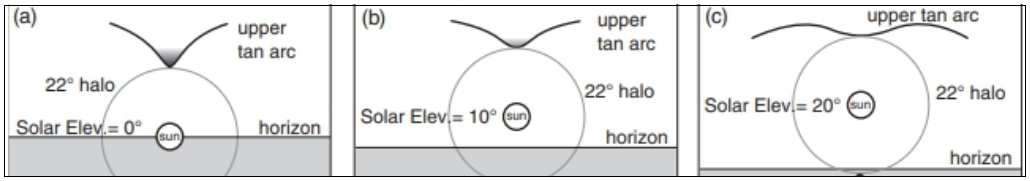

সূর্য দিগন্তের যত কাছাকাছি থাকে Upper tan arc টি তত বেশি খাড়া হয় (উপরের দিকে প্রসারিত হয়) । সূর্য দিগন্ত থেকে মোটামুটি ৪৫° বা তার থেকে বেশি দূরে থাকলে Upper tangent arc প্রায় 22° Halo এর সাথে মিশে যায়। তখন মনে হয় Upper tangent arc যেন 22° Halo এর সাথে প্রায় এক হয়ে যেতে চাইছে। সূর্যের উন্নতি কোণ 60° এর বেশি হলে কোন Upper tangent arc দেখা যায় না।

অন্যদিকে Lower tangent arc এর ক্ষেত্রে 22° Halo এর নিচের দিকে স্পর্শক দেখা যায়।

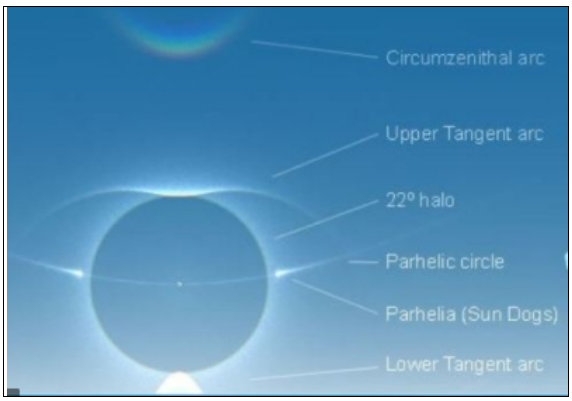

যেহেতু 22° Halo এর নিচের দিকে এটি দেখা যায় তাই এটা দেখতে হলে সূর্য কমপক্ষে দিগন্তের 22° উপরে থাকা উচিত। তবে সূর্য 22° এর নিচে থাকলে Lower tangent arc দেখার জন্য বড়ো দালান, পাহাড়ের উপর উঠতে হবে। Upper tangent arc এবং Lower tangent arc এর মূলনীতি একই রকম। নিচে কোনটির জন্য আলোকরশ্মি কীভাবে গমন করে সেটা দেখানো হয়েছে।

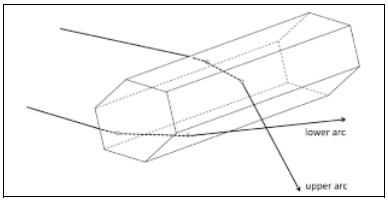

তবে মনে রাখার বিষয় হলো এখানে বরফ স্ফটিকগুলোর আকৃতি কলামের ন্যায় (প্লেটাকৃতির গুলো না) এবং বরফস্ফটিকগুলো ভূমির সাথে সমান্তরাল আকারে থাকলেই কেবল এই দুই ধরনের বৃত্তচাপ দেখা যাবে।

Circumscribed halo: Upper tangent arc এবং Lower tangent arc যখন এক হয়ে যায় তখন দেখা যায় Circscribed halo। সূর্য দিগন্তের উপরের দিকে উঠতে থাকলে Upper tangent arc এর পাখির মতো ছড়ানো ডানা নিচের দিকে প্রসারিত হতে থাকে। অন্যদিকে Lower tangent arc ও দুইপাশে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। যখন Upper এবং Lower tangent arc এক হয়ে যায় তখন 22° Halo র চারপাশে আরেকটি Halo দেখা যায়। এটাকেই বলা হয় Circumscribed halo (পরিধিস্থ বর্ণবলয়)।

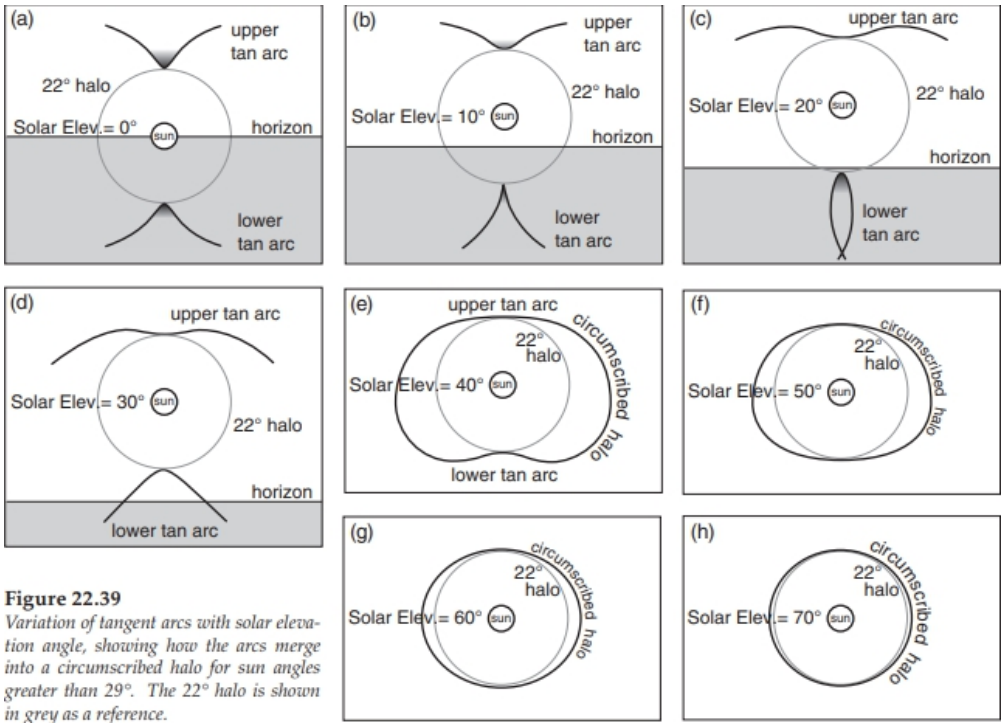

Figure 22.39
Variation of tangent arcs with solar elevation angle, showing how the arcs merge into a circumscribed halo for sun angles greater than 29°. The 22° halo is shown in grey as a reference.

মোট কথায় বলা যায় Upper এবং Lower tangent arc এর একত্রিকরণের ফলেই এই হ্যালো সৃষ্টি হয়। মোটামুটিভাবে সূর্যের উন্নতি কোণ 29° এর বেশি হলে circumscribed halo দেখা যায়। সূর্যের উন্নতি কোণ 70° এর বেশি হলে Circumscribed Halo, 22° Halo এর সাথে এমনভাবে মিশে যায় যে তখন আলাদাভাবে এদের চেনা যায়না।

Parry arc: Upper tangent arc এর সাথেই দেখা যায় Parry arc। কিন্তু এটা দেখা খুবই কঠিন। খুবই দুর্লভ এই আলোকীয় ঘটনাটি। ১৮২০ সালে William Edward Parry এটি লক্ষ্য করে প্রথম বর্ণনা করেন। কলাম আকৃতির বরফ স্ফটিকগুলো যখন চিত্রে দেখানো পজিশন অনুযায়ী থাকে এবং চিত্রে দেখানো পথে আলোকরশ্মিগুচ্ছ গমন করে তখনই Parry arc দেখা যায়।

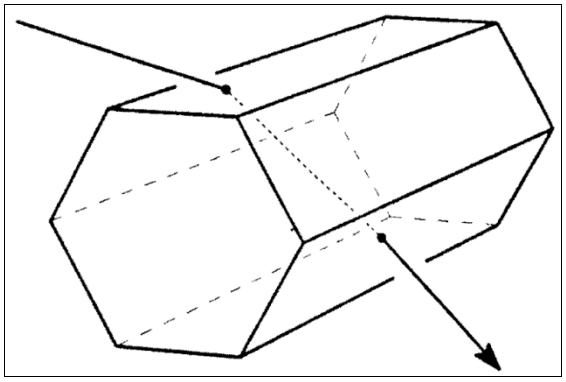

এটিও সূর্যের উন্নতি কোণের সাথে সাথে পরিবর্তিত আকার ধারন করতে পারে। Parry arc ঠিকঠাক না চিনলে তা Upper tangent arc এর সাথে গুলিয়ে যেতে পারে। 22° Halo এর সাথে মাত্র 1% সময়ে এই Parry arc আলাদাভাবে চেনা সম্ভব।

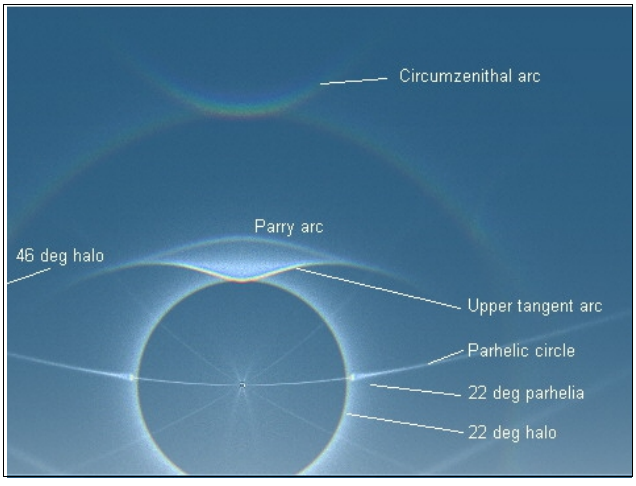

Lowitz arc :Lowitz arc খুব খুব বিরল আলোকীয় ঘটনা এবং এটা অনেক অনুজ্জ্বলও বটে। Lowitz arc সৃষ্টি হওয়ার জন্য ষড়ভুজাকৃতির প্লেটাকার বরফস্ফটিক গুলোর বিন্যাস একটু ভিন্ন হয়। আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি প্লেটের আকারের স্ফটিক গুলো ভূমির সমান্তরালে থাকে কিন্তু Lowitz arc এ সেগুলো চিত্রের মতো অবস্থান করে।

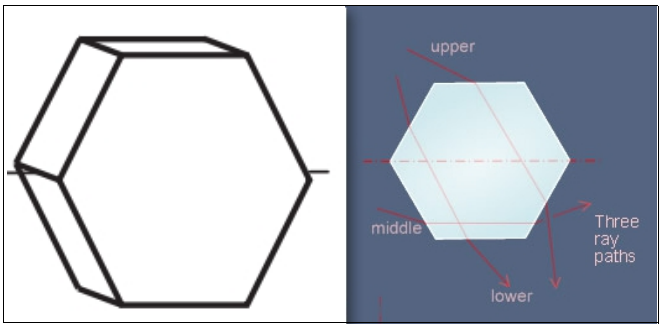

Johann Tobias Lowitz এর নামানুসারে এর নামকরণ করা হয়েছে। Lowitz arc এ আলোকরশ্মির গমনপথ চিত্র হতে বোঝা যাবে।

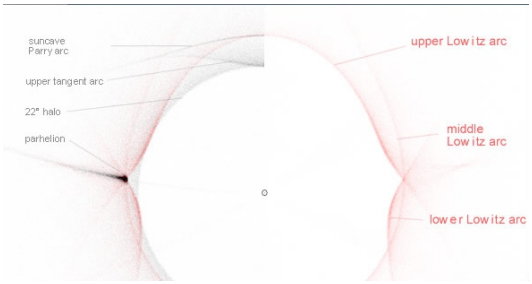

Moilanen arc: ফিনল্যান্ডের Jarmo moilanen এর নামানুসারে এর নাম Moilanen arc। এটা "V" আকারের একটি বৃত্তচাপের মতো। এটাও কিন্তু খুব কম দেখা যায়! এটির জন্য কলাম কিংবা প্লেট আকৃতির কোন মেঘই আলাদাভাবে দায়ী না। বরং Moilanen arc এর ব্যাখার্থে কলাম এবং প্লেট আকৃতির স্ফটিকগুলো একসাথে দায়ী করা হয়। নিচের চিত্রানুযায়ী এই আলোকীয় ঘটনার ব্যাখ্যা করা সম্ভব। এখানে দুইটি বরফ স্ফটিক দেখানো হয়েছে। নিচেরটি কলাম আকৃতির এবং উপরেরটি প্লেট আকৃতির।

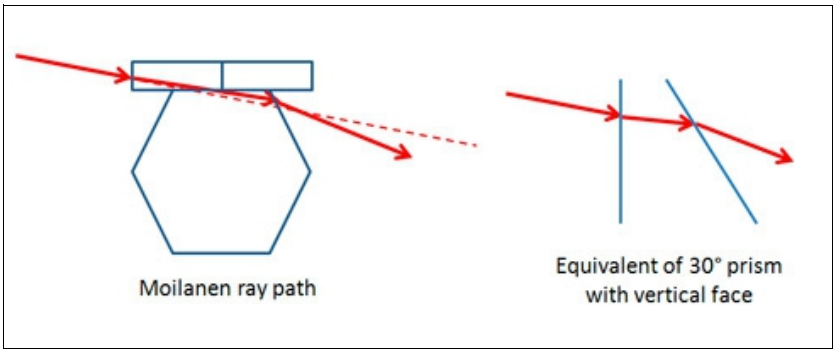

এই ধরনের বিন্যাসের ফলে আলোকরশ্মির গমনপথ 30° () প্রিজমের ভিতর আলোকরশ্মি গমনের মতো হয়।

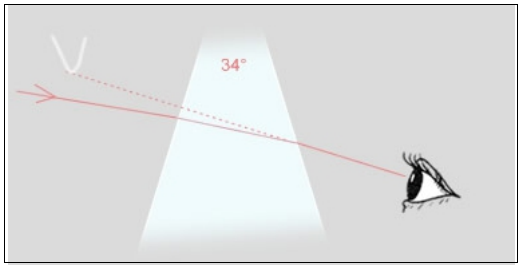

এটিও অন্যান্য আলোকীয় ঘটনার মতো সূর্যের উন্নতি কোণের উপর নির্ভরশীল। সূর্য ১০° উপরে থাকলে এটি প্রায় সূর্য থেকে ১৩° দূরে দেখা যায়। ১৮° সূর্যের উন্নতির জন্য 20° দূরে ইত্যাদি। তবে মনে রাখতে হবে, এটা একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা। এখনও নিশ্চিত আকারে এর ব্যাখ্যা বলা যাচ্ছেনা। Moilanen arc কোথায় দেখা যাবে তা চিত্রে দেখুন।

Wegener arc: এটি কলাম আকৃতির স্ফটিক দ্বারা ঘটা একটি ঘটনা। আলো কোন একটি prism face দিয়ে প্রবেশ করার পর ভিতরে কোন একটি তলে প্রতিফলিত হয়। প্রতিফলিত হয়ে প্রথম তলটির সাথে 60° কোণে থাকা তলটি দিয়ে বেরিয়ে যায়। এমন হলেই Wegener arc এর সৃষ্টি হয়।

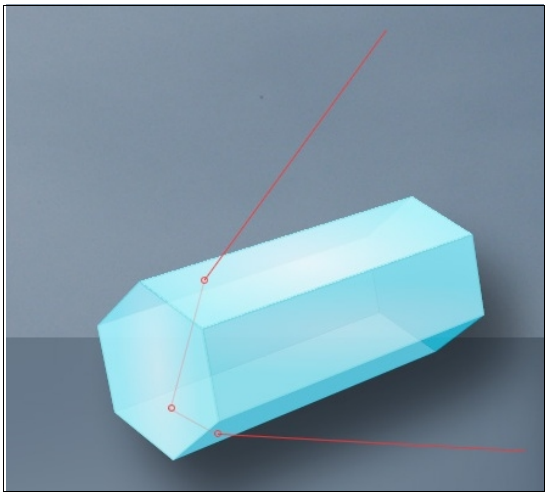

একই রকম মূলনীতি কিন্তু Upper tangent arc এবং Circumscribed halo এর জন্যও প্রযোজ্য ছিলো। Wegener arc যদি উজ্জ্বল না হয় তাহলে এটি দেখাও এতটা সহজ নয়। কারণ ভিতরে একবার প্রতিফলন হওয়ার ফলে মূল আলোকরশ্মির তুলনায় Wegener arc এর উজ্জ্বলতা অনেক কম হয়।

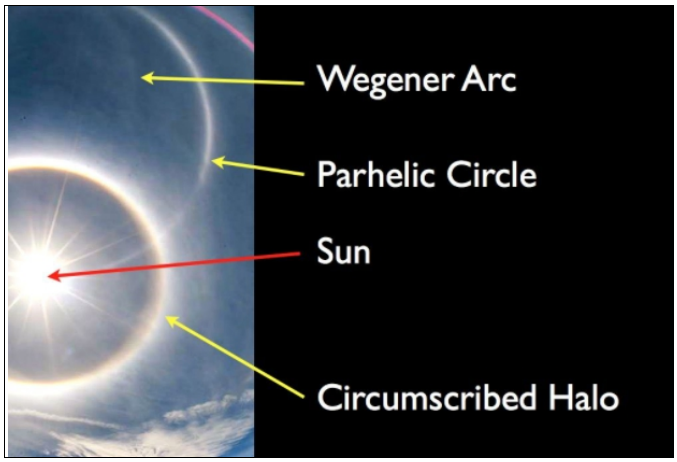

Bishop's ring: এটিও আকাশে Halo এর মতো একধরনের বর্ণবলয়। কিন্তু এই ধরনের বর্ণবলয়ের রং কিছুটা বাদামী অথবা হালকা নীলাভ হতে পারে। ১৮৮৩ সালের ক্রাকাটোয়া আগ্নেয়গিরির অগ্নুতপাতের পর S.E Bishop এই নতুন ধরনের আলোকীয়,ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে লিপিবদ্ধ করেন। তার নামানুসারেই একে Bishops ring বলা হয়। 22° কিংবা 46° Halo র মূল কারণ ছিল বরফ স্ফটিক কিন্তু Bishops ring এর মূল কারণ হলো আগ্নেয়গিরি থেকে ছড়িয়ে পড়া অতি সুক্ষ্ম ধূলিকণা। Bishop's ring এর ব্যাসার্ধ 22° থেকে 28° এর মাঝে থাকে। এবং ring প্রায় 10° চওড়া হয়।

Kern arc: Circumzenith arc এর কথা মনে আছে নিশ্চয়ই? বলেছিলাম এটা একটি বৃত্তচাপ। এটা যে বৃহত্তর বৃত্তের বৃত্তচাপ তার বাকি অংশ যদি দেখা যায় তাহলে বলা যায় আপনি যে বৃত্তচাপটি দেখলেন সেটি হলো Kern arc। Kern arc অতি দুর্লভ। ২০০৭ সালের ১৭ নভেম্বর সর্বপ্রথম Kern arc এর ছবি তোলেন Marko Mikkila। H.F.A Kern এর নামানুসারে এর নাম। Kern arc এর কারনও স্ফটিকের ভিতরের তলে আলোর প্রতিফলন। কিভাবে প্রতিফলন হয় তার চিত্র নিচে দেখানো হলো

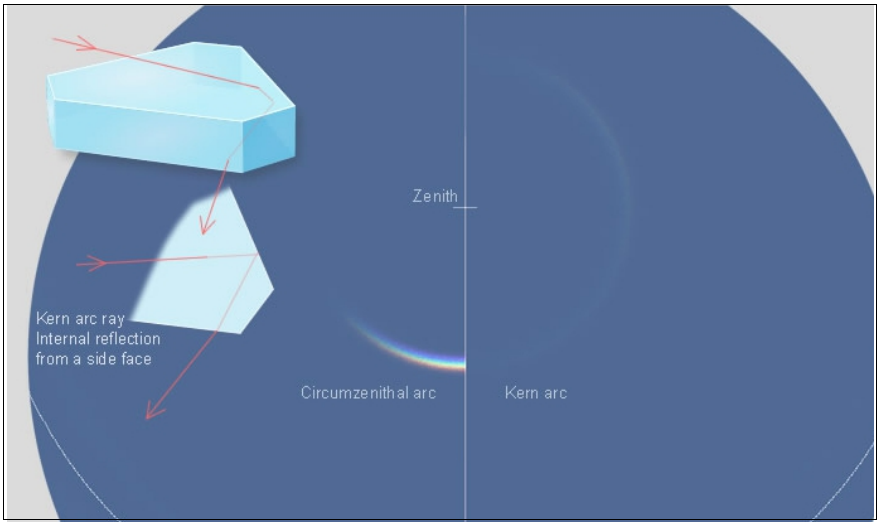

আরও বেশ কিছু ধরনের Arc দেখা যায় কিন্তু সেগুলো সবসময় দেখা যায়না। খুব দুর্লভ বলতে পারেন। এগুলো আলাদাভাবে না বলে একসাথে বলছি। Diffuse arc, Tricker arc, Hastings arc, superlateral arc, infralateral arc, heliac arc, subhelic arc, Tape's arc এগুলোর চিত্রও পর্যায়ক্রমে দেওয়া হলো

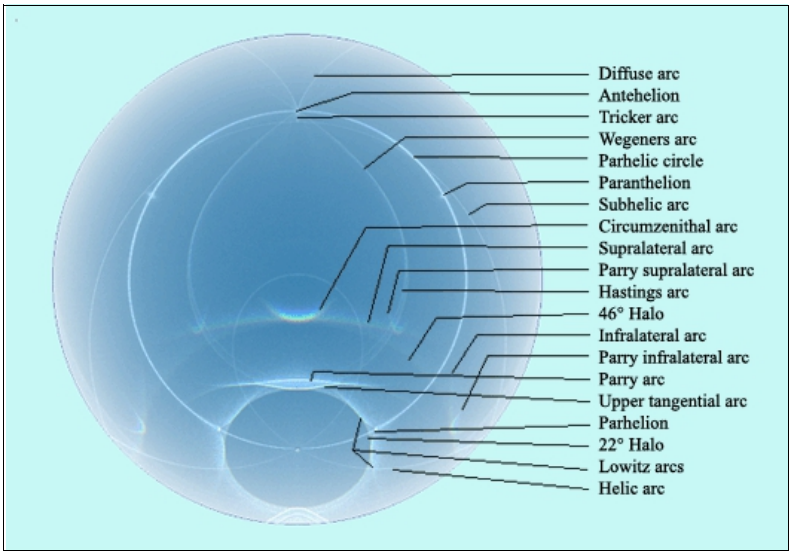

চিত্রঃ Diffuse arc, Tricker arc, Hastings arc, superlateral arc, infralateral arc, heliac arc, subhelic arc

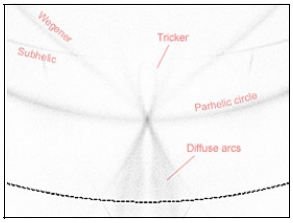

Circumzenithal arc
Upper 22° tangent arc
Parry arc
Supralateral arc
Heliac arc
Subhelic arc
Tricker's anthelic arc
22° halo
Tape's arc
Upper sun pillar
120° parhelion
Left 22° parhelion
Parhelic circle
Anthelion
Lower sun pillar
Right 22° parhelion

(চলবে...)